৮৫ ৩০

কবিতা

অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা   আশ্বিন ১৩৪৯   ক্রমিক সংখ্যা ৩৩

রবীন্দ্রনাথের তিনখানা চিঠি

[বুদ্ধদেব বসুকে লিখিত এবং শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত]

[১৩৪২-এর আশ্বিন মাসে 'কবিতা'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সেই সংখ্যাটি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দিয়ে তাঁর একটি কবিতা 'কবিতা'র জন্য প্রার্থনা করেছিলাম। উত্তরে তিনি যে-পত্রটি লেখেন তা আমাদের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিলো। আজ 'কবিতা'র অষ্টম বর্ষ আরম্ভ হবার উপলক্ষ্যে সেই পত্রটি পুনর্মুদ্রিত করছি।—সম্পাদক]

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমাদের 'কবিতা' পত্রিকাটি পড়ে বিশেষ আনন্দ পেয়েছি। এর প্রায় প্রত্যেক রচনার মধ্যেই বৈশিষ্ট্য আছে। সাহিত্য-বারোয়ারির দল-বাঁধা লেখার মতো হয় নি। ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নিয়ে পাঠকদের সঙ্গে এরা নূতন পরিচয় স্থাপন করেছে। অল্প দিন আগে পর্য্যন্ত দেখেছি বাংলায় গদ্য ছন্দের কবিতা আপন স্বাভাবিক চালটি আয়ত্ত করতে পারেনি। কতকটা ছিল যেন বহুকাল খাঁচায় বন্দী পাখীর ওড়ার আড়ষ্ট চেষ্টা। গদ্য-ছন্দের

রাজত্বে আপাতদৃষ্টিতে যে স্বাধীনতা আছে যথার্থভাবে তার মর্য্যাদা রক্ষা কঠিন। বস্তুত সকল ক্ষেত্রেই স্বাধীনতার দায়িত্ব পালন দুরূহ। বাণীর নিপুণ-নিয়ন্ত্রিত ঝঙ্কারে যে মোহ, সৃষ্টি করে তার সহায়তা অস্বীকার করেও পাঠকের মনে কাব্যরস সঞ্চার করতে বিশেষ কলাবৈভবের প্রয়োজন লাগে। বস্তুত গদ্যে পদ্য-ছন্দের কারুশিল্পকৌশলের বেড়া নেই দেখে কলমকে অনায়াসে দৌড় করাবার সাহস অবারিত হবার আশঙ্কা আছে। কাব্য-ভারতীর অধিকারে সেই স্পর্দ্ধা কখনোই পুরস্কৃত হ'তে পারে না। অনায়াসের আগাছায় ভরা জঙ্গলকে কাব্যকুঞ্জ বলে চালিয়ে দেওয়া অসম্ভব। তোমরা ফাঁড়া এড়িয়ে গেছ। কেবল দেখলুম স্মৃতিশেখর উপাধ্যায়ের কবিতাটি পদ্য-ছন্দের মৌতাত একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। পূর্ব্ব অভ্যাসের বাঁধন তার পায়ে জড়িয়ে আছে, গদ্যের জুতো জোড়ার উপরে ছিন্নপ্রায় ঘুন্টি-বিরল পদ্য-নূপুরের উদ্বৃত্ত। অথচ অন্যত্র এই ছদ্মনামা কবির লেখায় অবাধ ছন্দের কলাদক্ষতায় আমি বিস্মিত হয়েছি। তা বলে তাঁর এ কবিতাটি বর্জনীয় নয়—আমি যা বলেছি সে আঙ্গিকের দিক থেকে, ভাবের দিক থেকে লেখাটির উপভোগ্যতা অস্বীকার করতে পারিনে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তামাসা' কবিতাটিতে পাহাড়-তলীর বন্ধুর ভূমির মতো গদ্যের রুক্ষ পৌরুষ লাগ্‌ল ভালো। তোমার কবিতা তিনটি গদ্যের কণ্ঠে তালমান-ছেঁড়া লিরিক, এবং ভালো লিরিক। সঙ্গে সঙ্গে পদ্য ছন্দের মৃদঙ্গওয়ালা বোল দিচ্ছে না বলে ভাবের ইঙ্গিতগুলি বিচ্ছুরিত হচ্ছে সহজে, অথচ সহজে নয়। বিষ্ণু দের কবিত্বশক্তি আছে কিন্তু তাকে

মুদ্রাদোষে পেয়েছে,—সেটা দুর্ব্বলতা। বিদেশী পৌরাণিক বা ভৌগোলিক উপমা কোনো বিশেষ কবিতার অনিবার্য্য প্রাসঙ্গিকতায় আস্‌তেও পারে কিন্তু এগুলি প্রায়ই যদি তার রচনায় পরিকীর্ণ হয়ে আচমকা হুঁচট লাগাতে থাকে তবে বলতেই হবে এটা জবরদস্তি। ঘাটবাঁধানো দীঘির পাশাপাশি পাইন বনের ছবি আমাদের চোখে স্পষ্ট হতে পারে না। সাইকলজির আকাঁড়া শব্দ বাংলা কাব্যের জঠরে চালান করতে পারো কিন্তু সেটা হজম না হয়ে আস্ত থেকেই যাবে। সমর সেনের কবিতা কয়টিতে গদ্যের রূঢ়তার ভিতর দিয়ে কাব্যের লাবণ্য প্রকাশ পেয়েছে। সাহিত্যে এঁর লেখা ট্যাঁকসই হবে বলেই বোধ হচ্ছে। সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের 'নীলিমাকে' কবিতাটি পূর্ব্বেই দেখে-ছিলেম এবং প্রশংসাও করেছি। সুধীন্দ্র দত্তের কবিতার সঙ্গে প্রথম থেকেই আমার পরিচয় আছে এবং তার প্রতি আমার পক্ষপাত জন্মে গেছে। তার একটি কারণ, তাঁর কাব্য রূপ নিয়েছে আমার কাব্য থেকে—নিয়েছে নিঃসঙ্কোচে—অথচ তার প্রকৃতি সম্পূর্ণ তাঁর আপন। তাঁর স্বকীয়তা চেষ্টামাত্র করেনি অনন্যত্বের স্পর্দ্ধায় যথাস্থান থেকে প্রাপ্তি স্বীকার উপেক্ষা করতে। এ সাহস ক্ষমতারই সাহস। এবারে তাঁর জন্মান্তর কবিতাটি বিশেষ ভালো লাগল। সুধীন্দ্রের কাব্যকে গাল দিয়েও সমালোচকেরা সম্মানিত করেনি এই আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়। জীবনানন্দ দাশের চিত্ররূপময় কবিতাটি আমাকে আনন্দ দিয়েছে—এ ছাড়া অজিতকুমার দত্ত ও প্রণব রায়ের কবিতা পড়ে আমার মন তখনি স্বীকার করেছে তাঁদের কবিত্ব।

আমার কাছ থেকে কবিতা চেয়েচ। জান না আমার কলমটাকে পিঁজরাপোলে পাঠাবার সময় এসেছে। অন্তর্য্যামী জানেন এখন না-লেখার চর্চ্চা করাই আমার চরম সাধনা। অনেকদিন লেখা চালিয়েছি এখন যদি পরের দাবীতে ও অভ্যাসের নেশায় লেখা না থামাতে পারি তাহলে অপঘাত ধ্রুব। এই যে তোমাকে চিঠিখানা লিখ্‌লুম এটা উজান ঠেলে। শরীর আমার নিরতিশয় ক্লান্ত, মন তাই কর্ম্মবিমুখ। তোমাদের তো সম্বল কম নেই দেখতে পাচ্চি—আমার কাছে প্রার্থনা করে আমায় লজ্জায় ফেলোনা। ইতি ৩ অক্টোবর ১৯৩৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[চিঠির শেষ অংশ সম্পাদকের পক্ষে আশাপ্রদ না-হ'লেও শেষ পর্যন্ত তাকে যে নিরাশ হ'তে হয়নি তা বলাই বাহুল্য। এই চিঠি হাতে আসবার কয়েকদিন পরেই কবির একটি দীর্ঘ গদ্য ছন্দের কবিতা এসে পৌঁছলো, তার নাম 'ছুটি' ('আশ্বিনে সবাই গেছে বাড়ি')। সেটি এই চিঠিরই সঙ্গে 'কবিতা'র দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের কাছে 'কবিতা'র জন্য কবিতা প্রার্থনা ক'রে আমার প্রায়ই দ্বিগুণ লাভ হ'তো—প্রথমে আসতো চিঠি তার মর্ম এই যে লেখা পাবার আশা যেন না করি, পরে আসতো প্রকাশিতব্য রচনা। এই রকম আরো দুটি চিঠি এই সঙ্গে ছাপাচ্ছি।—সম্পাদক]

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমাদের পত্রিকায় নিয়মিত কবিতা পাঠাতে পারি সে বয়স আমি বোধ হয় পেরিয়ে গেছি। পসরা ভর্ত্তি ছিল এককালে, জমে-ওঠা মাল বিকিয়ে দিতে পারলেই বোঝা খালাস হোত। এখন আর হাত চলে না কাজে, তাই দায় বাড়াতে ইচ্ছা করে না। একটি কবিতা তোমাদের দিয়েছি, কেবলমাত্র শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্যে।

তোমাদের পত্রিকা নতুন কবিদের খেয়ার নৌকো। যাদের হাতে উপযুক্ত মাশুল আছে তাদের পার করে দেবে সর্ব্বজনের পরিচয়ের তীরে। আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। পারে তো এসেইছি, হয়তো এত দূরে চলে গেছি যে চেহারাটা ক্রমে ফিকে হয়ে এল বলে। যদিও তোমাদের সময় জুড়ে আছি তবুও বস্তুত আমি তোমাদের সমসাময়িক নই। অর্থাৎ তোমাদের বাণী জোগাবার ফরমাস আমার উপরে আর নেই, সে কাজে আমাকে বিশ্বাস করতেই পারবে না। তোমাদের পত্রিকাটি সহযাত্রীদের নৌকো—আজও যাদের নাম করতে হবে তারাই ওর সওয়ারী—যারা নামজাদা তাদের জায়গা জুড়তে দিয়ো না। বর্ত্তমান কাল রাগারাগি ক'রে তাদের যদি অশ্রদ্ধা করে তবে সেও ভালো, তাদের প্রতি মনোযোগ দেবার প্রয়োজনই নেই, সেটা তাদের অত্যাবশ্যক—অতএব তাদের থেকে মনকে খালাস করে নিলে আধুনিকের চৌকি পাতবার জায়গা প্রশস্ত হবে। যদি স্বীকার করো সেই জায়গাটা প্রস্তুত করবার কাজে আমরা সাহায্য করেছি সেই যথেষ্ট—চৌকি তোমরাই দখল করো, প্রসন্ন মনে আমরা যেন সেই কামনাই করি। ইতি ৩ জানুয়ারি, ১৯৩৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমাদের বয়স অল্প, তোমাদের শক্তি জোয়ারের মুখে, তোমরা মনে করতে পার না আমার জীবনের ধারা তলায় এসে ঠেকেছে, একটুখানি স্রোত যা বাকি তার উপর দিয়ে পণ্য বেয়ে নিয়ে যেতে অনেক লগি ঠেলাঠেলি করতে হয়। আগে যা লেখা চলত, ভিতরকার ইচ্ছা ছিল তার সহায়, এখন সেই ইচ্ছাটা মরে এসেছে। অন্তরের তাগিদ ক্ষীণ, বাইরের দাবী মেটাবার জন্যে কোমর বেঁধে বসি, অল্পক্ষণের মধ্যেই জোর যায় কমে। তাই আমার হাসি পায় যখন আমার খ্যাতি রবীন্দ্রোত্তর যুগের দাঁড়ি পাল্লায় চড়িয়ে তার ওজন নিয়ে হট্টগোল চলতে থাকে। ফসল যখন অপর্য্যাপ্ত তখন এসব তর্কে নিজের মনও যোগ দেয়, ক্লান্ত ঋতুর ফসলের প্রদোষ-বেলায় ওসব কথাকাটাকাটি অত্যন্ত অবান্তর বলে মনে হয়। এ সময়টা লেখা জোগান দেবার পক্ষে একটুও অনুকূল নয়। যে বাগানে মালীর কাজ ফুরিয়ে গেছে সেখানে দৈবাৎ এধারে ওধারে দেখা দেয় পুরানো কালের উদ্বৃত্ত—সেই রকম যদি আকস্মিক কিছু জুটে যায় তোমাদের পাঠিয়ে দেব—নিশ্চিত আশা কোরো না, তা ছাড়া ভারি ওজনের কিছু জোটবার সম্ভাবনা নেই। ইতি ১।৭।৩৯

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শেষ রোমাণ্টিক

বিষ্ণু দে

কে জানে এল হঠাৎ প্রেম বুঝি
আজকে যবে চরমপ্রাণে যুঝি,
দেশবিদেশে মিতালি আজ খুঁজি
ভারতে দোঁহে বিশ্বজনতায়।

হয়তো প্রেমে, হয়তো পথচলায়,
চেনাশোনায়, প্রাণের কথা বলায়
শ্রাবণমেঘস্বপ্ন হানো গলায়
হৃদয় ভরো পথিক মমতায়।

তোমার ঘরে আমার নেই চাবি,
তোমার মনে জানি নেইকো দাবি,
অতীত যেথা বর্তমানে ভাবী
সেখানে শুধু ক্ষণিক আনাগোনা।

নানান্ কাজে তোমার কাটে দিন
প্রাত্যহিকে আমার তৃষাহীন
জীবন চলে, অবকাশের ক্ষীণ
গলিতে মোড়ে ছড়াও তুমি সোনা।

সোনালি হাসি, সোনালি গানে ভরি
তাই বিরল সন্ধ্যা, সহচরী,
কাজে অকাজে তোমাকে আজ স্মরি,
মরণজয়ী প্রাণের মমতায়।

হয়তো এই আহুতি শেষ হ'লে,
নবসমাজ গড়ার রলরোলে,
শান্তি যেথা সমান স্থখ খোলে
হারিয়ে যাব সেখানে জনতায়।
সেখানে নেই বোমাতাড়ানো দেয়াল,
পথিক প্রেম মৈত্রীবাঁধা খেয়াল ॥

চতুর্দশপদী

বিষ্ণু দে

আজকে যেখানে জীবনে মরণে বাঁধে সেতু,
দিকদিগন্তে প্রাণহন্তরা চক্রচর
শিবির-কিনারে নীড় বাঁধে সেথা মীনকেতু!
মরণের তীরে জীবনোল্লাস উন্মুখর!
জনসঙ্ঘাতে খেচর-আঘাতে যবনিকায়
ক্ষান্তিই মানে প্রেমের প্রবল প্রাকৃত গান।
তবু জানি তুমি শাশ্বতী নীল প্রাণ-শিখায়
হিংস্র লোভের শ্মশানে জালাবে অমর প্রাণ।
প্রেয়সী যখন তূর্য ভাঙবে তোমার ঘর,
জানি সে বিদায়ে ঘর ও বাহির দ্বন্দ্বহীন;
বিজয়ী প্রাণের দীপ্তি নয়নে, গভীর স্বর;
তোমার মধুরে প্রাণপূর্ণতা ছন্দলীন।
বন্ধন নয়, বিশ্বব্যাপ্তি তোমার টানে,
ভাবী সমাজের অজেয় ইসারা তোমার গানে ॥

রুমি-কে

বিষ্ণু দে

কন্যা! তোমাকে জানাই প্রবীণ প্রাণের আশা,
নিশ্চিত জেনো মুক্তি; হবেই শ্রেয় জীবন
মরণান্তিক জয়-ভাষায়
তোমরা গড়বে সমান স্থযোগে প্রেয় জীবন।

কন্যা! তোমাকে ঈর্ষ্যা জানাই শুভার্থীর
নবীন জীবনে স্বপ্রতিষ্ঠ ন্যায়ে ধ্রুব
ছড়াবে তোমরা কতো শুভ।
ভেবো একবার কতো ব্যর্থতা এ-প্রার্থীর ॥

রাত্রিযাপন

অমিয় চক্রবর্ত্তী

বুকে প্রাণটা এম্‌নিই রইল, জানো ভাই,
ঘরে দাঁড়িয়ে মন বল্‌লে শুধু, যাই
—যাই।
প্রকাণ্ড তামার চাঁদ রাত্রে
গ'লে হল সোনা। সোনার পাত্রে
পরে আভার ছড়ালো অন্তর্লীন রোদ্দুর।
নৌকো দূরে গেল বেয়ে সেই নীল অভ্রের সমুদ্দুর।
সেদিন রাত্রে যখন আমার কুমু বোনকে হারাই।

আর, অজ্ঞান মুহূর্তগুলো, তারায়
মিলিয়ে রইল স্বচ্ছধারায়।

জেগে-থাকা চোখে,
মাটিগাছমাঠের জমা-ঠাণ্ডা-দৃশ্য পলকে পলকে
বদ্‌লালো একটু বর্ণ; তবু বর্ণহীন।
একটু আলো ছিল, ক্ষীণ, খুব ক্ষীণ।

আলোর সূক্ষ্মপ্রাণ অণুতে অণুতে কী হচ্ছিল। কালোর মধ্যে দিয়ে উদয়।
অন্য কিছু নয়।

তিরোহিত চন্দ্রবর্ণ আকাশে ঊষা।

এল আবার দিন: প্রাচীন সোনার বেশভূষা।
ঘরের দেওয়ালগুলো ফুটল রাঙা আঁচড়ে।
তার পর? মেঘের স্তরে স্তরে
রোজকার বিষণ্ণ সুন্দর সকাল এলো ভ'রে।

তখন দরজায় দেখ্‌লেম দাঁড়িয়ে—হঠাৎ—আছি সবাই,
জানো ভাই,
—আর সবাই।

বুকের হাড়ে শক্ত কান্না নেই, কেবল, কী জানি,
হয়তো এম্‌নিই মনে-করা,
যাই, একবার যাই। রইলামই তবু। শক্ত ধরা॥

লাইটহাউস

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আবার পেছিয়ে যায় ধীরে ধীরে আসন্ন সন্ধ্যায়,
দূরে জল কৃষ্ণকায় আকাশের অসীম শূন্যতা।
পড়ে থাকে স্বচ্ছ বালু মূক মুগ্ধ রাত্রির নয়নে
তারাদের গান ছোঁয় বিরহের শান্ত মৌনতায়॥

আঁকা হয়ে যায় আজ নিশীথের নীরব শিশিরে
তোমার চরণচিহ্ন বুকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে হাসে।
যা চেয়েছো একদিন পাওনি তো, তবু কি পাওনি?
দেহের নীরব সৌধে, নীবীবন্ধে, আঁখির মুকুরে?

তারপর অজস্র সোনালী গানে, বাতাসের দিগন্ত বিলাস,
ক্ষয়িষ্ণু চাঁদের মুখে, হতাশ্বাসে, কখনো বিষাদে,
একে একে মোছো, আঁকো, ক্ষান্তবর্ষা মেঘের মুকুটে,
মুহূর্তের পূর্ণপাত্রে, আপনার অনন্ত নির্যাসে।

ফিরে আসে বারে বারে স্মরণের মায়াবী স্ফটিকে
পরাগজড়ানো পায়ে অরণ্যের দুরন্ত ভ্রমর,
দুর্নিবার মুহূর্তের হলুদ-ফসলগুলি
ফিরে আসে বারে বারে, ঘিরে থাকে দেহকে কটিকে।

নক্ষত্রসংকেতভরা সচেতনতায়
ছোটো ছোটো আলো জ্বলে, নেভে আর জ্বলে,
তোমার পাঠানো ঢেউ ফিরে আসে; ভাঙে
জাফ্‌রানে-কুমকুমে-ঘুমে
আবার পেছিয়ে যায়।

একজনের জন্মদিনে

গোলাম কুদ্দুস

তোমাদের জন্ম হয়, তোমাদের জন্মদিন আসে।
রূপোর চামচ নিয়ে তোমাদের প্রসন্ন উদয়,
বেশ ভালো জানি তাহা দিনে দিনে হবে স্বর্ণময়,
স্বর্ণমৃগ ভরে দেবে রাঙা পথ কস্তুরী সুবাসে।
আমাদের জন্ম নেই, আমাদের জন্মদিন নেই।
জীবন এসেছে শুধু কুমারী মেয়ের ভ্রূণ সম,
আমাদের দ্বারপ্রান্তে জন্মহীন মৃত্যু মধুরম,
পিতৃহীন জন্ম হাসে চিহ্নহীন মৃত্যু বরণেই!

আমরা কুমারী ভ্রূণ মরে যাই বিদ্ধ ক্রুশ পরে।
জারজ কণ্টকে পুষ্প আছে কি না আছে কোনো দিন
দেখবার অবসর হবে না এ উদ্‌ভ্রান্ত জীবনে।
ঝুলে যাই রজ্জুপাশে, খুলে যায় মৃত্যুর পঞ্জরে
সুনির্দিষ্ট জন্মের অর্গল। ক্ষুধাতুর বাক্য ক্ষীণ
আশীর্বাদ দেবে বুঝি, আশা কর, জন্মের কুক্ষণে!

দৃষ্টি

মণীন্দ্র রায়

দূরাগত বন্দনার গানে
স্খলিত আকাশে দেখি সকরুণ কৃষ্ণচূড়া:
অগ্নিবর্ণ ভয়। কাঁপে থরোথরো।
ঝরে ম্লান অপরাহ্ণে বিষণ্ণ বাতাসে।
আসে নেমে পৃথিবীর বুকে
আহত সেনার শ্রান্ত ক্ষতমুখ হ'তে
বিন্দু বিন্দু রক্তের মতন। ধীরে, অতি ধীরে
চেতনার তীরে তীরে ছেয়ে যায় সম্মোহিত
কী এক জোয়ার! চারিধার
শূন্য, অর্থহীন। যেন মনে হয়
সুপ্রাচীন নগরের অরণ্যানীঘেরা ভগ্নস্তূপ,—
ভয়ঙ্কর, স্তব্ধতায় লীন। অথবা যেমন
এইমাত্র হ'ল শেষ কুরুক্ষেত্র মহারণ: শিবিরে শিবিরে জলে তার
অবসন্ন জয়ের বেদনা।

তবু অন্যমনা
হব না করেছি পণ। দৃষ্টির স্বচ্ছতা
উজ্জ্বল আশ্বাসে খোঁজে অমরতা। চায়
অন্ধকার ছিন্ন ক'রে তীব্রবেগ স্থির অন্বেষণ,
পাতালের গহন পাড়ায়
মরণের প্রেতপিণ্ডে জীবনের দৃঢ়বদ্ধ মূল।
জাগতিক স্থূল হাওয়া
দেয় না যা দেয় তার অধিক আভাস। তাই সর্বনাশ
বিভীষিকা আনে শুধু;

ধু ধু করে বালুচারী ক্ষুধার্ত আবেগ ;
কল্পনার মেঘদল বর্ষণের স্নিগ্ধতায় ব্যর্থ মনোরথে
জলন্ত বজ্রের পথে আপনাকে জানায় মেলে।—
তথাপি ভুলি না আমি
অনামী প্রান্তরে বাড়ে জীবনের শ্যামল অঙ্কুর ;
তারই পল্লবিত সুর মাটির জঠরে সমাহিত।
আমার দৃষ্টির তীরে বারে বারে দেখি অপরূপ
সে গোপন ঐশ্বর্যের মর্মরিত ছায়া। পুঞ্জীকৃত অন্ধকার
আলোকের বজ্রাঘাতে দীর্ণ হয় বুদ্ধির প্রভাতে।
বেদনার মর্মতলে দেখি এক ঐকান্তিক চলে আরাধনা।
আহত সেনার ক্ষতে পুঞ্জীভূত অজ্ঞানের নিরাময় আনে।
সকরুণ কৃষ্ণচূড়া ব্যর্থ নয়, দূরাগত আশ্বাসের প্রতীকের মত
আমার নয়নে ভাসে। দেখি সে জগতে
অগ্নিবর্ণ ভয় নয়, কৃষ্ণচূড়া যেন দীপশিখা
ক্ষতচারী বসন্তের মাঙ্গলিক প্রাঙ্গণের দ্বারে,
উদ্দাম আকাশে আর জলন্ত বাতাসে। হানে
জীবনের বন্দনায় জনগণ অন্তরীক্ষ আন্দোলিত গানে।

ডি. এইচ. রেলওয়ে

আবুল হোসেন

শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিঙ : কী গাড়ি !
আঁকাবাঁকায় ঘুরন্ত চাকায় গরগর গরগর
গর্জে বুনো বাঘেরা। গুঁড়ো গুঁড়ো মধ্যাহ্নের পাথর
ছড়িয়ে ছিট্‌কিয়ে ওড়ে পাহাড়ে পাইনে পাতালে।
দুরন্ত বেগে উড়ন্ত মেঘে শার্সির কাঁচে লেগে
চীনে মাটির ঠুন্‌ঠুনে পবন খানখান।
দুম্‌দাম উঠলাম ছুটলাম নামলাম ঘামলাম :
কী গাড়ী !

দীর্ঘায়ত দীপ্ত বর্শার মতো মধ্যদিন,
ছুটছি শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিঙ।
সামনে পিছে ওপরে নিচে তরঙ্গিত পর্বত—
শন্‌শন এক প্রকাণ্ড ঝোড়ো চিল
উড়চে নীলে অক্লান্ত পাথায় ঘুরে ঘুরে—
সহসা বিদ্যুৎ শীর্ণা ঝর্না চা ভুটানি তন্বী পাইনে মেঘে,
বাঁকানো-শিঙ বুনো বাইসন এই ট্রেন :
শিলিগুড়ি থেকে উঠছি দার্জিলিঙ।

বারবার ছাড়বার নামবার থামবার ঘূর্নিত চক্রে
চক্ষে বক্ষে অন্তরীক্ষে পর্বত ঘড়ঘড় :
পর্বত পর্বত পর্বত বর্বর বর্বর ঝর্‌ঝর পাথর
ঝক্‌ঝক ঝিক্‌মিক চিক্‌চিক কাঞ্চন ঝন্‌ঝন জজ্ঝা—
বর্ষার ঝম্‌ঝম জানলায় চিত্তের পর্বতে
ঝাউ-এর হাওয়া-দেওয়া স্বপ্নের-ফুল-ছোঁড়া ছুটন্ত এই ট্রেন
তিব্বতি এ কী নাচ নাচে রে !
এ কী উজবেকি অদ্ভুত গাড়িরে !

সেতুবন্ধ

বুদ্ধদেব বসু

হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধিব কী দিয়ে
অমর প্রেমের গ্রন্থি,
কেমনে মেলাবো জীবনযজ্ঞে
শত বিপরীত পন্থী—
তা-ই ভাবি মনে-মনে।
থেকে-থেকে ক্ষণে-ক্ষণে
রূঢ় আঘাতে সন্ধ্যায় প্রাতে
হাঁকে সংবাদপত্র,
রেডিওযন্ত্রে মুক্ত ঘৃণার সত্র।

আত্মজাতির রক্তেমাংসে
এত স্বাদ ছিলো কবে!
তবে কি মিলন সম্ভব শুধু
রক্তের তাণ্ডবে?
নয় নয় তাহা নয়।
জানি নিঃসংশয়
রক্তপাথারে হাড়ের পাহাড়ে
যদিও পৃথ্বী মগ্ন
প্রেমের কমল তারি ভূমিসংলগ্ন।

কত নিষ্ঠুর মিথ্যা করেছে
মানুষে মানুষে ভিন্ন,
কীর্তিচূড়ার চরণে জড়ানো
বর্বরতার চিহ্ন।

পাতাল-পিয়াসী যানে
জীবনেরে যদি টানে,
আবোলতাবোলে ক'বো কি তা ব'লে
রসাতলটাই সত্য!
পাশবিকতাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব!

কেমনে জানি না দখিনার বীণা
বাজে তবু প্রাণে-প্রাণে
নবজন্মের রুদ্ধ বীজের
অলক্ষ্য আহ্বানে।
বলে সে, কোরো না ভয়।
নবীন সূর্যোদয়
ঐ দিলো দেখা, জলে তারি রেখা
পাপের পাষাণপুঞ্জে,
বসন্ত আসে প্রেমের কুঞ্জে-কুঞ্জে।

আমি তার শুধু চকিত আভাস
পেয়েছি মর্মমূলে,
তারি মর্মরধ্বনিতে চমকি'
বক্ষ উঠেছে দুলে।
নিভৃত ভাবনাগুলি
ব্যাকুল পক্ষ খুলি'
ছুটে যেতে চায় কোন মোহানায়
জনসমুদ্রপ্রান্তে,
চায় দুরন্ত ভবিষ্যতেরে জানতে।

কত দুরাশার বাণী সে আমারে
চুপে-চুপে যায় ব'লে,
দ্বিধা-বেদনায় ছিন্ন হৃদয়
উল্লাসে উচ্ছলে।
জানি জানি হবে জয়।
তবু ভয়, কেন ভয়?
সূর্যোদয়ের পূর্বরাগের
এ কী নিদারুণ মূর্তি!
অভাবনীয়ের অবিশ্বাস্য ফূর্তি!

হয়তো, যখন দেখা দেবে, হবো
আমিই তোমার বধ্য,
তবু এও জানি, হে নবজীবন
তুমি অপ্রতিরোধ্য।
মনে-মনে মানি ভয়,
তবু বলি হোক জয়।
দীপ্ত তরুণ, আনো তব তূণ
হানো খর শর তীব্র,
করো ধরণীরে চরণশব্দে ক্ষিপ্র।

যারা এতদিন পথের পাথরে
বক্ষ করেছে দীর্ণ,
আর নেই দেরি, এবার তাদেরি
দৃপ্ত প্রাণের চিহ্ন
কত যে ফোটাবে ফুল,
কত যে ভাঙাবে ভুল,

কত ঘটনার ঘূর্নিতে তার
ইতিহাস হবে পূর্ণ,
যা ছিলো, যা আছে—আবর্তে হবে চূর্ণ।

তবু ভয় নেই, জানি আছে সেই
মন্ত্র ওদেরি জানা,
যার সাধনায় বৃথা হ'য়ে যায়
বক্ষে ছুরিকা হানা।
যদি লোভে কিছু কাড়ি
চুরি করি যা আমারি,
নিজেরি স্বার্থে পারিনে কাড়তে
এ কী অদ্ভুত ফন্দি,
আমি আপনারি হিতৈষণায় বন্দী!

অতএব হবে স্বতই রুদ্ধ
হত্যাস্রোতের উৎস,
হিংসায় কোনো লাভ নেই, তাই
হবে তার তেজ তুচ্ছ।
কানে-কানে গানে-গানে
কোন বাণী বাজে প্রাণে,
সে-বাণী শিহরে তুষারশিখরে
নীল সমুদ্র লঙ্ঘে,
বিশ্বমানব-হৃদয়পদ্মে রঙ্গে।

কবিতা

আশ্বিন, ১৩৪৯

জীবনে জীবন যুক্ত হবে কি
নবীন মুক্তছন্দে,
পরস্পরেরে পূর্ণতা দান
সাধনার সেতুবন্ধে।

শেষ হ'লো মিছে চাওয়া
উঠলো প্রেমের হাওয়া,
আকাশে আভাসে তারা ভেসে আসে
যারা চায় ভালোবাসতে,
জলে উল্লাসে তাদের হাতুড়ি কাস্তে।

জীবনে জীবনে মিলনসাধন
সে তো আর কিছু নয়,
যেন ফুল ফোটা, যেন বসন্তে
জেগে-ওঠা কিশলয়।
কিছু হাসি, কিছু কওয়া
কিছু হৃদয়ের ছোঁওয়া
তারি আনন্দে ঘন সুগন্ধে
বিকশে প্রেমের পদ্ম,
এত যা সহজ, তারো পথ কেন বদ্ধ।

প্রাণে-প্রাণে আছে প্রণয়ের বীজ
অথচ ফোটে না ফুল,
এই দুঃসহ বৈপরীত্যে
করো করো নির্মূল
হে বীর, হে জনগণ।

কবিতা

আশ্বিন, ১৩৪৯

জ্বালো তনু, জ্বালো মন,
প্রেমের অরিরে বীর্যের তীরে
করো নিঃশেষে ধ্বংস,
বিলুপ্ত হোক অতিলোভীদের বংশ।

হে মহাজীবন, হে মহাসারথি,
তোমারি ভবিষ্যৎ,!
ভ্রান্তি মাড়ায়ে, বিঘ্ন পারায়ে
চালাও তোমার রথ।
এতকাল যারা পিছে
ছিলো সব চেয়ে নিচে,
তাদের গভীর আদিশক্তির
হও নেতা, হও মন্ত্রী,
দাও তারে চিরলাবণ্যে অবতর্ণি'।

হৃদয়ে-হৃদয়ে বাঁধিবে ওরাই
অমর প্রেমের গ্রন্থি,
জীবনসাধনে মেলাবে সহজে
যত বিপরীতপন্থী।
আসে বসন্ত আসে
পল্লবে ফুলে ঘাসে,
অমৃত-পরশে বিশ্বে করে সে
যৌবনরসে সিক্ত,
প্রণয়-পুণ্যে পূর্ণ মানবচিত্ত।

নব অভিসার

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

মনে রেখো পৃথিবীতে আজ
নয় অভিসার,
নয় কোনো বাঁধভাঙা নূপুরনিক্কণ
বাসবদত্তার,
নয় কোনো আমন্ত্রণ রসে মত্ত বসন্তসখার।
যে-জীবন দেখিয়েছে অন্ধকারে আলো
আজ তো বিপন্ন দীর্ণ প্রাণকেন্দ্র তার,
নিপীড়িত মানুষের আশা-ভরসার
নব সভ্যতার।

আজ তাই প্রত্যহের আরাম-শয্যায়
চিৎ হ'য়ে শুয়ে-শুয়ে ভাবা,
স্বপ্নের জড়ত্ব আনা মজ্জায় মজ্জায়
বন্ধু, আর নয়।
যে-কর্মের মন্ত্র আজ পৃথিবীর বাতাসে-বাতাসে
উগ্র হ'য়ে বয়—
তোমার অধরে চোখে কুন্দশুভ্র বাহুর ডানায়
কখন উঠবে জ্বলে' সেই পরিচয়?
অথবা এসব কিছু নয়।

চা খাওয়া,
সন্ধ্যা হ'লে লেকে কিংবা সিনেমায় যাওয়া—
চারশো টাকায় কেনা জি-ই-সি রেডিয়ো
ঘরে ব'সে শোনা,
এখানেই জীবনের সব-কিছু শেষ?
কবে তুই চোখ ভ'রে অজেয় নির্দেশ?

দিনান্ত

অশোকবিজয় রাহা

একদিকে পাহাড়-চূড়ায়
প্রকাণ্ড সেগুন-বন ঢেকে আছে অর্ধেক আকাশ
জমাট রাত্রির মতো,
বুকে তা'র
ঝিঁঝিঁ-ডাকা গাঢ় অন্ধকার,
শতাব্দীর ঘুম।

অন্যদিকে পাহাড়ের কোলে
ঝিমায় পড়ন্ত-রোদে শালবন,
ছায়া পড়ে ঢালুর কিনারে,
পাশ দিয়ে একখানি আঁকাবাঁকা পথ
নেমেছে সাপের মতো।

মাঝখানে ধূ ধূ ফাঁকা মাঠ,
একখানি আকাশের ফাঁক,
একটি পাখির শিস রেখা টেনে যায়
সূর্যাস্তের দিকে।

একটি প্রেমের কবিতা

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

তুমি চেয়েছিলে আমাকে
মনে নাই কোন যুগ থেকে যেন।
কঠিন দিনের বস্তুপুঞ্জে শাসিত আমি।
এই ত আমি।
কত চাহনির টোকায় বেজেছি নূতন টাকা।
বিনিময় স্রোতে ভেসে গেছি ; গেছে শুক্ল পাখা
একে একে ঝ'রে
জীবন, মৃত্যু, হর্ষ ও শোকে
মিলনে তর্কে অভিসিঞ্চিত।
বহু রাত্রির কুন্তলছোঁওয়া স্মরণশাখায়
বহু ম'রে-যাওয়া পাণ্ডুর কথা
ঝঙ্কৃত হয় এখনো হাওয়ায়।
সেই ত আমি।
তুমি ডেকেছিলে সাথী-প্রার্থীই হয়ে
একাকীত্বের ভয়ের ভ্রূকুটি নিচে।
মহা-মানব বা মহা অমানবও নই।
সহজ মানুষ।
হাসি কান্নায়, প্রেমে ও ঘৃণায় মেশা।
কোনও অঘটন ঘটানো নয় ত পেশা।
তবু আমাকেই খুঁজেছ, চেয়েছ
কঠিন ভাবে।
চির পুরাতন আকাশের নিচে, ছোট ও বড়,
মাঝারি, উচ্চ, উদার, কৃপণ লোকসংখ্যায়,

ভদ্র হাসিরই অনুপ্রাসে,
হৃদয় ভাঙা ও গড়ার উপনিবেশে।
আমার মুখের মুদ্রায় পাও আত্মার ছাপ,
বলেছ অনেক।
স্তবরত দুটি চোখের মেদুর আলোকে পড়েছি লিপি।
মৃদু সন্ধ্যায় বারে বারে ফিরে
জনতার উঁচু শিখরে তোমাকে পেয়েছি একা।
শতবারই যেন প্রথম দেখা।
পরস্পরের প্রাণের কামনা ফলায় ফসল
বৃথা, তা জানি।
তা' দিয়ে বোঝাই সোনার তরণী বুঝি বা ডোবে
মেঘ্‌নার ঝড়ে।
লক্ষ মরণ জন্ম নিয়েছে অমাবস্যার বুকে ;
বিশাল ছায়ারা চুপি চুপি যেন মন্ত্র পড়ে।
আকাশের মত নির্জ্জন নীল মেঘাবরণে
তুমি ও আমি,
মুখোমুখি থাকি। প্রস্তুত হও সহমরণে॥

চব্বিশ লাইনে চতুর্বর্ণাশ্রম

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

ব্রহ্মচর্য

একদা ছিলাম বটে হৃদয়তান্ত্রিক !
ষোলোটি গ্রীষ্মের শেষে প্রথম আষাঢ় !
প্রমাদী হৃদয় আজ ঈষৎ তান্ত্রিক,
বাইশ আষাঢ়ে তার ফতুর ভাঁড়ার !

অথচ সুমুখে আছে কঠিন সংসার ।
মায়ার প্রহারে প্রাণ তাই তো যান্ত্রিক !

গার্হস্থ্য

অবশেষে পঁচিশের তাড়নায় প্রাণ
ঘরে ফিরে প্রাণপণে জোটায় দোসর ।
তারপর ঘানিগাছে ঘোরবার গান
দেয়ালে-দেয়ালে ঘোরে পঁচিশ বছর ।

তারপর একদিন পায় নাকো ঘর
ঘুনধরা হৃদয়ের ঘরমুখী টান ।

বানপ্রস্থ

পঞ্চাশে এসে গেছে হিসেবের খাতা,
প্রত্যহ কলহের হিসেবে বোঝাই ।
আজকে বনের পথ : আছে ঝরা পাতা
আছে নির্জন-চাঁদ, মন-কে বোঝাই !

নির্জনে ঘরে চলে কলহের যাঁতা—
গুঁড়ো নির্জন-চাঁদ, মিথ্যে খোঁজাই !

সন্ন্যাস

আশিতে হতাশ একমাথা পাকাচুল ।
সাবলীল দম্পতী সন্ন্যাস নেয় !
সম্প্রতি হিসেবেতে নেই আর ভুল ।
চুল সে রুপোর চাঁদে আশ্রয় দেয় !

মৃত্যুর দ্বারে ব'সে মোমের পুতুল
মায়ার প্রহারে প্রাণে ভেল্‌কি দেখায়

কাঠখোদাই : শম্ভু সাহা

সমালোচনা

চিঠিপত্র, ১ম ও ২য় খণ্ড। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী। প্রতি খণ্ড ১৲ টাকা।

পৃথিবীর পত্রলেখকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্থান অতুলনীয়। তাঁর বিচিত্র-কর্ম দীর্ঘ জীবনে আত্মীয় ও অনাত্মীয়কে, পরিচিত ও অপরিচিতকে, স্বদেশে ও বিদেশে কত সহস্র চিঠি যে তিনি লিখেছেন তার সঠিক সংখ্যাগণনাও কোনোদিন হয়তো হবে না। এই অসংখ্য চিঠির মধ্যে সবগুলিরই যে আজ অস্তিত্ব আছে তা মনে করবার কারণ নেই, তবে যা আছে তারও পরিমাণ বিপুল ও বৈচিত্র্য অফুরন্ত হওয়া সম্ভব। এই সমস্ত চিঠি সংগ্রহ, নির্বাচন, সম্পাদন ও মুদ্রণ একটি বৃহৎ কিন্তু অবশ্য-পালনীয় কার্য, এবং বিশ্বভারতী প্রশংসনীয় তৎপরতার সহিত এই কাজে হাত দিয়েছেন। চিঠিপত্র নামে এই সিরিজে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র পত্রাবলী ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করা বিশ্বভারতীর সংকল্প; গত পঁচিশে বৈশাখ তার প্রথম খণ্ড এবং আষাঢ় মাসে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

পত্রলেখক-রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে মনীষীমহলে মতভেদ আছে। কবি নিজেই বলতেন যে সত্যিকার চিঠি লিখতে শুধু মেয়েরাই পারেন, এবং তিনি নিজে বিশ্বসাহিত্যে যে-ক'টি ভালো চিঠির সাক্ষাৎ পেয়েছেন তা সবই স্ত্রীলোকের লেখনীপ্রসূত। অনেকে বলেন যে রবীন্দ্রনাথ কখনো চিঠি লিখতেন না, পত্রাকারে প্রবন্ধ শুধু লিখতেন; তাঁর চিঠিও তাঁর সাহিত্যেরই অঙ্গীভূত, তাঁর অন্যান্য গদ্যরচনার মতোই রূপকল্পে নিখুঁত, ভাষার মনোহারিত্বে অপরূপ। চিঠি হওয়া উচিত ঢিলে-ঢোলা, মুখে-বলা কথার মতো, তার চাল হালকা, চলন আঁকাবাঁকা, আর—সবচেয়ে বড়ো কথা—যাঁকে লেখা হচ্ছে এবং যিনি লিখছেন এ দু'জনের মধ্যে নিরন্তর ভাব-বিনিময়ে সজীব। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চিঠির গ্রহীতা লক্ষ্য নন; উপলক্ষ্য মাত্র। চিঠিতে তিনি উপদেষ্টা, দার্শনিক, সমালোচক, হাস্যরসিক, ভ্রাম্যমাণ কিংবা কবি—নিছক পত্রলেখক কখনোই নন।

রবীন্দ্রনাথের চিঠি সম্বন্ধে এই ধারণা প্রচলিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে। কবির জীবদ্দশায় তাঁর যত চিঠি প্রকাশিত হয়েছে, তা সবই সাহিত্যিক কারণেই মূল্যবান, এবং 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' থেকে 'রাশিয়ার

চিঠি' পর্যন্ত সবই প্রকাশিত হবার জন্যই লেখা। শুধু 'ছিন্ন পত্র'ই যথার্থ-ভাবে 'ব্যক্তিগত' চিঠি, কিন্তু তা থেকে ব্যক্তিগত অংশগুলি ছাঁটাই ক'রে নিয়ে এমনভাবে উপস্থিত করা হয়েছে যে সেটি বাংলা গদ্য সাহিত্যের একটি অনিন্দ্য গ্রন্থরূপেই আমরা পেয়েছি, যার তুলনা একমাত্র 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'র সঙ্গে, যেখানে উপমায়, অলংকারে, কবিত্বে, কৌতুকে, বিচিত্র অজস্র বর্ণচ্ছটায় রবীন্দ্রনাথের গদ্য আমাদের এতই মুগ্ধ করে যে প্রশংসা করবার ভাষা পর্যন্ত খুঁজে পাইনে। 'রাশিয়ার চিঠি' যাঁদের কাছে লেখা তাঁরা যেমন উপলক্ষ্য মাত্র, 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'র গ্রহিত্রীও তেমনি। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ কুড়ি বছরের চিঠিপত্র প্রায় সবই যে-কোনো লোককেই লেখা হ'তে পারতো, একে লেখা না-হ'য়ে ওকে লেখা হ'লে খামের উপর নাম-ঠিকানা ছাড়া তার কিছুই প্রায় বদলাতে হয় না। অর্থাৎ তাঁর শেষ দিককার সব চিঠিই সরকারি চিঠি। তাতে অবাক হবারও কিছু নেই, কারণ তাঁর যে-কোনো চিঠি যে যে-কোনো সময়ে ছাপার অক্ষরে বেরোতে পারে মনে-মনে তিনি কি আর তা না জানতেন!

অবশ্য সাহিত্যিকের চিঠিতে সাহিত্যের স্বাদ থাকবে তাতে অন্যায্য কিছু নেই, বরং সেটাই আশা করা সংগত। বিশেষত, রবীন্দ্রনাথের মতো বাণীসিদ্ধ পুরুষ—তিনি যে কাগজে কলম ছোঁয়ালেই সাহিত্যের সৃষ্টি হবে এ-কথা সহজ সত্য হিসেবে মেনে নেয়াই ভালো। তাঁর চিঠি চিঠি নয়, বিশুদ্ধ সাহিত্য—এ কথা ব'লে যাঁরা আপত্তি করেন তাঁদের আমরা বলবো, তা হ'লোই বা! সাহিত্য কি ভালো নয়? তবু, সেই সঙ্গে এও বলবো যে রবীন্দ্রনাথের বে-সরকারি চিঠিপত্র, যা তিনি সংসারের নানা সুখেদুঃখে জড়িত মানুষ হিসেবেই লিখেছেন, সেগুলো আমাদের অধিগম্য হওয়া আবশ্যক—এবং এর কারণ শুধুই প্রগল্‌ভ কৌতূহল নয়। এমন একটা সময় ছিল যখন তিনি বিশ্বজয়ী মহাকবি হননি—এবং সে-সময়টাই তাঁর জীবনের বৃহত্তর অংশ। সেই সময়কার লেখা তাঁর 'ব্যক্তিগত' চিঠিপত্র প্রকাশিত হ'লে তবেই তাঁর জীবনী-রচনার সম্পূর্ণ উপাদান সংগৃহীত হ'তে পারে।

'চিঠিপত্রে'র প্রথম খণ্ড আমাদের এই প্রত্যাশা পূর্ণ করেছে। এতে আছে সহধর্মিণীকে লেখা কবির ৩৬ খানা চিঠি; সময়, ১৮৯০—১৯০১। পত্নীকে লেখা এই ৩৬ খানা চিঠিই কালের কবল এড়িয়ে এতদিন টি'কে ছিলো, এবং অত্যন্ত দুঃখের কথা এই যে কবিকে লেখা কবিপত্নীর একখানি চিঠিও খুঁজে পাওয়া যায়নি। অন্যান্য ব্যক্তিদের কাছে লেখা মৃণালিনী দেবীর তিন খানা চিঠি এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।

যাঁরা খুব বেশি খুঁতখুঁতে তাঁরাও মানবেন যে রবীন্দ্রনাথের এ-চিঠিগুলিকে বলা যেতে পারে সত্যিকার চিঠি। এদের মধ্যে সাহিত্যিক জৌলুষ নেই, ভাষার বিস্ময়কর চমৎকারিত্ব নেই, এরা শিল্পকর্ম নয়, জীবনকর্ম, এরা ব্যক্তিগত—রবীন্দ্রনাথের মতো বৃহৎ মনের পক্ষে যতটা ব্যক্তিগত হওয়া সম্ভব। এই পাতাগুলোয় যাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি তিনি আমাদের আবাল্য পরিচিত কবি রবীন্দ্রনাথ নন, তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামের একজন বাঙালি ভদ্রলোক, বয়স তিরিশ থেকে চল্লিশ, সংসারের নানা দায়িত্বে জড়িত, পুত্রের শিক্ষা ও একাধিক কন্যার বিবাহ নিয়ে ভাবিত, প্রগাঢ় পত্নীপ্রেমিক, অত্যন্ত স্নেহশীল ও কর্তব্যপরায়ণ পিতা, বিবেকবান ও অনলস গৃহস্থ। রবীন্দ্রনাথের এই ছবিটি ঠিক এমনভাবে এর আগে আমরা কখনো পাইনি। চিঠিগুলি বেশির ভাগই জমিদারির বিভিন্ন জায়গা থেকে লেখা, সেইজন্য তাঁদের গার্হস্থ্য জীবনের ছবিটি আরো বেশি জীবন্ত হ'য়ে ফুটেছে। এখানে দেখতে পাচ্ছি রবীন্দ্রনাথ কখনো দইমাছ পাঠাচ্ছেন, কখনো 'উৎকৃষ্ট মাখনমারা ঘের্ত্ত', কখনো বা মুগ, কলাই, গুড়—এবং জিনিসগুলোর প্রাপ্তিসংবাদ ঠিক সময়মতো না-পেয়ে ব্যস্তও হ'য়ে পড়ছেন, এদিকে নিজে কী খাচ্ছেন এবং কতটুকু খাচ্ছেন তাঁর ফর্দ স্ত্রীকে পাঠাতে ভুলছেন না। এখানে রবীন্দ্রনাথ ডিকিনসনের বাড়ির একশো বিরাশি টাকার বিল নিয়ে বিব্রত, 'রাজর্ষি'কে স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের তালিকায় উন্নীত করতে সচেষ্ট, জমিদারি সংক্রান্ত নানা হাঙ্গামায় পীড়িত, কলকাতার শহরে ঘোড়ার গাড়ি ক'রে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে গান শেখাতে ব্যস্ত, এবং পৃথিবীর সব স্বামীদেরই মতো চিঠি লেখার ব্যাপারে স্ত্রীর উদাসীনতায় বিক্ষুব্ধ। এই পত্রগুলির লেখক যে একজন সাহিত্যশিল্পীও সে-কথা আভাসে-ইঙ্গিতে প্রসঙ্গক্রমে ছড়িয়ে আছে মাত্র, কোনোখানেই সাহিত্যকর্ম প্রধান হ'য়ে ওঠেনি। কিন্তু এই গার্হস্থ্যধর্মী ভদ্রব্যক্তিটি যে সমস্ত কাজকর্ম থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে কোনো-একটা বৃহৎ শান্তির জায়গায় আশ্রয় পেতে ব্যাকুল সে-কথা বারে-বারেই স্পষ্ট হ'য়ে ফুটেছে। 'কবিত্ব এবং সংসার এই দুটোর মধ্যে বনিবনাও আর কিছুতে হয়ে উঠল না দেখছি। কবিত্বে এক পয়সা খরচ নেই (যদি না বই ছাপাতে যাই) আর সংসারটাতে পদে পদে ব্যয়বাহুল্য এবং তর্কবিতর্ক।'—(২৩ পৃঃ) 'সেইজন্যেই আমি কলকাতার স্বার্থদেবতার পাষাণ মন্দির থেকে তোমাদের দূরে নিভৃত পল্লীগ্রামের মধ্যে নিয়ে আসতে এত উৎসুক হয়েছি।'—(৪৩ পৃঃ) এই বোধ হয় শান্তিনিকেতনের পূর্বাভাস,—'কোন রকম করে জীবন-যাত্রাকে অত্যন্ত সরল করে না আনতে পারলে জীবনে যথার্থ সুখের স্থান পাওয়া যায় না—জিনিষপত্রে গোলেমালে

হাঙ্গামহুজুতে হিসেবপত্রেই সুখসন্তোষের সমস্ত জায়গা নিঃশেষে অধিকার করে বসে—আরামের চেষ্টাতেই আরাম নষ্ট করে দেয়। ··· আমার প্রাণের ভিতরটা কেবলি অহর্নিশি ফাঁকার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে—সে ফাঁকা, কেবল আকাশ বাতাস এবং আলোকের নয়—সংসারের ফাঁকা, আয়োজন আসবাবের ফাঁকা, চেষ্টা চিন্তা আড়ম্বরের ফাঁকা—খাওয়া পরা আচার ব্যবহার সমস্ত সরল সংযত পরিমিত পরিচ্ছন্ন—চারিদিকে বেশ সহজ শান্ত স্বল্পতা—ড্রয়িংরুম না, নবাবীও না—তক্তপোষ এবং ঢালা বিছানা—শান্তি এবং সন্তোষ—কারো সঙ্গে প্রতিযোগিতা না, বিরোধ না, স্পর্দ্ধা না—এই হ'লেই জীবন নিজেকে সফল করবার অবকাশ পায়। যাই নাইতে।' (৭৯ পৃঃ)—না-ব'লে পারলুম না—'যাই নাইতে' কথাটি কী সুন্দর বসেছে এখানে, এও কি সাহিত্য নয়?—তারপর এর কয়েক পৃষ্ঠা পরেই—'আজ শান্তিনিকেতনে এসে শান্তিসাগরে নিমগ্ন হয়েছি।' (৯২ পৃঃ)

অন্য এক দিক থেকেও এ-চিঠিগুলি সত্যিকার চিঠি, যিনি লিখছেন আর যাঁকে লেখা হচ্ছে এ দু'জনের সংযোগ এখানে অব্যাহত। এখানে মৃণালিনী দেবী নিষ্ক্রিয় গ্রহিত্রী মাত্র নন, এ-চিঠিগুলো তাঁরও রচনা, এদের ভিতর দিয়ে তাঁকেও আমরা দেখতে পাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথের দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে এ-পর্যন্ত খুব অল্পই জানা গিয়াছে, এ-বিষয়ে হেমলতা দেবীর একটি মাত্র প্রবন্ধ অনুধাবনযোগ্য, তাছাড়া আর-কিছু লেখা হয়নি। কবি নিজে তাঁর জীবনের এই দিকটিকে তাঁর অজস্র লেখার কোনোখানেই উন্মোচিত করেননি, এমন কি মুখেও সহজে কিছু বলতে চাইতেন না—এ-বিষয়ে তাঁর একটি সশ্রদ্ধ এবং দুর্লঙ্ঘ্য সংকোচ দিলো ব'লে মনে হয়। কবিপত্নী সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট ছিলো। এতদিনে এই চিঠিগুলির ভিতর থেকে তিনি বেরিয়ে এলেন—আমরা দেখতে পেলুম তাঁর প্রসন্ন সহাস্য মাতৃমূর্তি, মঙ্গলকর্মে উৎসুক, স্বামীর আদর্শপালনের প্রেরণায় ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত। এই ছবিটুকু দুটি-চারটি ছোটো রেখায় আমাদের মনে আঁকা হ'য়ে গেলো। স্বামীকে লেখা তাঁর চিঠিগুলি পেলে ছবিটি ভ'রে উঠতো, কিন্তু এটুকু যে পেলুম তার জন্যই আমরা কৃতজ্ঞ।

তাছাড়া এ-চিঠিগুলি রবীন্দ্রনাথেরও এমন একটা দিক প্রকাশ করেছে যা আমরা আগে কখনো দেখিনি। এদের মধ্যে একটি অবর্ণনীয় স্নিগ্ধতা আছে যার স্বাদ সাহিত্যের নয়, জীবনের। চিঠিগুলি কৌতুকে উজ্জ্বল, মাঝে মাঝে দু'এক লাইন আশ্চর্য বর্ণনা হঠাৎ এসে গেছে, আবার কোথাও-কোথাও বেজেছে গভীর গম্ভীর সুর—কিন্তু এই পত্রগুচ্ছে সে-সব প্রধান

নয়, লেখকের হৃদয়বৃত্তিই প্রধান। স্ত্রী-পুত্র-কন্যার প্রতি—শেষের দিকে জামাতার প্রতি—একটি অবিরল স্নেহ-স্রোত চিঠিগুলিকে প্রাণ দিয়েছে—যা বলেছেন তার চাইতে যা বলেননি তাতেই সে স্নেহ বেশি ধরা পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ স্নেহশীল ছিলেন কিন্তু স্নেহান্ধ ছিলেন না, পুত্রকন্যাকে নিজের কাছে আঁকড়ে ধ'রে রাখাই যে মঙ্গল এমন মোহ তাঁর মনে কখনো ছিলো না। পুত্রের শিক্ষার কথা চিঠিগুলিতে বারে-বারেই ফিরে-ফিরে আসছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জীবনের শিক্ষার উপরেই তাঁর নির্ভর ছিলো। —'ছেলেদের জন্যে সর্ব্বদা আমার মনের মধ্যে যে একটা উদ্বেগ থাকে সেটা আমি তাড়াবার চেষ্টা করি। ওরা যাতে ভাল হয়, ভাল শিক্ষা পায় আমাদের সাধ্যানুসারে সেটা করা উচিত, কিন্তু তাই নিয়ে মনকে উৎকণ্ঠিত করে রাখা ভুল। ওরা ভাল মন্দ মাঝারি নানা রকমের হয়ে আপন আপন জীবনের কাজ করে যাবে—ওরা আমাদের সন্তান বটে তবু ওরা স্বতন্ত্র—ওরা যে রকম মানুষ হয়ে দাঁড়াবে সে ঈশ্বরের হাতে—আমরা সেজন্য মনে মনে কোনরকম অতিরিক্ত আশা রাখবনা।' (৫১পৃঃ) সবচেয়ে মর্ম্মস্পর্শী বোধ হয় বড়ো মেয়ের বিয়ের পরে লেখা চিঠিগুলি। জামাতার প্রশংসা তাঁর মুখে আর ধরে না, মেয়ের সুখের সম্ভাবনায় তিনিই আনন্দে উদ্বেল। '…বেলা যেন তাকে ভাল করে চিঠিপত্র লেখে। কি পাঠ লিখতে হবে যদি ভেবে না পায় আমাদের চিরকেলে দস্তুরমত শ্রীচরণকমলেষু লিখলেই হয়—বাঁধা দস্তুরে গেলে ভাবনা থাকে না।' (৭৩ পৃঃ) 'বেলাকে রেখে এলুম। তোমরা দূরে থেকে যতটা কল্পনা করচ ততটা নয়—বেলা সেখানে বেশ প্রসন্নমনেই আছে—নতুন জীবনযাত্রা তার যে বেশ ভালোই লাগচে তার আর সন্দেহ নেই। এখন আমরা তার পক্ষে আর প্রয়োজনীয় নই। আমি ভেবে দেখলুম বিবাহের পরে অন্তত কিছুকাল বাপমায়ের সংসর্গ থেকে দূরে থেকে সম্পূর্ণভাবে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হবার অবাধ অবসর মেয়েদের দরকার। বাপ মা এই মিলনের মাঝখানে থাকলে তার ব্যাঘাত ঘটে। …দিতে যখন হবেই, তখন আবার হাতে রাখবার চেষ্টা করা কেন? এ স্থলে মেয়ের সুখ এবং মঙ্গলই দেখবার বিষয়…বেলা বেশ সুখে আছে সেই কথা মনে করে তোমার বিচ্ছেদ দুঃখ শান্ত করতে চেষ্টা কোরো।…ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে নিজের সুখ দুঃখ একেবারেই বিস্মৃত হওয়া উচিত। তারা আমাদের সুখের জন্য হয়নি।…কাল সমস্তক্ষণ বেলার শৈশব-স্মৃতি মনে পড়ছিল। তাকে কত যত্নে আমি নিজের হাতে মানুষ করেছিলুম। তখন সে তাকিয়াগুলোর

মধ্যে আবদ্ধ হয়ে কি রকম দৌরাত্ম্য করত—সমবয়সী ছোট ছেলে পেলেই কি রকম হুঙ্কার দিয়ে তার উপর গিয়ে পড়ত—কি রকম লোভী অথচ ভালমানুষ ছিল—আমি ওকে নিজে পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়িতে স্নান করিয়ে দিতুম—দার্জিলিঙে রাত্রে উঠিয়ে উঠিয়ে দুধ গরম করে খাওয়াতুম—যে সময় ওর প্রতি সেই প্রথম স্নেহের সঞ্চার হয়েছিল সেই সব কথা বারবার মনে উদয় হয়। কিন্তু সে সব কথা ও ত জানে না—না জানাই ভাল। বিনা কষ্টে ওর নতুন ঘরকন্নার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে নিজের জীবনকে ভক্তিতে প্রেমে স্নেহে সাংসারিক কর্ত্তব্যে পরিপূর্ণতা দান করুক! আমরা যেন মনে কোন খেদ না রাখি।' (৮৯-৯২ পৃঃ)

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হ'লো, কিন্তু পিতৃস্নেহের এই রকম বেদনাসুন্দর করুণ উজ্জ্বল প্রকাশ সাহিত্যে দুর্লভ।

'চিঠিপত্রে'র প্রথম খণ্ডে 'ভাই ছুটি' সম্বোধন থেকে শুরু ক'রে পরিশেষে 'রবি' পর্যন্ত সমস্তটাই ঘরোয়া, কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ড সম্বন্ধে ঠিক সে-কথা বলা যায় না। এই খণ্ডের চিঠিগুলি যদিও শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা, এদের মেজাজ একটু আলাদা। ঘরোয়া কথা খুব বেশি নেই, পাঠ 'কল্যাণীয়েষু', আর স্বাক্ষর 'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'—শুধু শেষের ক'টি চিঠিতে 'বাবা'। বোধ হয় বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ ইচ্ছে ক'রেই এমন সব চিঠি নির্বাচন করেছেন যা নিয়ে সর্বসাধারণ উৎসাহী হ'তে পারে। সেদিক থেকে নির্বাচন খুব ভালো হয়েছে, কারণ বর্তমান সময়ে বিশ্বব্যাপী সর্বনাশের মধ্যে ব'সে এই চিঠিগুলি থেকে এমন কয়েকটি বাণী আমরা আহরণ করতে পারি যা আমাদের আশা দেবে, সাহস দেবে, হয়তো শক্তিও দেবে। সেদিক থেকে এ-চিঠিগুলির মূল্য অপরিমেয়, এবং এ-ধরনের চিঠি আরো যত প্রকাশিত হয়, ততই ভালো।

দ্বিতীয় খণ্ডের পত্রাবলীর রচনাকাল ১৯০৩ থেকে ১৯৪০। প্রথম দিকের কয়েকটি চিঠি পারিবারিক ও শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের বিষয়ে। তারপর কিছু আছে বিদেশ থেকে লেখা—এই খণ্ডের সে-অংশই সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য এর পারিবারিক অংশ ক্ষীণ হ'লেও তুচ্ছ নয়। কন্যার বিবাহের পর একটি চিঠি উদ্ধৃত করেছি, তার সঙ্গে মিলিয়ে দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় চিঠিটি পড়া যেতে পারে—সম্ভবত রথীন্দ্রনাথের বিবাহের অনতিপরে লেখা। যেমন প্রথম খণ্ডে বিশেষভাবে কন্যার প্রতি, তেমনি এখানে বিশেষভাবে পুত্রবধূর প্রতি একটি মধুর সশ্রদ্ধ স্নেহ পর-পর কয়েকটি চিঠিতে প্রবাহিত। সন্তানের

স্বাতন্ত্র্যস্বীকারের কথা বার-বার এসেছে।……‘এই মহৎ জীবনকে তোদের দু'জনের যোগে গড়ে তুলতে হবে তাই এখন থেকেই তপস্যা চাই। তোদের ভিতরে থেকে কিছু করা এখন আমার পক্ষে অসম্ভব—করতে চেষ্টা করাও ঠিক উচিত হবে না—কেননা স্বাতন্ত্র্য সকলেরই আছে—নিজের জীবনের ও সংসারের সমস্যা অন্য কারো দ্বারা পূরণ হয় না—বাইরে থেকে কোনো আইডিয়া চাপাতে গেলে সেটা পীড়ার কারণ হয়ে ওঠে, তাতে মঙ্গলও হয় না—আমার জীবনের ক্ষেত্র অন্যত্র—সে ক্ষেত্র আমিই গড়েছি এখনো আমাকেই গড়তে হবে—আমার জীবনও তার সঙ্গে পরিণতি লাভ করবে। তোদের পক্ষেও সেই রকম তোদের সংসার।’ (৮পৃঃ) ‘আজকাল একেবারে আমার স্বভাবের উল্টো চালে চল্‌চি—তোদের দিনরাত্রি এমন করে আঁকড়ে ধ’রে আছি যা অন্যায় এবং হাস্যকর। সেজন্যে নিজের পরে অশ্রদ্ধাই হচ্ছে। আমি চিরদিন প্রত্যেক মানুষকে তার নিজের প্রকৃতি অনুসারে নিজের পথে চলতে দেবার পক্ষপাতী কিন্তু আজকাল কেবলি আমি তোদের উপরে জবরদস্তি করে নিজের ideal impose করবার জন্য এমন একটা প্রচণ্ড ব্যগ্রতা প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছি যে সে ভারি অদ্ভুত। —আমার বিশ্বাস এইবার থেকে আমি এই ভয়ঙ্কর মোহজাল থেকে নিষ্কৃতিলাভ করে আবার আমার প্রকৃতি ফিরে পাব।’ (৩০—৩১ পৃঃ)

দ্বিতীয়খণ্ড থেকে আরো কয়েকটি কথা উদ্ধৃত ক’রে সমালোচনা শেষ করি।

(১) পৃথিবী থেকে স্বাদেশিক অভিমানের নাগপাশ বন্ধন ছিন্ন করাই আমার শেষ বয়সের কাজ। (৫৬ পৃঃ)

(২) আমাদের বন্দেমাতরং মন্ত্র বাংলাদেশের বন্দনার মন্ত্র নয়—এ হচ্চে বিশ্বমাতার বন্দনা—সেই বন্দনার গান আজ যদি আমরা প্রথম উচ্চারণ করি তবে আগামী ভাবী যুগে একে একে সমস্ত দেশে এই মন্ত্র ধ্বনিত হ’য়ে উঠবে। (৫৯ পৃঃ)

(৩) এবার রাশিয়ার অভিজ্ঞতায় আমাকে গভীরভাবে অনেক কথা ভাবিয়েচে। প্রচুর উপকরণের মধ্যে আত্মসম্মানের যে বিঘ্ন আছে সেটা বেশ স্পষ্ট চোখে দেখতে পেয়েছি। সেখান থেকে ফিরে এসে মেগুেলদের ঐশ্বর্য্যের মধ্যে যখন পৌঁছলুম একটুও ভালো লাগলোনা—ব্রেমেন জাহাজের আড়ম্বর এবং অপব্যয় প্রতিদিন মনকে বিমুখ করেছে। ধনের বোঝা কি প্রকাণ্ড এবং কি অনর্থক। (৯৭ পৃঃ)

(৪) যেরকম দিন আসচে তাতে জমিদারীর উপর কোনোদিন আর ভরসা রাখা চল্‌বে না। ও জিনিষটার উপর অনেককাল থেকেই আমার মনে মনে ধিক্কার ছিল এবার সেটা আরো পাকা হয়েচে। যে সব কথা বহুকাল ভেবেচি এবার রাশিয়ায় তার চেহারা দেখে এলুম। তাই জমিদারী ব্যবসায়ে আমার লজ্জা বোধ হয়। আমার মন আজ উপরের তলার গদি ছেড়ে নীচে এসে বসেচে। দুঃখ এই যে ছেলেবেলা থেকে পরোপজীবী হয়ে মানুষ হয়েচি। …এদিকে দেশের ইতিহাসে একটা নূতন অধ্যায় দেখা দিয়েচে। অনেক কিছু উলটপালট হবে।…দুঃখের দিন যখন আসে তখন তাকে দায়ে পড়ে মেনে নেওয়ার চাইতে এগিয়ে গিয়ে মেনে নেওয়া ভালো…। ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে দুঃখ সকলকেই পেতে হবে—এখনি পাচ্চে, সঙ্কট এড়িয়ে আরামে থাকার প্রত্যাশা করাই ভুল।…এটা খুব করে বুঝেচি আমাদের সব চেয়ে বড়ো কাজ শ্রীনিকেতনে। সমস্ত দেশকে কি করে বাঁচাতে হবে এখানে ছোট আকারে তারি নিষ্পত্তি করা আমাদের ব্রত। যদি তুই রাশিয়ায় আসতিস এ সম্বন্ধে অনেক তোর অভিজ্ঞতা হোত। (১০৩—১০৫ পৃঃ)

(৫) তোরা রাশিয়ায় যদি আসতিস তা'হলে বুঝতে পারতিস কাজ করবার ঢের আছে। কম টাকা হলেও চলে যদি বুদ্ধি থাকে ও উদ্যম থাকে, যদি নিজের উপরে ভরসা থাকে।

আরো অনেক কথা তুলে দিতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু এই সমালোচনা যিনি পড়ছেন তিনি আশা করি আলোচ্য বইখানা পড়েছেন, এবং এখনো না-প'ড়ে থাকলে অবিলম্বে পড়বেন।

এই বইগুলির আকার ও মূল্য দুই-ই আমাদের পকেটের উপযোগী, আর বিশ্বভারতীর সব বইয়েরই মতো মুদ্রণ অতি পরিপাটি। একটি ছোটো আপত্তি শুধু জানিয়ে রাখি—চিঠিগুলোর ধারাবাহিক নম্বর থাকলে উল্লেখের সুবিধে হয়। এই সিরিজের অন্যান্য খণ্ডের আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করবো—আশা করি রবীন্দ্রনাথের চিঠি যাঁদের কাছে আছে তাঁরা কিংবা তাঁদের উত্তরাধিকারীরা চিঠিগুলি বিশ্বভারতীর অধিগম্য করতে কৃপণতা করবেন না। বিদেশি বন্ধুদের কাছে লেখা রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য ইংরেজি চিঠিও নিশ্চয়ই আছে—যুদ্ধাবসানে সেগুলিও সংগ্রহ ও প্রকাশ করা বিশ্বভারতীর অন্যতম কর্তব্য।

বুদ্ধদেব বসু

নানা কথা—সমর সেন। কবিতা ভবন। মূল্য—বারো আনা।

বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে নানাভাবে পীড়িত ও বিব্রত এটা আমার নতুন আবিষ্কার নয়, সকলেরই মর্মে মর্মে এ গ্লানিকর তথ্য জানা আছে। এবং এর তত্ত্বের দিকটাও খুব বেশী অননুভূত বা অজ্ঞাত নয়,—মূলত অর্থনৈতিক, কিন্তু এটা দাসদেশ ব'লে রাজনৈতিক দিকটারও উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক। কিন্তু এ সমস্তই জানা কথা। পুনরাবৃত্তি করা যে কেবল অনর্থক তাই নয়, বিরক্তিকরও। তথাপি বর্তমান পুস্তকের আলোচনা ও রসোপভোগের জন্য এ প্রসঙ্গের অবতারণা পশ্চাদ্‌পট হিসাবে কার্য্যকরী ছিল।

কারণ, সমর সেনও বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একজন; এবং তাঁর কবিতাও ঐ শ্রেণীরই মালমশলা থেকে রচিত, অথবা নির্মিত। বলা বাহুল্য একথার দ্বারা কবিকে ছোট ক'রে দেখানো আমার উদ্দেশ্য নয় (কারণ, কবি বড় কি ছোট সেটা কেবল তিনি কোন অর্থনৈতিক শ্রেণীর লোক, তাই দিয়েই নিরূপিত হয় না) আমার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ঘটনাটা জানানো।

বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভিতর নানাদিকেই ক্ষয়িষ্ণুতার (অথবা সমরবাবুর লাগসই শব্দচয়নে—অবক্ষয়ের) চিহ্ন খুব সুস্পষ্ট। মনে হয় যেন কোনো-দিকেই আর কোনো পথ নেই, আশ্বাস নেই, এখন কেবল গভীর বিপদে হাত পা গুটিয়ে হা হুতাশ ক'রতে ক'রতে ঘটনাস্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করণীয় নেই। এবং যদিও বোঝা যাচ্ছে এভাবে কখনো চলতে পারে না, সর্বনাশ সুনিশ্চিত, তথাপি কেমন ক'রে যেন নিজের জালে নিজেই তারা জড়িয়ে পড়েছে, কেটে বেরোবে—দাঁতে এমন ধারটুকু পর্যন্ত নেই। এতদিন সমর সেনের কবিতার নায়কগুলিও ছিল প্রায়শঃ এই শ্রেণীরই প্রতিনিধি। 'কয়েকটি কবিতা' ও 'গ্রহণ' তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অন্যান্য মধ্যবিত্ত পুঙ্গবের মত তারাও দেখি সেখানে হা হুতাশ করে, মাঝে-মাঝে অক্ষম আক্রোশে নিজের গায়েই নিজে দাঁত বিঁধিয়ে দেয়, কিন্তু জ্বালা তাতে কমে না, পথের রেখাও চোখে পড়ে না, কেবল অন্তরে বাইরে বেদনার অন্ধকারই পাথরকঠিন হয়।

তবু আশা যায় না। মনে হয় যেন কোথায় একটা পথ আছে, অলক্ষ্যে কোথায় যেন মুক্তির মন্ত্রধ্বনি মেঘের গুরুগুরু ধ্বনিতে ভাষা খোঁজে, দূরে থেকে যেন অগাধবিস্তারের উদ্বেলিত সমুদ্রগর্জন কানে আসে। কিন্তু বারে বারেই ব্যর্থতার প্রতারণা। আবার জমে ক্ষোভ, অতলস্পর্শী ঘৃণা, আর বিষনীল বিদ্রূপের জ্বালা। তবু আশা যায় না।

সমস্ত কবিতাতেই ছিল এই সুর। রকমফের ছিল, ঘটনাসংস্থাননৈপুণ্যে এবং নানারকম কাব্যালঙ্কারের সার্থক প্রয়োগে বাহাদুরীও অবশ্যই ছিল। ('বাহাদুরী' কথাটা সস্তায় মেরে দেওয়া অর্থে ব্যবহার করি নি, ভাল অর্থে ব্যবহার করেছি।)

কিন্তু বর্তমান কবিতাপুস্তকে পৌঁছে দেখি দৃষ্টিভঙ্গী রীতিমত পৃথক। কবির কাব্যাদর্শ এখানে আগেকার বই দুইখানির মত কেবলমাত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবক্ষয়ের লক্ষণ চিত্রণেই সাঙ্গ নয়। এখানে কবি চোখ ফিরিয়েছেন প্রথমত নিজের দিকে, তারপর সমাজের দিকে,—সাধনা চলেছে ব্যষ্টিকে কী ক'রে সমষ্টির মধ্যে বিলীন করা যায়। তাই, যদিও

বুঝি পিঙ্গল বালুচর সর্বভুক, অবিনশ্বর। (রোমন্থন)
আমার দেশে দুধারে স্তব্ধ ধূসর মাঠ (হসন্তিকা)
বন্ধু তোমরা ফিরে যাও ঘরে (ঘরোয়া)
আমাদের বসন্ত বাগান ভেসে যাবে রক্ত স্রোতে (কয়েকটি মৃত্যু)
একা কাক অধোমুখ, জাগে জীর্ণ গাছের উপরে (সারনের গান)
পুরাতন অস্বস্তি আমাকে ঘেরে
দিনশেষের জানোয়ার (শবযাত্রা)
দিনরাত্রি লোহিত ধূলোয় রুদ্ধমুখ আকাশ;
বিতর্ক বৃথা; আজ হৃদয় সঙ্কীর্ণ গলি। (ঐ)
সত্তার কৌলীন্য খোয়াবো না কোনোদিন
এ গর্বে জিইয়ে থাকে বুদ্ধিজীবীরা। (নববর্ষের প্রস্তাব)
চলিত সভ্যতার মোড়ে বিপরীত মতামতে ধাঁধাঁ লাগে
কোন্ ঘাটে তরী ভিড়াই? (ঐ)

তথাপি সংগ্রামের শেষ নেই,—শেষের কবিতা কটিতে এ প্রয়াস রীতিমত স্পষ্ট,—সেখানে:

আমার এ স্তব্ধতা ভেঙে দাও,
মাঠে সকালে সবুজ ফসল জ্বালো,
শূদ্রের অসমাপ্ত বৃত্ত পূর্ণ করো
তোমার দানে। (শবযাত্রা)
অগণন জনগণ অচিরাৎ মিশে যাবে এ ভিড়ে
রক্তাক্ত শরীর (ঐ)
আশ্বিনের সকালে মনে হয়, দূরে সমুদ্রের ধারে
অসংখ্য অশ্বারোহী
বিচ্ছুরিত নীল অন্ধকারে
ক্ষণে ক্ষণে বালুতে নামে
হলুদ বালি দিনরাত্রি জ্বলে, দূরে ফণিমনসার ঝাড়।

ফেরার হাওয়ায় শুনি ক্রমশ নিঃশব্দ গান
আমার এ মরুভূমি বসন্তের রাগান। (নানা কথা)
গ্রহণ লেগেছে প্রাচীন সূর্যে ;
এ করাল সংক্রান্তি নিঃসন্দেহে পার হবো,
যে মৃত্যু প্রাণ আনে তার ফিনিক্স গানে
প্রগতির সম্মিলিত বীর্যে, অক্লান্ত আত্মদানে। (বসন্ত)
মাঝে মাঝে ঝোড়ো হাওয়ায় শুনি আর এক গান।
নেহি দেঙ্গে হমরা হিন্দুস্থান। (পঞ্চম বাহিনী)
অনেক ঘাটের জল খেয়ে বুঝি
অনেক লোক যেখানে
সেখানে সত্তার নতুন সূর্য ওঠে
কালের ঘোলাটে জলে জোয়ার লাগায়
সম্ভব হয় **অনেকের** খেয়া পারাপার
গভীর জলে **একের** শবদেহ ডোবে। (নববর্ষের প্রস্তাব)

ব্যষ্টি সমষ্টির মধ্যে বিলীন হবার পথ পেয়েছে। ব্যক্তি এখানে পরিপূর্ণ সামাজিক চেতনায় ও সক্রিয় আদর্শোপলব্ধিতে সার্থক ; কবিও অবকাশ পেয়েছেন সুস্থ হবার। কাব্যের দিক থেকে সেটা খুবই সুলক্ষণ।

পূর্বের বই দুখানির মত এ বইয়েরও সমস্ত কবিতাই গদ্যরীতিতে লেখা,—বাংলাদেশে শুধু অমিয় চক্রবর্তী আর সমর সেনই নিয়মিত গদ্য-কবিতা লেখেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তনের মত গদ্যরীতির আগমনও বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা, এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের মতই এ রীতির মূল সমসাময়িক সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির গভীরে নিবদ্ধ। আপাতত সে-বিশ্লেষণ ও প্রতিপাদনের দায়িত্ব যোগ্যতর ব্যক্তির হাতে ছেড়ে দিয়ে আমি শুধু এখানে বলতে চাই, সমর সেন যদিও এ রীতির প্রথম পথ-প্রদর্শক নন—সে গৌরব আরো অনেক কিছুর মতই নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের, তথাপি এর চরমোৎকর্ষ তাঁরই হাতে। শব্দচয়নে তিনি রীতিমত রাবীন্দ্রিক, কিন্তু আঙ্গিকের অভিনবত্বপ্রসাদে স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। এঁর সবচেয়ে বড় যা গুণ তা হ'ল সংহতি। নিখুঁত ছোট গল্পের মত সুরু ও শেষ, সঙ্গে সঙ্গে নাটকীয় ঘটনাসংস্থান এবং গীতিকবিতার ব্যঞ্জনা,—এ সমস্তই এঁর কবিতাগুলিতে পাশাপাশি নয়, অঙ্গাঙ্গীভাবে এক ধারায় ব'য়ে চলে। আমি যা বলতে চাই, হয়ত কয়েকটি কবিতা নিয়ে ভাল রকম আলোচনা করতে পারলে স্পষ্ট ক'রে বোঝাতে পারতাম, কিন্তু তাতে সমালোচনা সাময়িক পত্রের গণ্ডী অতিক্রম করত।

এ বইতে শেষের কবিতা কয়টিতে পংক্তির শেষে মিলের সাক্ষাৎ মেলে। গদ্য-কবিতায় মিল দিলে অনেক অজ্ঞ পাঠক সেটাকে কবির মিলের কবিতা লেখবার অক্ষমতা ব'লে মনে করতে পারে ; কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, সমর সেন গদ্যকবিতার ধর্মকে কোথায়ও বিকৃত করেন নি, মিলের চরণে বিক্রীতও করেন নি ; মিল সেখানে অনিবার্য নয়, হয়েছে শুধু একটা অধিকন্তু আকর্ষণ।

গদ্যের স্বাভাবিক চালটা পয়ারের। তাই সমর সেনের গদ্যকবিতাও পয়ারধর্মী। কিন্তু দেখে আশ্চর্য হ'য়েছি, এক জায়গায় তিনি অক্লেশে তিন মাত্রার ছন্দকেও গদ্যের কাঠামোয় ভেঙে দাঁড় করতে পেরেছেন। বাইশ পৃষ্ঠার ওপরের দিকের কয়টা লাইন আমার বক্তব্যের উদাহরণ,—লাইন কটি ছন্দের কবিতা হ'য়ে উঠতে কেবল সামান্য ওলট-পালট ও সাজিয়ে দেবার মুখাপেক্ষী।

চিত্রে, চিত্রকল্পে, প্রতীকে কবিতাগুলি অদ্ভুতভাবে রূপায়িত হ'য়ে উঠেছে। জানি না, সমর সেন মনে মনে এ রকম কোনো অভিসন্ধি পোষণ করেন কিনা যে, ছন্দোমিলবদ্ধ কবিতা ছাড়া অন্য কিছুকে কবিতা বলতে চাও না? কিন্তু দেখ, ছন্দ (অর্থাৎ পদ্য ছন্দ) ও মিল ছাড়াও কী রকম সার্থক কবিতা লেখা যায়! কয়েকটি প্রতীক আছে, ঘুরে ঘুরে যাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। যেমন,—পাহাড় (বিরাটত্ব এবং কখনো স্থানুত্বের প্রতীক), বর্গী (দুর্ভাবনা ও দুর্বিপাকের প্রতীক), কৃষ্ণচূড়া (যৌবন ও উচ্ছলতার প্রতীক), ফণিমনসা (রুক্ষতা ও ব্যর্থতার প্রতীক), শবযাত্রা (যুগপরিবর্তন ও পুরানো যুগের মৃতদেহ বহনের প্রতীক)। আবার এমন কয়েকটি কথা আছে যা অভিভাব (association) সৃষ্টিতে অপূর্ব্ব : 'কানা গরু'—কলুর বলদ : রামপ্রসাদের গান ; 'নববী আমল'—অতীত সামন্ততান্ত্রিক যুগ ; কালীপ্রসন্নের রচনা ; তাছাড়া বৈষ্ণব কবিতা ও রবীন্দ্রনাথের নানা টুকরো লাইন তো আছেই।

মোটের ওপর 'কয়েকটি কবিতা' ও 'গ্রহণ' পেরিয়ে 'নানা কথা' বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক, এই দুই দিক থেকেই আর একটি বিশিষ্ট ধাপ। এবং বলতে আপত্তি নেই আমরা অনেকে যে আশঙ্কা করেছিলাম—সমর সেন যে-ধরনের গদ্য কবিতা লেখেন তাতে অচিরেই রীতিমত অরুচি সুরু হবে—কবি এই বই প্রকাশ ক'রে সেটাকে একেবারে অযথা প্রতিপন্ন ক'রে দিয়েছেন।

মণীন্দ্র রায়

নির্বাণ—প্রতিমা ঠাকুর। বিশ্বভারতী, এক টাকা।

'কবিতা'র গত সংখ্যায় আমরা এ-বইটির (তখন পরিমিত সংস্করণে প্রকাশিত) উল্লেখ করেছিলাম। ইতিমধ্যে 'নির্বাণ' সর্বজনের জন্য প্রকাশিত হয়েছে, তাই এ নিয়ে আরো একটু আলোচনা করা যেতে পারে।

এই ছোটো সুদৃশ্য বইটিতে রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ কবি-জীবনের শেষ বছরের ছবি এঁকেছেন। ছবিটি বর্ণবিরল কিন্তু পরিচ্ছন্ন, অল্প কয়েকটি হালকা রেখার টানে সম্পূর্ণ ও সুন্দর। বস্তুত, প্রতিমা দেবীর এই বিরলভাষণ শান্ত ভঙ্গিটিই তাঁর এই গ্রন্থকে সাহিত্যপদবাচ্য করেছে। উচ্ছ্বাস নেই, আড়ম্বর নেই, একটি স্তিমিত সংযত কমনীয়তার মৃদু আলোয় বইটি উদ্ভাসিত। এর যা ঐতিহাসিক মূল্য সে-বিষয়ে কিছু বলাই বাহুল্য—১৯৪০-এর অগস্ট মাসে কবির কালিম্পং যাত্রার কিছু পূর্ব থেকে আরম্ভ ক'রে ১৯৪১-এর কালান্তক ৭ই অগস্ট পর্যন্ত যে-ধারাবাহিক কাহিনী এখানে লিপিবদ্ধ রইলো তা ভবিষ্যতের রবীন্দ্রবেত্তাদের পক্ষে অপরিহার্য হবে—এবং শুধু এই ঐতিহাসিক তথ্যটুকু পেলেই আমরা প্রতিমা দেবীর কাছে কৃতজ্ঞ থাকতাম। কিন্তু তিনি তার বেশিও কিছু দিয়েছেন, পরিবেশন করেছেন সাহিত্যরস—সেটা আমাদের উপরি-পাওনা, এবং তারই জন্যে লেখিকাকে বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাই। এমন নির্লিপ্তভাবে, এমন সহজ মৌখিক ভঙ্গিতে, অথচ তারই সঙ্গে এমন প্রচ্ছন্ন গভীর বেদনার সঙ্গে তিনি এই মর্মান্তিক কাহিনী আমাদের শুনিয়েছেন যা পেশাদার লেখকের ঈর্ষা উৎপাদন করে, এবং পাঠকের মনঃসংযোগ মুহূর্তে'ই কেড়ে নেয়। মনে হয় এই সহজ ভঙ্গিটি শুধু মেয়েদের পক্ষেই সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি চিঠি বইখানাকে আরো মূল্যবান করেছে। তার মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য জর্মনি থেকে লেখা ১৯৩০ সনের একটি চিঠি—সেটি আসলে 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'বাসা' কবিতাটির প্রথম লিখন। আর-একটি চিঠি আছে, যার পত্র-সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে স্থান—সেটি রবীন্দ্রনাথের কন্যা মীরা দেবীর লেখা। এই হ'লো সত্যিকার চিঠি, ঠিক মুখের কথার মতো জীবন্ত ও চিত্ররূপময়। রবীন্দ্রনাথ যেদিন 'উদীচী'তে তাঁর নতুন লেখা 'ল্যাবরেটরি' গল্প প'ড়ে শুনিয়েছিলেন তার এই বর্ণনা রবীন্দ্র-ইতিবৃত্তের একটি ছোটো কোণ দখল ক'রে থাকবে এ-কথা নিঃসংশয়ে বলতে পারি:

'......বাবা এমন ইরিটেটেড মেজাজে ছিলেন, পড়া শেষ না-হওয়া পর্যন্ত যে-কটি আমরা উপস্থিত ছিলুম গল্প পড়ার সময় ভয়ে সব জুজু হয়ে বসে, কারোর মুখে হাসি নেই বা কথা নেই। উপরে গিয়ে চারিদিক তাকিয়ে মনে হোলো যেন আসামীরা কোর্টে হাজিরা দিতে এসেছে, এখন মনে করতে হাসি পাচ্ছে।'

তারপর আছে শ্রোতাদের মুখের বর্ণনা—

'সেদিকে তাকিয়ে মনে হোতে পারত যে, বিচারক বোধ হয় কারোর প্রাণদণ্ডের রায় পড়ে শোনাচ্ছেন, তাই শ্রোতাদের মুখে এই বেদনা-সূচক ভাব।'

খুঁত ধরাই সমালোচকের পেশা, তাই উল্লেখ করতে হচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথের শেষ চিঠির অনুলিপিতে ও মুদ্রণে একটি ভুল র'য়ে গেছে। 'শুনেছি, বড়োর আক্রমণ তেমন দুঃসহ নয়। এইসব ছোটো-ছোটোর উপদ্রব যেমন—' এখানে স্পষ্টই ভুল জায়গায় দাঁড়ি পড়েছে, রবীন্দ্রনাথ যা বলতে চেয়েছিলেন তা নিশ্চয়ই এই—'শুনেছি, বড়োর আক্রমণ তেমন দুঃসহ নয়, এইসব ছোটো-ছোটোর উপদ্রব যেমন।' ভুলটি ছোটো হ'লেও তুচ্ছ নয়, চোখের পক্ষেও পীড়াদায়ক।

আশা করি প্রতিমা দেবী রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আরো লিখবেন; তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতাই তাঁর উপাদান এবং সে-সব অভিজ্ঞতায় তিনি তাঁর স্বদেশবাসীকেও অংশীদার করুন এই আমাদের দাবি।

২২শে জুন, বিষ্ণু দে। ফ্যাশিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী-সঙ্ঘ কর্তৃক প্রকাশিত। চার আনা।

বিষ্ণুবাবুর কবিতার আমি দিন-দিনই বেশি ভক্ত হ'য়ে পড়ছি, কারণ তাঁর কবিতা দিন-দিনই ভালো হচ্ছে। আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে তিনি সর্বদাই সক্রিয় ও প্রগতিশীল—**সাহিত্যিক** অর্থে প্রগতিশীল। রাজনৈতিক প্রগতির হাওয়াও তাঁর গায়ে লেগেছে, এবং তারই ফলে তাঁর কবিতায় সম্প্রতি একটি নতুন সুর লেগেছে, নতুন ঐশ্বর্যের আভাস এসেছে। বিষ্ণুবাবুর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিলো তাঁর দুর্বোধ্যতা, পাঠকের কাছে অত্যন্ত বেশি পাণ্ডিত্যের প্রত্যাশা। মোটের উপর কবির পক্ষে এটা দুর্বলতাই। কিন্তু আরো কিছুদিন গেলে হয়তো দেখা যাবে যে সেটা বিষ্ণুবাবুর ক্রমবিকাশের একটা স্তর মাত্র, সে-স্তর তিনি যে প্রায় পার হয়ে এসেছেন তার প্রমাণ '২২শে জুন'। রাজনৈতিক উৎসাহ তাঁর কাব্যে সরলতা এনেছে, বিদ্বান বন্ধুদের অতিক্রম ক'রে তিনি আজ সাধারণ পাঠকের শ্রুতিগম্য হ'তে ইচ্ছুক, এমনকি গণ-কবি হ'তে উচ্চাভিলাষী।

যাঁরা সব তারিখ মনে রাখেন না (বোধ হয় এমন লোকই বেশি) তাঁদের জানানো দরকার যে গত বছর ২২শে জুন নাৎসি জর্মানি সোভিয়েট

ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই পুস্তিকার কবিতাগুলির বিষয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক এবং—বলতে আনন্দ হচ্ছে—বেশির ভাগই সত্যিকার ভালো কবিতা। প্রথম কবিতাটি, '২২শে জুন, ১৯৪১' 'মহিমা' নামে 'কবিতা'য় প্রকাশিত হয়েছিলো—

> জনগণমনে অধিনায়কের শূন্য স্থান, পূর্ণ করো বীর !
> শেয়ানে শেয়ানে হোক কোলাকুলি সঙ্গোপনে ; তবু চীন, রুশ—
> দেশে দেশে কৃষাণ মজুর যতো ঢেলে দেয় তাদের পৌরুষ
> স্বার্থের বর্ধিষ্ণু ছিদ্রে, বনেদীর বনিয়াদে, মুমূর্ষু অস্থির
> জলে স্থলে যুদ্ধ চলে, ভারতেরও ভিৎ টলে, প্রাণের দুর্দিনে
> কলকাতার পূর্ণিমাও জটায়ুর পাখা নাড়ে দূর রুশে, চীনে।

কোনো সনেটের এ-রকম নিখুঁত ষট্‌পদী বাংলা ভাষায় খুব বেশি পাওয়া যাবে না। ভারতীয় বিমানবাহিনীর উদ্দেশে লেখা কবিতাটিও (এটিও 'কবিতা'য় প্রথম বেরোয়) আবেগগম্ভীর ও ধ্বনিঝংকৃত।

> মৃত্যু আজ আত্মঘাতী মৃত্তিকা-বিলাসে,
> প্রাণ তার স্বতই উদ্ভাসে,
> মেঘ হতে মেঘান্তরে উন্মুখর যাত্রা তার
> সূর্য জানে মাত্রা তার, সূর্য হানে গায়ে তার
> উল্লসিত লাবণ্যের ভয়শূন্য সোনা।

যে-'উন্নাসিক উপত্যকায়' বিষ্ণুবাবুর সাহিত্যজীবনের আরম্ভ তার অধিবাসীদের বিদ্রূপ ক'রে তিনি আজ বলছেন :

> মরীয়ার তুচ্ছ আশা জানো ইচ্ছাময়ীর ছলনা,
> আশ্বাস বিশ্বাস মাত্র, রূপান্তর মুক্তির অভাব।
> অলস সৌজন্যে কিন্তু সে কথাও সরবে বলো না।
> উপত্যকা যাদুঘর, অঙ্গারিত অশ্বত্থ-স্বভাব।

আশ্চর্য এই যে এ-ক'টি পংক্তি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের লেখা ব'লে মনে হয়।

বিষ্ণুবাবু উন্নাসিক উপত্যকা ছেড়ে জনগণের মিছিল থেকে প্রেরণা পাচ্ছেন সেটা খুব আনন্দের কথা, কারণ এটা তাঁর কবিপ্রকৃতির পক্ষে একটি বৃহৎ মুক্তি। এই নবলব্ধ মুক্তির উৎসাহে তিনি আজ 'বুড়ো-ভোলানো ছড়া' লিখছেন—

> সুন্দরবনে ভীষণ বাঘ
> তাদের চোখে দেশের রাগ;
> নখে তাদের বেজায় ধার,
> খাঁড়ার মতোই দাঁতের সার—

তাঁর এই রূপান্তরে আমি অন্তত তাঁকে অভিনন্দনই জানাবো, কিন্তু কোন উৎসাহের নেশায় তিনি এই লাইনগুলি লিখেছিলেন ?—

> ফ্যাশিস্ট বর্বর
> অতিষ্ঠ জর্জর
> আপন মরণ-বাণে হয়ে যায় খান খান

কিংবা

> জানে না অমর প্রাণের হাওয়ায় কী মৌশুম
> অন্ধ নাৎসি গুণ্ডা, অন্ধ জাপানী চোর ॥

রাজনৈতিক প্রচারকার্য যে-কোনো লোককে দিয়েই হ'তে পারে, কিন্তু ভালো কবিতা খুব অল্প লোকই লিখতে পারেন, আর বিষ্ণুবাবু তাঁদেরই একজন, বাহুল্য হ'লেও এ-কথা তাঁকে মনে করিয়ে দিতে চাই।

'তোমাদের সনেট'-এ একটি লাইন আছে—

> প্রতীক্ষাউষর দেখি প্রত্যাশা-নিঃস্পন্দ বৃক্ষের

এখানে ছন্দটা কি একটু কাটেনি—'প্রত্যাশায় নিঃস্পন্দ' হ'লেই যেন ঠিক হয়।

বুদ্ধদেব বসু

চারণ : সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত।

ঐতিহ্যপরায়ণতাই সৎসাহিত্যের একমাত্র আদর্শ, ব্যাক্তিত্বের চরম বিসর্জ্জনেই শিল্পের সার্থকতা—এমন সব কথায় তর্কের অবসর আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু সাহিত্য যে ঐতিহ্যকে সরাসরি বাদ দিতে পারে না এ কথার প্রতিপক্ষ খুঁজে পাওয়া কঠিন। তাই, সাহিত্যের ইতিহাস তৈলধারার মত অবিচ্ছিন্ন না হতে পারে, তবু ধারাবাহিকতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারে না। বিশুদ্ধ সাহিত্যে বিশ্বাসীরাও এ কথা মানবেন ; আর যাঁরা সাহিত্যে সমাজের প্রতিচ্ছবি খোঁজেন তাঁদের কাছে ত এ কথা স্পষ্টই, কারণ সামাজিক পরিবর্ত্তন এলোমেলো আর খাপছাড়া নয়, তার পেছনে আছে নিয়মের নিয়ন্ত্রণ। আলোচ্য গ্রন্থ পড়তে বসে প্রথমেই এই সব নানান কথা মনে ওঠে, কারণ এর যেটা সবচেয়ে স্পষ্ট আর উজ্জ্বল দিক সেটা হচ্ছে ঐতিহ্যের অনুপ্রেরণা।

"চারণে"র আঙ্গিক সম্বন্ধে যা সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে ভাষা ও ছন্দের সচ্ছলতা। তবু কোথাও এতটুকু সংশয় জাগে না ছন্দ সম্বন্ধে। তাই মনে হয় বন্যার মত অনর্গল, তবু বন্যার মত উচ্ছৃঙ্খল নয়। আর সংস্কৃত

শব্দের যে অকৃপণ ও সহজ ব্যাবহার সমস্ত গ্রন্থে ছড়ান তাও শ্রীযুক্ত দাসগুপ্তের অসামান্য পাণ্ডিত্যেরই ফল।

প্রসঙ্গের দিক থেকে আলোচ্য গ্রন্থের একটা বিশেষ মূল্য আছে, সমসাময়িক রাজনৈতিক পটভূমিতে সেটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবিতাগুলি সমস্তই ভারতের অতীত ইতিহাস সংক্রান্ত, মোটামুটি "কথা ও কাহিনী" ধরনের; সেদিক থেকে "চারণ" নাম সার্থক সন্দেহ নেই। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমাদের দেশ বর্ব্বর অত্যাচারের লীলাভূমি—তার উপর আজ দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে আর এক বিভীষিকা। এ সময়ে দেশের যেটুকু সুন্দর ও সুস্থ দিক রয়েছে তাকেই আঁকড়ে ধরতে মন অস্থির হয়। তাই বেতারে পুরোনো স্বদেশী গান শুনে কেমন যেন নতুন করে ভাল লাগে, দেয়ালে পল্লিপ্রকৃতির সাধারণ ছবিটার প্রতিও মমতায় বুক ভরে ওঠে। আমাদের এই দেশ, তার আলোছায়া, তার জল, তার আকাশ—একে বাঁচাতে হবে সব রকম বর্ব্বর শোষণ থেকে, রুখতে হবে যে বীভৎস শোষকের দল দোর গোড়ায় বসে নখে ধার দিচ্ছে তাদের। এমন সময় দেশের অতীত ইতিহাসের কয়েকটা খণ্ড কাহিনীর দিকে ফিরে চেয়ে সাহসে মন ভরে ওঠে। শতাব্দীর পর শতাব্দী শোষকের দল এসেছে অন্ধকারের বন্যা নিয়ে, তবুও তার মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে কয়েকটি আশার কেন্দ্র, যেখানে ত্যাগ অপরিসীম, বীর্য্য বিপুল, আর মহত্ত্ব অসীম। আশায় আর আনন্দে বুক ভরে ওঠে—এ জাতকে কায়েমী শৃঙ্খল পরিয়ে রাখা যাবে না, এ জাত শুধু দাসত্বের অধিকার নিয়ে টিঁকে নেই। "চারণে"র কবিও অতীতের দিকে ফিরে চেয়েছেন, খুঁজে নিয়েছেন কয়েকটি চরিত্র যেখানে মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ। সেখানে আশার বাণী। নাম-কবিতায় লেখকও এই কথাই বলছেন—

"ভয়ের মাঝারে দিতেছ ভয়ের ত্রাণ ;
হে চারণ তুমি কি বা গেয়ে যাও গান।"

আর এদিক থেকে শ্রীযুক্ত দাসগুপ্তের যেটা সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তা হচ্ছে এই যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের অতীত ইতিহাসের যে উজ্জ্বল দিকগুলির সাহিত্যিক মূল্য আছে তা প্রায় সমস্তই নিঃশেষে ব্যবহার করে গেছেন। তাঁর পর, ঠিক একই পথে বিষয় নির্ব্বাচনে অসামান্য পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন। এবং শ্রীযুক্ত দাসগুপ্ত ছাড়া আর কারুর পক্ষেই এ কাজ বোধহয় সম্ভব হত না। কাব্য সমালোচনায় যদিও কবির পাণ্ডিত্যের কথা তোলা অনেক সময়েই অপ্রাসঙ্গিক, তবু আলোচ্য গ্রন্থে তার উল্লেখ না করলে অসম্পূর্ণতা থেকে যেতে বাধ্য। তবে তাঁর পাণ্ডিত্যের ইঙ্গিতমাত্র করলুম—এর প্রকৃত পরিচয় দিতে হলে স্বতন্ত্র গ্রন্থের প্রয়োজন।

২২শে শ্রাবণ : বুদ্ধদেব বসু।
ভানুমতীর মাঠ : অশোকবিজয় রাহা। } "এক পয়সায় একটি" গ্রন্থমালা

কবিতা ভবন। প্রতি গ্রন্থ চার আনা।

একটা বছর যেন বড্ড তাড়াতাড়ি কেটে গেল। পিছনে চেয়ে মনে হল এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা আর বুঝি ঘটে নি'; কিম্বা, এত বেশী ঘটনার হুড়োহুড়ি যে তাদের আর উল্লেখযোগ্য বলে মনেই হয় না। মন বোধহয় বিশ্রাম পায় নি এক মুহূর্তেরও, তাই সময় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। মনে হল, এইত সেদিন: বিমূঢ় জনতার ক্ষিপ্রগতিতে নিজেকে খুঁজে পাওয়াই কঠিন; পাশের পঞ্জাবি ভদ্রলোক বল্‌ছেন 'সৌভাগ্যই বল্‌ব একদিক থেকে, আজই লাহোর থেকে এসে পৌঁছেছি, নইলে চোখের দেখাও একবার হত না'; চীনে ছেলেদের দল মাথা নিচু করে সাদা ফুলের তোড়া নিয়ে চলেছে; ঝম্‌ঝমে বৃষ্টিতে বার কয়েক স্নান হয়ে গেল;—এমনি এক টুকরো ছবি "২২শে শ্রাবণ" হাতে পেয়ে চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এত স্পষ্ট যে মনে হয় বছরটা কাটল বড্ড তাড়াতাড়ি। আর এই সব স্মৃতিকে বাদ দিয়ে বইটি নিরপেক্ষ-ভাবে পড়াই সম্ভব নয়, কাব্য হিসেবে এর স্বতন্ত্র মর্যাদা অক্ষুণ্ণ যদি না থাকে তার জন্যে কুণ্ঠা বোধ করছি।

প্রথম চারটি কবিতা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে, নিছক কবি-বন্দনা নয় কিন্তু। একটা জিনিষ লক্ষ্য করবার আছে, আধুনিক জীবনের নির্মমতায় লেখকের মন বিষণ্ণ ও পীড়িত—মুক্তির জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা করছেন, এবং রবীন্দ্রনাথ মুক্তি ও শান্তির প্রতীক, তাঁর মূর্তিই লেখককে প্রেরণা দিচ্ছে। তাই নেহাতই কবি-বন্দনা নয়। দু' একটা উদাহরণ দিচ্ছি, যদিও প্রথম কটি কবিতার সর্বত্রই এসব কথা ছড়ানো রয়েছে—

আজ এই অন্ধকারে
চেয়ে দেখি বারে-বারে
তোমার বাণীর পুঞ্জে অনির্ব্বাণ অম্লান আলোক

কিম্বা,

তোমারে স্মরণ করি আজ এই দারুণ দুর্দিনে
হে বন্ধু, হে প্রিয়তম। সভ্যতার শ্মশান-শয্যায়
সংক্রামিত মহামারী মানুষের মর্মে ও মজ্জায়,
প্রাণলক্ষ্মী নির্বাসিতা। রক্তপায়ী উদ্ধত সঙ্গিনে
সুন্দরেরে বিদ্ধ ক'রে, মৃত্যুবহ পুষ্পকে উড্ডীন
বর্বর রাক্ষস হাঁকে, 'আমি শ্রেষ্ঠ সবচেয়ে বড়ো।'

দেশে দেশে সমুদ্রের তীরে-তীরে কাঁপে থরোথরো
উন্মত্ত জন্তুর মুখে জীবনের সোনার হরিণ।

এর পরের তুটি কবিতাই শান্তিনিকেতনের স্মৃতিতে লেখা। কিন্তু অন্তরায় সেই এক সুরই ঘুরে ঘুরে আসছে, এই ক্লিন্ন জীবন থেকে মুক্তির বাসনা।

এর পরের কবিতা "প্রতিবাদ"-এ লেখক মনকে দৃঢ় করেছেন, তীব্র ও তীক্ষ্ণ কণ্ঠে অভিসম্পাত দিচ্ছেন যা-কিছু ঘৃণ্য ও বর্বর তাঁর চোখে পড়েছে—বাংলা দেশের সাহিত্য সমালোচনা থেকে সুরু করে আন্তর্জাতিক ফ্যাশিজম্ পর্যন্ত। এ কবিতাটি সমতল নয়, ঘৃণার পাত্র নির্বাচনেও লেখক কিছুটা খামখেয়ালি—এ সমস্তই হল আবেগের লক্ষণ, এবং আবেগ যে এখানে আন্তরিক তা অনুভব করতে দ্বিতীয়বার পড়বার দরকার হয় না। আমার এ কবিতাটিই সবচেয়ে ভাল লাগল, এবং শেষ পংক্তি ক'টি উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারলুম না—

উদ্দীপ্ত তরুণ প্রাণে
ঘাতকের অস্ত্র যারা হানে,
মানুষের যে মূল্য পরম
তারে পদাঘাত করে যাদের বিক্রম,
তাদের তুঃসহ পাপে
তীব্র অভিশাপে
যদি না দহিতে পারি আগ্নেয় ঘৃণায়,
যদি না ঝঙ্কারি' ওঠে ধিক ধিক আমায় বীণায়,
তবে ব্যর্থ কবিজন্ম—মনুষ্যত্ব, তাও তবে বৃথা।
পশুত্বের প্রতিবাদে নিখাদে রেখাবে আজ হোক উদ্দীপিতা
আমার কবিতা

এই কবিতার সুর সমস্ত বইটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীত বটেই, এমন কি একে রবীন্দ্র-স্মৃতির মধ্যেও অবান্তর বলা চলে না, কারণ এর মূল অনুপ্রেরণা রবীন্দ্রনাথেই—আমার ত' এটি পড়তে পড়তে বার বার "প্রশ্ন" কবিতাটির কথা মনে পড়েছে।

শ্রীযুক্ত অশোকবিজয় রাহার বই একেবারে অন্য জাতের। নাগরিক জীবনের স্পর্শ মাত্র নেই। সহরের নানান তুর্যোগের মধ্যে বইটি পড়তে বসলে মনে হয় যেন হঠাৎ খোলা মাঠের মধ্যে এসে পড়েছি, বুক ভরে নিঃশ্বাস নেওয়া যায়। সেদিক থেকে তাঁর বই মস্ত বড় নিষ্কৃতি। সামান্য ষোল পৃষ্ঠাতেই এত প্রাচুর্য, এত বিচিত্র ছবি! তা ছাড়া তাঁর দৃষ্টিকোণটাও ভারি মজার—খানিকটা অবাস্তব ত বটেই, এমন কি অসম্ভবও। তবে আশ্চর্য এই

যে অসঙ্গতি কোথাও নেই। সব মিলে একটা মজার রাজত্ব, আর এত সহজ ভাবে সেটা এসেছে যে একটুও দ্বিধা জাগায় না। তাই অবাস্তব লাগলেও খটকা লাগে না; বস্তুত অবাস্তব লাগে বইটি বন্ধ করবার পর যখন ভেবে দেখি তখন। আমাদের শহুরে স্নায়ুকেও অতি অনায়াসে শ্রীযুক্ত রাহা বশ করতে পারেন, এবং যে হাল্‌কা আমোদ লাগে স্থায়ী না হলেও তার মূল্য কম নয়। আমার প্রায় সবগুলো কবিতাই চমৎকার লাগল, তাই কোনো বিশেষ কবিতা উদ্ধৃত করা কঠিন।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদকীয়

রবীন্দ্র-রচনাবলী

'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র দশম ও একাদশ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। দশম খণ্ডে আছে: কবিতা ও গান—উৎসর্গ, খেয়া; নাটক ও প্রহসন—রাজা; উপন্যাস ও গল্প—শেষের কবিতা; প্রবন্ধ—রাজা ও প্রজা, সমূহ। একাদশ খণ্ডে আছে: কবিতা ও গান—গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি; নাটক ও প্রহসন—অচলায়তন, ডাকঘর; উপন্যাস ও গল্প—তুই বোন; প্রবন্ধ—স্বদেশ। উভয় খণ্ডেই নূতন চিত্র, পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি এবং যথারীতি গ্রন্থ-পরিচয় সংযোজিত।

আশ্বিন, ১৩৪৯

'রচনাবলী'র প্রতি খণ্ড চার অংশে ভাগ করার ফলে কিছু অসংগতি ক্রমেই বেশি স্পষ্ট হ'য়ে ফুটেছে। 'খেয়া'র পাশে 'শেষের কবিতা', 'গীতাঞ্জলি'র পাশে 'দুই বোন' পড়তে বেশ একটু অদ্ভুতই লাগবে—এদের মধ্যে এক যুগের ব্যবধান অথচ এখানে এদের পাশাপাশি বাসা। সাহিত্যের ছাত্র তারিখ মেলাবেন, কিন্তু সাধারণ পাঠকের দিকভ্রান্ত হবার আশঙ্কা। এদিকে এগারো খণ্ডেও 'গল্পগুচ্ছে'র দেখা পাওয়া গেলো না, মনে হয় 'মালঞ্চ' 'চার অধ্যায়ে'র পরে বিশ্বভারতী 'গল্পগুচ্ছে' হাত দেবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের পরিমাণ গল্প-উপন্যাসের তুলনায় এতই বেশি যে 'রচনাবলী'র শেষ খণ্ড পর্যন্ত কিছু গল্প-উপন্যাস প্রকাশ করা সম্ভব হবে কি ?

বিশ্বভারতী পত্রিকা

বিশ্বভারতীর কর্মসূচী দীর্ঘ ও বিচিত্র, কিন্তু তার মধ্যে একটি অভাব আমাদের সকলেরই চোখে ঠেকতো। বিশ্বভারতী ইংরেজি কোয়ার্টার্লি বের করেন, সম্প্রতি একটি হিন্দি পত্রিকাও প্রকাশ করেছেন, কিন্তু বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির রাজধানী শান্তিনিকেতন থেকে কোনো বাংলা পত্রিকাই বেরোয় না, এ-কথা ভেবে আমরা বিস্মিত হয়েছি এবং মনে-মনে আক্ষেপ বোধ করেছি। এ-অভাব এতদিনে দূর হ'লো ; শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' রবীন্দ্রনাথের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীর দিনে যাত্রারম্ভ করেছে।

১৯৪২ সনের অগস্ট মাসে আমরা মর্ত্যবাসীরা যে রকম অবস্থায় দিন কাটাচ্ছি, তা গ্রহান্তরে অন্য-কোনো বুদ্ধিমান জীব যদি লক্ষ্য করে তাহ'লে তার ঈর্ষাভাজন আমরা নিশ্চয়ই হ'বো না। কায়িক সুখ ও মানসিক শান্তি দুয়েরই স্বাদ আমরা প্রায় ভুলেছি। বাংলাদেশে সমস্ত জিনিসের অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধি, স্বদেশি দুর্যোগের অশান্তি ও বিদেশি আক্রমণের আতঙ্ক—সব মিলিয়ে এমন একটি অবস্থা করেছে যাতে অধিকাংশ লোকই হতাশায় আচ্ছন্ন এবং অন্নবস্ত্রের দুশ্চিন্তায় মুহ্যমান। ঠিক এই সময়ে নতুন একটি সাহিত্য-পত্রিকার আবির্ভাবের মতো চিত্তপ্রফুল্লকারী আর কিছু হ'তে পারতো না। অনেকে হয়তো বলবেন—এটা কি সাহিত্যচর্চার সময়! আমরা বলবো—এটাই তো সাহিত্যচর্চার সময়। কারণ যে-কোনো অবস্থায় মনের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখাটাই জীবনসাধনা, এবং সে-সাধনায় সাহিত্য আমাদের যত বড়ো সহায় তেমন আর-কিছু নয়। 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' হাতে পেয়ে, তাই, এই দুঃসময়ে জীবনের সঙ্গে আর-একটি গ্রন্থি যোজনা করতে পারলাম। এই পত্রিকা দীর্ঘজীবী হোক এই কামনা করি।

পত্রগুচ্ছ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত]

বিদেশে পথিকবৃত্তির কালে যে-সব চিঠি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পেয়েছি তার একটি খণ্ডমালা এইখানে উপস্থিত করি। চিঠিগুলি নানান্ ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ, ঘটনা এবং রাষ্ট্রিক উল্লেখে জড়িত, অর্থাৎ যথার্থই চিঠি, ছাপানোর জন্যে লেখা নয়। কিছু অংশ এখন বাদ দিতে হল, কিন্তু উপভোগের বাধা হবে না। ভারতবর্ষের বিচিত্র বেদনা এই পত্রগুলিতে প্রকাশিত; তারি সঙ্গে মিলেচে যুগ সঙ্কটের মূর্ত্তি, পশ্চিমী আসন্নতায় ভরা। য়ুরোপের সুন্দর স্মৃতি-ছবিও আছে। বাংলাদেশের আত্মীয়কথা কোন্ সময়ে আন্তর্জাতিক আকাশে উত্তীর্ণ হয়েচে। বারান্তরে আরো কিছু পত্রাংশ ছাপাবার ইচ্ছা রইল।

শেষ পত্রখণ্ড আমাকে লেখা নয়।

অমিয় চক্রবর্তী

১

শান্তিনিকেতন

য়ুরোপে মানবমনের সংঘাতে মনের নিগূঢ় শক্তি চরম পূর্ণতায় উদ্বোধিত হয় * * *আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই জানি। তবু অনেকখানি বাকি থাকে, সেটা হচ্চে অন্তরতম সম্বন্ধ, তাকে বিশ্লেষণ করে জানাতে পারিনে। অসংখ্য সূক্ষ্ম স্নায়ুর সমাবেশে তার বহুধা বেদনা আমার সমস্ত মনকে জড়িয়ে রেখেছে—জন্মপূর্ব্বের স্মৃতি আছে তার মধ্যে, আমার দৃষ্টিতে আমার শ্রুতিতে, আমার চিন্তায় আমার আকাঙ্ক্ষায় জীবনের বহুতন্ত্রবিশিষ্ট বীণায় সে আপন সুর বেঁধে দিয়েছে। তার স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হলে আমার ভোজে খাদ্য থাকে, এমন কি খাদ্য বেশিও থাকে কিন্তু তার স্বাদ থাকে না। এই কারণে যতবার আমি দেশের বাইরে গেছি এখানকার রূপে রসে ভরা আকাশ আমাকে ডাক দিয়ে পাঠায়। তা ছাড়া ছেলেবেলা থেকে সমস্ত মন দিয়ে আমি ভালোবেসেছি বাঙালীর মেয়েকে, তার সকরুণ মাধুর্য্যে আমার মন অভিষিক্ত হয়েছে। যখন দূরে যাই এখানকার শ্যামশ্রীর স্মৃতিপটে তারি ছবিটি ফুটে ওঠে আমার

মনে, মেঠো মূলতানের সুরে দূর থেকে বাজতে থাকে তারি কণ্ঠের গান বাংলার ভাষায়—

মনে রইল সই মনের বেদনা,
প্রবাসে যখন যায়গো সে
তারে বলি বলি আর বলা হোলো না।

তখন কেবলি মনে পড়তে থাকে তমালতালীবনরাজিনীলা তটভূমি, সমুদ্রের পূর্ব্বপারে। আর মনে পড়ে মেঘচ্ছায়াঘন বর্ষার দিন আর ধারামুখরিত বর্ষার রাত্রি; বুকের মধ্যে বাজতে থাকে, মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্বনভুবঃ শ্যামস্তমাল-দ্রুমৈঃ। অন্য কোন্ দেশে পাব মাঘের শেষে আমের বোলের গন্ধে মেশানো ক্লান্ত কোকিলের করুণ ডাক। আরো কত বলব কত সূক্ষ্ম, কত বিরাট, কত গভীর, দেশেকালে সুদূর প্রসারিত তার কত প্রতিবেদন, যার ভাষা নেই, যার ইঙ্গিত যূথীমালতীর সৌরভের মতো আর্দ্রবাতাসে সর্ব্বব্যাপী। অথচ এদেশের মানুষ পদে পদে আমাকে কঠিন আঘাতে জর্জ্জর করেছে, নির্ম্মমভাবে আমাকে অবমানিত করেছে, অসহ্য হয়েছে কতবার, নিঃশব্দে আমি তা সহ্য করে এসেছি, তবুও আজ পর্য্যন্ত বল্‌তে পারলুম না তোমাদের আমি চাইনে। আমি অত্যন্ত বেশি বাঁধা পড়ে গেছি, দুঃসহ দুঃখেও আমার নিষ্কৃতি নেই। অথচ এও জানি সমাজের বাইরে পারিবারিক দ্বীপের নিঃসঙ্গতার মধ্যে আমার জন্ম—দেশের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিলুম, সেই বিচ্ছেদের সমুদ্র পেরিয়ে দেশের শস্য ক্ষেত থেকে আমি ফসল আনতে পারিনি, নিজের খাদ্য আমার নিজেকে একলা জন্মাতে হয়েছে, তার জাত আলাদা। দেশকে আমি যতই ভালোবাসিনে কেন, অনিবার্য্য কারণে আমার মন তবু আপনাতে আপনি স্বতন্ত্র। সেইজন্যে এখানকার বাজারে সাহিত্যযাচনাদার প্রবীণ মুরুব্বি যখন আমার লেখার শ্রেণীনির্ণয় করতে বসে আমার অনেক সময়ে হাসি পায়। আমি যে জন্মব্রাত্য, শিশুকাল থেকেই আমি শ্রেণীভ্রষ্ট, এমনকি ব্রাহ্মসমাজও আমাকে খুঁটিতে বাঁধতে পারেনি। এই জন্যেই দেশের

লোকের কাছ থেকে আমি প্রশংসা পেয়েছি প্রীতি পাইনি। কিন্তু বাঁধনের সর্ত্তে প্রীতি যদি না পেয়ে থাকি তবে তা নিয়ে খেদ করব না।

ইতি ২৫ এপ্রিল ১৯৩৪

২

Adyar
মাদ্রাজ

* * *

এত রকম লেখাও লিখ্‌তে হয়েছে। আজকাল একেবারে অরুচি ধরেছে লেখায়। মনটা এখন স্বভাবত ছোটে ছবির দিকে। লেখায় খাটাতে হয় কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে; কর্ত্তব্য ফাঁকি দেওয়ার দিকেই মনের স্বাভাবিক ঝোঁক। জীবন আরম্ভ করেছিলুম লীলা দিয়ে—পড়া এড়িয়ে লিখেছি কবিতা। মধ্য বয়সে সেই অকর্ম্মণ্যতা খুব কষে পূরণ করেছি লিখে লিখে। সে সব লেখা বোঝাটানা লেখনীর লেখা। তখন সেটাতে প্রবৃত্তি ছিল। নানা ভাবনা ভাবতুম আর লিখ্‌তুম—গদ্য ভাষায় নানা চাল উদ্ভাবন করতে ভালোই লাগত—তখন বাংলা গদ্য ভাষার গতিতে কলাবৈচিত্র্য যথেষ্ট ছিল না। তার চাল দুরস্ত করবার কর্ত্তব্য শেষ করেছি। তার আড়ষ্ট ভাব গেছে, সে নানাদিকে নানা ভঙ্গীতে হাত পা খেলাতে পারে। তাই এখন আমার কলাচর্চ্চার সখটা ছুটেছে ছবির দিকে। এর মাঝখানে কর্ত্তব্যের গদি থেকে বক্তৃতার ফরমাস এলে ধৈর্য্য থাকে না। অথচ উপায় নেই। * * *

* * *এখন সব সাজ ফেলে দিয়ে চিত্রকূটের শিখরে চড়ে নির্জ্জন বাসের জন্যে মন উৎসুক।

তুমি তো পাড়ি দিলে সমুদ্রপারের দিকে—মনটা পিছনের টান এড়াতে পারছিল না—কেননা তখনো ওপারের ভোজে পাত পড়ে নি, দুদিকেই তখন ফাঁকা। আমি নিশ্চয় জানি সেখানে পৌছলেই মানুষের আহ্বান আসবে, সাড়া দেবে তোমার মন। * * *

২৩ অক্টোবর ১৯৩৪

৩

* * *

* * *নিজের ভাগ্য নানা ভুলচুক নানা দুঃখ কষ্ট বিপ্লবের মধ্য দিয়েই নিজে নিয়ন্ত্রিত করবার শিক্ষা আমাদের পাওয়া চাই। —সেই শিক্ষার আরম্ভপথ আমার অতি ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারেই আমি নিয়েছিলুম। য়ুরোপের মতো আমাদের জনসমূহ নাগরিক নয়,—চিরদিনই চীনের মতোই ভারতবর্ষ পল্লীপ্রধান। * * *আমাদের সেই ঘনিষ্ঠ পল্লীজীবনের গ্রন্থি কেটে দিয়েছে। তাই আমাদের মৃত্যু আরম্ভ হয়েছে ঐ নীচের দিক দিয়ে। সেখানে কী অভাব কী দুঃখ কী শোচনীয় নিঃসহায়তা, ব'লে শেষ করা যায় না। এইখানেই পুনর্ব্বার প্রাণসঞ্চার করবার সামান্য আয়োজন করেছি * * * দেশকে কোন দিক থেকে রক্ষা করতে হবে আমার তরফ থেকে এ প্রশ্নের উত্তর আমার এই গ্রামের কাজে। * * *মহাত্মাজি * * *এই কাজে পা বাড়িয়েছেন। তিনি মহাকায় মানুষ, তাঁর পদক্ষেপ খুব সুদীর্ঘ। * * *এই কথা মনে রেখো পাবনা কন্‌ফারেন্স্ থেকে আমি বরাবর এই নীতিই প্রচার করে এসেচি। আর, শিক্ষাসংস্কার এবং পল্লীসঞ্জীবনই আমার জীবনের প্রধান কাজ। এর সংকল্পের মূল্য আছে, ফলের কথা আজ কে বিচার করবে। * * *

ইতি ১৫ নবেম্বর ১৯৩৪

৪

শান্তিনিকেতন

* * *আমাদের এখানে শীতের আবির্ভাব পরিপূর্ণ হয়ে উঠেচে। তোমাদের ওখানকার কুহেলিকাবৃত মেঘাচ্ছন্ন বৃষ্টিসিক্ত শীতের কথা কল্পনা করলে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। প্রকৃতির স্পর্শ থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র করে রাখবার জন্যে সর্ব্বদাই তোমরা আচ্ছাদন বহন করে বেড়াচ্চ। সেই নিত্য বন্ধনদশার ভয়ে ওদেশে বাস করতে ইচ্ছে করে না। এখানে, বিশেষত, শান্তিনিকেতনে শীতকালটা অত্যন্ত রমণীয়—রৌদ্রের মধ্যে কী বিস্তীর্ণ প্রসন্নতা! পাতাঝরানো গাছ অতি অল্পই আছে। দুঃশাসন শীত

বনলক্ষ্মীর বস্ত্রহরণে কৃতকার্য্য হতে পারেনি। শিউলি ফুলের দিন ফুরিয়েছে, কাঁটা নাগেশ্বর ফুলের গন্ধে বাতাস মদবিহ্বল, আর আমাদের হিমঝুরি ফুলের উচ্চচূড় বীথিকা তার পাতার স্তবকে স্তবকে ঘন দোদুল্যমান ফুলের রূপোলি কারুকার্য্যে নিবিড় বিচিত্রিত। হিমঝুরি নামটা আমারি দেওয়া —ওর চলিত নাম জানি নে।

এই আশ্রমে আমি কালে কালে নানান্ ঘরে বাস করে এসেছি—কোথাও বেশি দিন স্থায়ী হতে পারিনি। এবার কোণার্কের এই কোঠা থেকেও সরে যাবার চেষ্টায় আছি। মাটির ঘর তৈরি আরম্ভ হয়েছে। মর্ত্ত্যলোকে ঐটেই আশা করচি আমার শেষ বাসা হবে। তারপরে লোকান্তর। এই মাটির ঘরটাকেই অপরূপ করে তোলবার জন্যে আমার আকাঙ্ক্ষা। ইঁট পাথরের অহঙ্কারকে লজ্জা দিতে হবে।

ইতি ১১ ডিসেম্বর ১৯৩৪

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

শান্তিনিকেতন

* * * *

সেদিন Ernest Rhys-এর কাছ থেকে একখানি চিঠি পেয়েছি। ভালো লাগল। গীতাঞ্জলির সত্যযুগে ওঁর সঙ্গে আমার অকৃত্রিম বন্ধুত্ব হয়েছিল। ওঁর স্ত্রী খুব সহৃদয় এবং রসজ্ঞ স্ত্রীলোক ছিলেন। গোল্‌ডর্স্ গ্রীনে ওঁদের বাড়ি ছিল, পিছনের ছোটো আঙিনায় ছিল গোলাপের ক্ষেত—কতদিন অপরাহ্ণের পড়ন্ত রোদে সেখানে ছায়ায় ব'সে চা খেয়েছি গল্প করেছি। ড্রয়িং রুমের কোণে একটি কেদারা ছিল, সেইটেতে আমারি যেন বিশেষ স্বত্ব জন্মে গিয়েছিল। রিজ্ খুব কাজে ব্যস্ত লোক, অথচ যখনি আমার কোনো প্রয়োজন হোত ওঁকে ডেকে পাঠালেই কাজ কামাই করে গোল্‌ডর্স্ গ্রীন থেকে কেন্সিঙটনে এসে উপস্থিত হতেন—ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওঁকে নিয়ে কাটিয়েছি। ওঁদের দুজনের মধ্যে যথার্থ একটি কবিত্বের রস ছিল। * * *

* * * * যে দেশে গেছ সে দেশের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে না পারলে নিজের দেশেরই প্রতি অন্যায় করা হয়। আমাদের নব্য যুবকেরা অনেকে তার উল্টো পথে চলেন। ওদের প্রতি অপ্রিয়তা ও অসৌজন্যকেও তারা পৌরুষ বলে মনে করে। এ কথা ভুলে যায় পরুষ ব্যবহার ইংরেজ যদি সহ্য করে সেটাতে আমাদের বাহাদুরি নেই, সে ওদেরি ঔদার্য্য। * * * *

* * * *

১১ই জুলাই ১৯৩৫
তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

শান্তিনিকেতন

* * *

দিশি এমন একটি কাগজও নেই যাতে আবিসীনিয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ প্রকাশ করেনি। রাষ্ট্রনৈতিক শ্রেয়োবুদ্ধি থেকেই যে এটা করা হয়েছে তা নয়, এর মধ্যে বর্ণভেদমূলক উত্তেজনা আছে।

আমার জীবলীলার মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে সে কথা বলা বাহুল্য। আমি য়ুরোপীয় নই, কর্ম্মের কাছে আত্মবলি দিয়ে শক্তি সাধনার চরম মূল্য স্বীকার করিনে। ভাঁটার গতি সমুদ্রের দিকে, জীবনের এই ভাঁটার খেয়াকে উজানের দিকে লগি ঠেলে চলবার প্রাণপণ প্রয়াসকে ধন্য ধন্য করা আমার ভারতীয় স্বভাববিরুদ্ধ। আজ আমার মন সমুদ্র মুখে, কর্ত্তব্যের দোহাই পাড়লে ফল হবে না। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের বোঝা সম্পূর্ণ হালকা করতে পারিনি, চেষ্টায় আছি, নূতন কর্ম্ম বাড়াব না।

বাইরের কর্ম্মক্ষেত্রে আমাদের নিরুপায় অক্ষমতা সুদীর্ঘকাল স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছি। তার বিরুদ্ধে কণ্ঠচালনা করে সান্ত্বনা চেষ্টারও অন্ত নেই। সেই ক্ষীণ কলরবের ব্যর্থ প্রতিধ্বনি নিজের কাছে ফিরে এসে

আমাদের পরিহাস করে। তবুও এই পথে অনেকদিন স্বরসাধনা করতে ছাড়িনি—এখন দিন শেষ হয়ে এল, বহির্মুখী চেষ্টাগুলোকে প্রতিসংহার করবার সময় এসেছে।

প্রবলের বাহুবল প্রয়োগের যুদ্ধরূপটা আমাদের কাছে স্পষ্ট আকারে দেখা দেয়। তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশের অর্থ বুঝতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু যুদ্ধের চেয়ে দারুণতর অভিঘাত আছে তার লাল রংটা চোখে পড়ে না বলে সে সম্বন্ধে ইণ্টরন্যাশনাল দরদ জাগাবার সম্ভাবনা নেই। তারি সাংঘাতিকতা দুর্ব্বল জাতির পক্ষে সবচেয়ে মর্ম্মান্তিক। আমাদের মতো দুর্ব্বল যখন মার খায় তখন স্বীকার করে নিতে হয় সেটা অনিবার্য্য। আমরা মারের জন্যে নিজের হাতে নিজেকে তৈরি করে নিয়েছি, অথচ বোকার মতো কান্নাকাটি করি। আমাদের কলসকে শতছিদ্র করেই গড়েছি, ঘরে যখন আগুন লাগে জল তখন যায় নিকেশ হয়ে; ধর্ম্মের নামে সেই ফুটো ঘটটাকে মঙ্গলঘট বলেই সযত্নে তুলে রাখি, তারপরে জলাভাব নিয়ে পরের অনুকম্পার পরিমাণ বিচার করি। এমন স্থলে বিদেশী রাজন্যবর্গকে দোষ দিয়ে আত্মপরিতোষ লাভের চেষ্টা লজ্জাজনক মূঢ়তা। ইতিহাসে আমাদের চেয়ে অনেক মজবুৎ জাত মরেছে, আর আমরাই যে দুর্ব্বলতা বুকে আঁকড়ে ধরে চিরকাল বেঁচেই থাকব বিধাতার এমন আদুরে ছেলে আমরা নই। অতএব মরণের রোগীর চিকিৎসা শেষ পর্য্যন্তই করতে হবে কিন্তু আশা ছেড়ে দিয়ে। এত কথা তোমাকে বলবার উদ্দেশ্য হচ্চে এই যে, পঁচাত্তর বছরের জীর্ণ শরীরের বোঝা নিয়ে আয়ুপথের শেষ মাইলটা যখন চলতে হচ্চে তখন উপস্থিত দায় সামলানোই যথেষ্ট কঠিন, আর কোনো উত্তেজনায় এই ফাটলধরা মনটাকে দোল খাওয়াতে উৎসাহ হয় না।

বর্ষামঙ্গল হয়ে গেল, শারদোৎসবের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। পশ্চিম মহাদেশে তোমরা যে সৃষ্টি ও প্রলয়ের বিপুল সমুদ্যোগের সম্মুখে আছ, তোমাদের কাছে আমাদের এই কোণের ঘরের খেলা অত্যন্ত তুচ্ছ বোধ

হবে। কিন্তু এইটুকুর জন্যেই বিধাতার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ—আমাদের থলি ছোট্ট, অল্প দানই অনেকখানি।

ইতি ২৫ আগস্ট ১৯৩৫

৭

পত্রখণ্ড

তর্কের দ্বারা অসম্মান দূর হয় না। কুকুরকে স্পর্শ করি, করে স্নান করিনে, মানুষের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলি; তর্করত্ন মশায়ের কোলে যদি বিড়াল এসে বসে তিনি প্রায়শ্চিত্ত করেন না, মেথরের ছেলে তাঁকে স্পর্শ করলে তিনি অশুচি হন। মেথরের বৃত্তিতে যে মলিনতা সে মলিনতা আমাদের দেহের মধ্যে। মা করেছেন মেথরের কাজ, তার দ্বারা তাঁর প্রতি ভক্তির সঞ্চার হয়। পঙ্কের মধ্যে নেমে মেছনি মাছ ধরে ব'লে সে সকল অবস্থাতেই পঙ্কিল এমন কথার অর্থ নেই। পঙ্ক ধৌত করে যখনি সে নির্ম্মল হয় তখনি অন্যের সঙ্গে তার পার্থক্য নেই। যাকে আমরা হীনবৃত্তি বলি, সে আমাদেরি প্রয়োজনে; অন্তত ব্যক্তিগত আবশ্যকতা অনুসারে আমাদের প্রত্যেকেরই সেই কাজ করা উচিত ছিল। যারা আমাদের হয়ে ক'রে দেয় তাদের ঘৃণা করার মতো ঘৃণ্যতা আর কিছুই নেই। উচ্চবর্ণের মানুষ যে সব দুষ্কৃতি করে থাকে তাদের চরিত্র তার দ্বারা কলুষিত হলেও তারা যদি ধনী ও পদস্থ হয় তবে তাদের সঙ্গ আমরা প্রার্থনা করি। দেহের কলুষ জলেই ধুয়ে যায়, মনের কলুষ গঙ্গাস্নানে যায় ব'লে মনে করা মূঢ়তা,—কিন্তু সেই কলুষিত স্পর্শ তো আমাদের চারদিকেই। মেথরের চেয়ে দেহে মনে মলিন, মলিন রোগে রক্তদূষিত ব্রাহ্মণ কি সমাজ থেকে নির্ব্বাসিত, তারা কি মন্দিরের পূজারী শ্রেণীতেও নেই? ব্রাহ্মণ হোক্ মেথর হোক্, কলুষিতকে ঘৃণা করতে পারি, কিন্তু কোনো জাতকে ঘৃণা করবার স্পর্দ্ধা দেবতা ক্ষমা করেন না—ভারতবর্ষকেও তিনি ক্ষমা করেন নি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবিতা

অষ্টম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা
শারদীয় সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৪৯,
ক্রমিক সংখ্যা ৩৪

'শেষের কবিতা'

'শেষের কবিতা'র যখন প্রথম আবির্ভাব, আমি তখন কলেজের ছাত্র এবং বাংলা সাহিত্যে নবাগত। সে-সময়ে আধুনিক (তখনকার ভাষায় অতি-আধুনিক) সাহিত্য নিয়ে আমাদের সমালোচনার ক্ষেত্র কলহ-কোলাহলে মুখর। আমরা কোমর বেঁধে লেগেছি, বিরুদ্ধ দলেরও প্রচণ্ড উৎসাহ। তারুণ্যের স্পর্ধায় আমরা তখন ভাবছি যে রবীন্দ্র-যুগের সীমানা পেরিয়ে আমরা চলেছি নব-নব দুঃসাহী আবিষ্কারের সন্ধানে। আমরা মনে-মনে রচনার যে-আদর্শ স্থির ক'রে নিয়েছিলাম তা তীক্ষ্ণ এবং তীব্র, তার উন্মাদনায় রবীন্দ্রনাথের রচনাকে বড্ড বেশি মৃদু ব'লে ঘোষণা করতেও আমরা তখনকার মতো কুণ্ঠিত হইনি। ঠিক এইরকম সময়ে রবীন্দ্রনাথের দুটি নতুন উপন্যাস বিভিন্ন মাসিকপত্রে পর-পর দেখা দিলো। 'যোগাযোগ' প্রথমটায় আমাদের মনে সে-রকম নাড়া দিলো না, কিন্তু 'শেষের কবিতা'র প্রথম কিস্তি বেরবার সঙ্গে-সঙ্গে মাথা গেলো ঘুরে। মাসের পর মাস 'শেষের কবিতা' পড়তে-পড়তে পাগল হ'য়ে গিয়েছিলাম। আমরা যা-কিছু করবার চেষ্টা করছিলাম অথচ ঠিক পারছিলাম না, সেই সবই রবীন্দ্রনাথ করেছেন—কী সহজে, কী সম্পূর্ণ ক'রে, কী অনিন্দ্যসুন্দর ভঙ্গিতে। মনে হ'লো বইটা যেন আমাদেরই, অর্থাৎ নবীন লেখকদেরই উদ্দেশ্য ক'রে লেখা, আমাদেরই শিক্ষা দেবার জন্য এটি গুরুদেবের একটি তীব্র মধুর ভর্ৎসনা। অবাক হ'য়ে দেখলুম রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক' মূর্তি—সে যে আমাদের চেয়েও ঢের বেশি আধুনিক। আমাদের কল্পিত রবীন্দ্র-যুগের সীমানা এক ধাক্কায় কোথায় কত দূরে স'রে গেলো; রবীন্দ্র-যুগটাই যে গতিশীল সেটাই হ'য়ে উঠলো আমাদের প্রধান সাহিত্যিক আবিষ্কার। বার-বার যিনি নব-জাত প্রায় সত্তর বছরে আবার তাঁর এক নূতন জন্ম। তাঁর হাতে যে পরাজিত হ'লাম সেই আনন্দে মনে-মনে তাঁকে বার-বার প্রণাম জানালুম, এবং 'শেষের কবিতা'র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা চারদিকে ক'রে বেড়াতে লাগলুম।

তার পরে চোদ্দ বছর কাটলো। ইতিমধ্যে আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে তরুণতর লেখকরা এসেছেন। তাঁরা যে 'শেষের কবিতা' সম্বন্ধে সে-রকম উচ্ছ্বসিত নন সেটা আমার একটা গোপন মর্মপীড়ার কারণ ছিলো। কিন্তু আজ আবার নতুন ক'রে 'শেষের কবিতা' পড়তে গিয়ে অপ্রত্যাশিত ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করলুম। সেই পুরোনো আনন্দের উচ্ছ্বাস আজ আমার মনেও তরঙ্গিত হ'য়ে উঠলো না। নানা প্রশ্ন জাগে। নানা সংশয়ের খোঁচা খেতে হয়। উচ্ছ্বসিত হবার অক্ষমতায় নিজেই অবাক হ'য়ে গেলুম। কিন্তু উচ্ছ্বসিত হ'তে পারলুম না, সেটা সত্য। এর কারণ শুধু এই নয় যে আমার বয়স বেড়েছে। কেননা এটা দেখেছি যে আমার বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে অনেক বইয়ের উজ্জ্বলতাও বাড়ে, যেমন 'গোরা' 'চতুরঙ্গ', 'যোগাযোগ'। 'গল্পগুচ্ছ' তো চিরন্তন—মানুষের তৈরি কোনো জিনিসের পক্ষে যতটা চিরন্তন হওয়া সম্ভব। ভালো বইয়ের লক্ষণই এই যে মন যত বেশি পরিণত হবে তা থেকে ততই বেশি সম্পদ আমরা আহরণ করতে পারবো। আসলে 'শেষের কবিতা'র প্রথম প্রকাশের সময় তার সঙ্গে আমার—এবং আমার সমসাময়িকদের—মনে অনেকগুলি জিনিস জড়িত ছিলো যা নিছক সাহিত্যিক, এমন কি ব্যক্তিগত। অর্থাৎ 'শেষের কবিতা'কে আমরা গ্রহণ করেছিলুম জীবন-ভাষ্য হিসেবে নয়, সাহিত্য-সমালোচনা হিসেবেই। জীবনের রঙে রসে তাকে যাচাই ক'রে দেখিনি; সাহিত্যের, বিশেষ ক'রে তৎকালীন তর্ক-বিতর্কের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যেই তাকে আবদ্ধ ক'রে দেখেছিলুম। এ ভুলটি আমাদের পক্ষে হয়তো অনিবার্য ছিলো, কিন্তু সে-সময়ের পরে যাঁরা বড়ো হলেন তাঁদের সে ভুল করবার কোনো কারণ ছিলো না। আজ অবশ্য আমার মনেও ১৯২৮-২৯-এর তর্কাকীর্ণ আবহাওয়া আর নেই, তাই 'শেষের কবিতা'র প্রকৃত রূপটা স্পষ্ট হ'য়ে চোখে ঠেকলো।

সে-সময়ে সবচেয়ে যেটা আমাদের মনে চমক লাগিয়েছিলো সেটা 'শেষের কবিতা'র ভাষা। অমন গতিশীল, অমন দ্যুতিময় ভাষা বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে আমরা পড়িনি। এ-রকম ভাষা যে বাংলায় সম্ভব তাও আমরা

জানতুম না। ক্রিয়াপদের স্বল্পতার দরুন বাংলাভাষার অত্যন্ত ধীর মেজাজটা আমাদের প্রথম থেকেই পীড়া দিচ্ছিলো, সেটাকে বেশ দ্রুত ও তীক্ষ্ণ ক'রে তোলাই ছিলো আমাদের লক্ষ্য। নানারকম পরীক্ষা হচ্ছিলো, কিছু গতি হয়তো এসেওছিলো, কিন্তু 'শেষের কবিতা'র প্রথম কথা 'অমিত রায় ব্যারিস্টর'—এ-রকম একটি ছোট্ট নিটোল নিখুঁত বাক্য আমরা কেউ কখনো লিখতে পারিনি। এর পাতায়-পাতায় ভাষার এত ঐশ্বর্য ছড়ানো, কোণে-কোণে এত অপরূপ অভিনবত্ব ক্ষণে-ক্ষণে নানা রঙে জ্ব'লে ওঠে যে আমাদের মতো যুবাবয়সী সাহিত্যব্যবসায়ীর পক্ষে আত্মহারা না-হওয়াই অসম্ভব ছিলো। বাংলা গদ্য যে এত সাবলীল হ'তে পারে, তাকে যে ইচ্ছেমতো বাঁকানো হেলানো দুমড়ানো মুচড়ানো সম্ভব, আলো-ছায়ার এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তর যে তাতে ধরা পড়ে, তাতে যে স্বরের এত বিচিত্র মীড়, তালের এত অফুরন্ত কারুকার্য অনায়াসে খেলা করে, তা আমরা কখনো কল্পনাও করিনি; তাই এই বইটি হাতে পেয়ে যে আমাদের মনের অবস্থা চ্যাপম্যানের হোমর প'ড়ে কীট্সের মতো হবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

বাস্তবিকই 'শেষের কবিতা' রবীন্দ্রনাথের গদ্যের একটি অন্যতম শিখর, বাংলা গদ্যের একটি চরম চূড়া। বাংলা গদ্যের সাম্প্রতিক অগ্রগতির মূলে অনেকখানি রয়েছে 'শেষের কবিতার'ই প্রভাব। এই প্রভাবের ফল কখনো-কখনো খারাপও হয়েছে, কিন্তু পৃথিবীতে এমন কোনো ভালো জিনিসই হয়নি যার অক্ষম অনুকরণ রুচিবানকে পীড়িত না করেছে। 'শেষের কবিতা' থেকে বাংলা গদ্যলেখকের দুটি প্রধান শিক্ষা হয়েছে: (১) ক্রিয়াপদের সংখ্যা-হ্রাসেই বাংলা গদ্য গতিশীল ও সাবলীল হ'য়ে ওঠে; (২) বাক্যসংগঠনের ব্যাকরণনির্দিষ্ট ব্যবস্থা ওলোটপালোট করলে—অর্থাৎ inversion ব্যবহার করলে মাঝে-মাঝে খুব চমৎকার ফল পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, উভয় সূত্রেরই যথেষ্ট অপব্যবহার হয়েছে ও হচ্ছে, কিন্তু সে-অপরাধ যে 'শেষের কবিতা'র নয় এ-কথা মনে রাখা দরকার।

'ঘরে-বাইরে'র আলোচনা প্রসঙ্গে আমি তার ভাষার আতিশয্যের উল্লেখ

করেছিলাম। 'শেষের কবিতা'তেও কিছু আতিশয্য আছে, কিন্তু সেটা অন্য জাতের। 'ঘরে বাইরে'তে বড্ড বেশি অলঙ্কার—গদ্যে যতটা সয় তার চেয়ে একটু বেশি। 'শেষের কবিতা'য় বড্ড বেশি কবিত্ব, গদ্যে যতটা সয় তার চাইতে একটু বেশি। বিষয় যেখানে কল্পনা-লীলার অনুকূল সেখানে আমাদের লাভ হয় অপরূপ কবিত্ব, যার সম্মোহন কানে প্রাণে বুদ্ধিতে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে একটি সম্পূর্ণ ইন্দ্রজাল রচনা করে; কিন্তু বিষয় যেখানে অনেকটা পার্থিব স্তরের (এমন অনেক জিনিস উপন্যাসে থাকতে বাধ্য) সেখানে কবিত্বপ্রয়োগে আমাদের লোকশান; যে-কথা স্পষ্ট ক'রে শাদাসিধেভাবে বললেই চলে, এবং তাই বলা দরকার, সেখানে কবিত্বের মায়াজাল বক্তব্যবিষয়কে অস্পষ্ট ক'রে তোলে মাত্র। এ-অসংগতি সবচেয়ে পীড়াদায়ক হয় পাত্রপাত্রীদের কথোপকথনে। লিলি গাঙ্গুলির সঙ্গে অমিতর যে-বাক্যযুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ রিপোর্ট করেছেন, তাতে বুদ্ধির বিচারে রায় দিতে হয় অবশ্যই লিলি গাঙ্গুলির দিকে, কিন্তু লেখক অমিতকেই জিতিয়ে দিলেন একান্তই তার কবিত্বশক্তির জোরে। অমিতর বক্তব্য অতি উদ্দামরকম রোম্যান্টিক, তার তত্ত্বের দিক পরিণত বুদ্ধির কাছে অগ্রাহ্য, কিন্তু সে তার কল্পনাকে একেবারে নিরঙ্কুশ ক'রে দিয়ে দেশ-কালের সীমা-ছাড়ানো আন্তর্জাগতিক স্বর্গলোক থেকে যখন বললে—

"কিন্তু লিলি, কোটি কোটি যুগের পর যদি দৈবাৎ তোমাতে আমাতে মঙ্গলগ্রহের লাল অরণ্যের ছায়ায় তার কোনো-একটা হাজার-ক্রোশী খালের ধারে মুখোমুখি দেখা হয়, আর যদি শকুন্তলার সেই জেলেটা বোয়াল মাছের পেট চিরে আজকের এই অপরূপ সোনার মুহূর্তটিকে আমাদের সামনে এনে ধরে, চমকে উঠে মুখ-চাওয়া-চাউয়ি করব, তারপরে কী হবে ভেবে দেখো।"

তখন মুগ্ধ হ'য়ে চুপ ক'রে যাওয়া ছাড়া আমাদের উপায় থাকে না। যুযুধান বুদ্ধিবৃত্তি সানন্দে নিঃসর্তে হার মানে; এই যে ভাষার একটু ছন্দ, এই যে রূপকের চমক, কল্পনার একটি বিশ্বব্যাপী ইন্দ্রধনু—এটুকু নিয়েই আমাদের হৃদয় কানায়-কানায় ভ'রে ওঠে, তখনকার মতো আর-কিছু চাই না।

অপরপক্ষে অমিতর সঙ্গে যোগমায়ার প্রথম কথোপকথন পদে-পদেই আমাদের সংশয় জাগায়। "আপনি ছিলেন তাঁর লাভের বউদিদি, আমার হবেন লোকসানের মাসিমা"; "মায়ের কোলে জন্মেছি, মাসির জন্যে কোনো তপস্যাই করিনি—গাড়ি ভাঙাটাকে সৎকর্ম বলা চলে না, অথচ এক নিমেষে দেবতার বরের মতো মাসি জীবনে অবতীর্ণ হলেন,—এর পিছনে কত যুগের সূচনা আছে ভেবে দেখুন"—অমিতর এ-সব কথা শুনে শেক্সপিয়রের সেই চিরপুরোনো কথাই মনে পড়ে যে যা-কিছু চকচক করে তাই সোনা নয়। বক্তব্য যেখানে অতি সাধারণ সেখানে এ-ধরনের বাণী-বিন্যাস যেমন অবাস্তব তেমনি অসংগত।

নাটক ও উপন্যাসের কথোপকথন-রচনার সমস্যাটি খুব সহজ নয়। প্রথমেই মেনে নেয়া যেতে পারে যে আমরা পাঁচজনে যে-ভাষায় সাধারণ ঘরোয়া কথাবার্তা চালাই, ঠিক সে-ভাষায় গ্রন্থের পাত্রপাত্রীদের দিয়ে কথা-বলানো অসম্ভব। ধরা যাক সাধারণ শিক্ষিত বাঙালির মুখের কথা। তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক কথাগুলি কেউ যদি এক কোণে চুপ ক'রে ব'সে নোট ক'রে নেয় তাহ'লে সেই অনুলিখন দেখে সবচেয়ে অবাক হবেন বক্তারা স্বয়ং। দেখা যাবে ইংরেজি কথার ছড়াছড়ি, চোখে ঠেকবে অসমাপ্ত বাক্য, সম্ভবত একই বিশেষণের পুনরাবৃত্তি, ধরা পড়বে অনেকের অনেক মুদ্রাদোষ। মোটের উপর, 'আসুন, বসুন' জাতীয় বাঁধা বুলি বাদ দিলে এমন খুব কম কথাই পাওয়া যাবে যা অবিকল বইয়ের পাতায় তোলা যায়। এ-কথা বোধ হয় সকল দেশেই সমান সত্য, যদিও অন্যান্য দেশের বুলিতে বিদেশি কথার প্রাদুর্ভাব কম। আসলে আমরা বেশির ভাগ লোকই কথা দিয়ে মনের ভাব স্পষ্ট ক'রে প্রকাশ করতে পারি না—সাধারণ চিঠিপত্রের অসীম অনৈপুণ্যই তার প্রমাণ। কিন্তু কথোপকথনের সময় কথা-বলায় যা অভাব থাকে তার পূরণ হ'য়ে যায় জীবন্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতে, অঙ্গভঙ্গিতে, কণ্ঠস্বরের কাকুতে, মুখ-চোখের ব্যঞ্জনায়। সেইজন্য যে-কোনো লোকের মুখের কথায় মোটামুটি কাজ চ'লে যাবার বাধা হয় না। কিন্তু অঙ্গভঙ্গি

কণ্ঠস্বর বাদ দিয়ে যেখানে কথাগুলি শুধুই ঠাণ্ডা ছাপানো অক্ষরে পরিবেষ্টিত, সেখানে ও-সব অসম্পূর্ণতা অপাংক্তেয়, সবটুকু জিনিস ভাষা দিয়েই ভ'রে তুলতে হয়। এবং সেখানেই লেখকের কলাকৌশলের ক্ষেত্র। তা যদি না হ'তো তাহ'লে লেখককে—বিশেষ ক'রে গদ্যলেখককে—শিল্পী ব'লে সম্মান করবারই কোনো কারণ থাকতো না, কেননা তিনি যে-কাজ করছেন আমরা পাঁচজনে তো সব সময় তা-ই করছি—যে বোবা নয়, সে-ই তো মুখে-মুখে অসংখ্য গদ্য-বাক্য রচনা করে। কিন্তু যে-কোনোরকম পরীক্ষা করলেই প্রমাণ হয় যে আমরা আমাদের নিজেদেরই মনের কথা ভালো ক'রে প্রকাশ করতে পারি না, লেখক আমাদের হ'য়ে তা-ই করেন, এবং সেইজন্যই তিনি শিল্পী ও নমস্য।

ভাষাব্যবহারে আমাদের স্বাভাবিক অক্ষমতা লেখককে তাঁর কলা-কৌশল দিয়ে ভ'রে তুলতে হয় এ-কথা শুধু উপন্যাসের নয়, নাটকের ক্ষেত্রেও প্রযুজ্য। কেননা যে-নাটক সাহিত্যপদবাচ্য তা গ্রন্থরূপে পাঠ্যও বটে, উপরন্তু রঙ্গমঞ্চে অভিনেতাদের কণ্ঠস্বর ও অঙ্গভঙ্গিতে নাটকীয় চিত্র-রূপটি ভ'রে উঠলেও সেই সঙ্গে বাক্যরচনায় নিখুঁত নৈপুণ্যের জন্যও আমাদের মনে আকাঙ্ক্ষা থাকে, সেটুকু না-পেলে উপভোগ সম্পূর্ণ হয় না। বাস্তবজীবনের কথোপকথনে আমরা প্রায়ই যেমন কথা খুঁজে পাই না, নাটকে বাস্তবিকতার খাতিরে সে-রকম দু'একবার দেখানো যেতে পারে, কিন্তু তার বেশি নয়, পাত্রপাত্রীদের মুখে বেশির ভাগই সম্পূর্ণ নিটোল বাক্য না-বসালে গ্রন্থকারের কাজই অচল হ'য়ে পড়ে। সাহিত্যে বাস্তবিকতা বা রিয়্যালিজ্‌ম্ মানে যে বাস্তবের অবিকল নকল নয় এ-কথা ঘটনা-বিন্যাসের ক্ষেত্রে শুধু নয়, ভাষাব্যবহারের ক্ষেত্রেও সত্য। সেইজন্য, এ-কথা ব'লে আপত্তি করলে চলবে না যে রবীন্দ্রনাথের বইয়ের সব পাত্রপাত্রী রবীন্দ্রনাথেরই ভাষায় কথা বলে, সেটাকে সাহিত্যরচনার একটা রীতি হিসেবেই মেনে নিতে হবে। এবং এ-রীতি শুধু রবীন্দ্রনাথে নয়, আরো অনেক বিশ্ববরেণ্য লেখকের রচনায় পাওয়া যাবে—দু'জনের

নাম সঙ্গে-সঙ্গেই মনে পড়লো : শেক্সপিয়র ও বর্নার্ড শ। শ'র বিরুদ্ধে অবশ্য এ-অভিযোগ অনেকেই এনেছেন যে তাঁর কুশীলবগণ তাঁর নিজের মতামত প্রচার করবার উপলক্ষ্য মাত্র, সকলের মুখে একমেবাদ্বিতীয়ং বর্নার্ড শ-ই কথা বলছেন; কিন্তু শেক্সপিয়র, যিনি লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে নৈর্ব্যক্তিক, যাঁর বিরুদ্ধে বরং মাঝে-মাঝে উল্টো অভিযোগ শোনা যায় যে এত লিখেও কোনোখানে তিনি নিজেকে একটুও ধরা দেননি, তাঁরও রচনায় এই সার্বভৌম বাণীসিদ্ধি যে-কোনো পাঠকই লক্ষ্য ক'রে থাকবেন। অর্থাৎ তাঁর নাট্যাবলীর যে-কোনো চরিত্র—হোক সে মাতাল কি চোর, প্রেমিক কি শয়তান, যোদ্ধা কি রাজা—সে যখনই মুখ খুলবে তখনই তার মুখে শেক্সপীরীয় ভাষার অতুলনীয় ঐশ্বর্যই আমরা শুনবো। বস্তুত, পৃথিবীর নাট্যকার ও কথাসাহিত্যিক বেশির ভাগই এই রীতিরই পক্ষপাতী, এর ব্যতিক্রম খুঁজে পাওয়াই শক্ত। আমি অনেক সময় চিন্তা করেছি এমন-কোনো লেখক জগতে আছেন কিনা যাঁর কথোপকথন-রচনা বিভিন্ন চরিত্রের উপযোগী ক'রে বিভিন্নভাবে লেখা—অর্থাৎ যাঁর গ্রন্থ থেকে কোনো কথা উদ্ধৃত করলে শুধু ভাষার বৈশিষ্ট্য শুনে ব'লে দেয়া যায় সেটি কোন চরিত্রের মুখ থেকে বেরিয়েছে। বাস্তব জীবনে প্রত্যেক মানুষের কণ্ঠস্বর, কথা বলার ধরন, এমনকি উচ্চারণপদ্ধতি স্বতন্ত্র, তাই দিয়ে প্রত্যেকটি মানুষকে আমরা স্বতন্ত্র ক'রে উপলব্ধি করি; কিন্তু বিশ্ববিধাতার এই অফুরন্ত বৈচিত্র্য সাহিত্যবিধাতার পক্ষে অনুকরণ করা অসম্ভব ব'লেই মনে হয়, একই লোকের লেখা ব'লে সকল পাত্র-পাত্রীর মুখের কথা মোটামুটি একই রকম হওয়া প্রায় অনিবার্য (অবশ্য বাংলা নাটকে প্রচলিত মুদ্রাদোষ দিয়ে বৈশিষ্ট্য ফোটানোর কথা এখানে তুলছি না)। ফ্লোবেঅরের পদ্ধতিও আসলে এর ব্যতিক্রম নয়, অন্যান্য লেখকরা নিজের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সকল চরিত্রকে উজ্জীবিত করেন; ফ্লোবেঅর নিজে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, তাঁর কুশীলবগণের কথোপকথন একই সমান সমতল সুরে বাঁধা, সকলেরই ভাষা যথাসম্ভব সংযত, নিরুত্তাপ, এমনকি ঈষৎ নীরস; শুধু কথা শুনে

বিভিন্ন চরিত্রকে চিনে নেবার উপায় নেই। তাই ব'লে এ-কথা বলা যায় না যে মুখের কথার বৈশিষ্ট্য দিয়ে বিভিন্ন চরিত্ররূপ স্পষ্ট ক'রে তোলার রীতি কখনোই দেখা যায়নি—বোধহয় টলস্টয়, ও তাঁর পরে ম্যাক্সিম গোর্কীকে এ-রীতিতে কুশলী বলা যায়।

আমার অধ্যয়নের সীমা নিতান্ত পরিমিত ব'লে এই আলোচনায় হয়তো অসম্পূর্ণতা র'য়ে গেলো, পণ্ডিত বন্ধু-র কাছে আত্মশোধনের সুযোগ পেলে কৃতজ্ঞ হবো। কিন্তু আমার মূল বক্তব্য মেনে নিতে আশা করি কারো আপত্তি হবে না : সেটা এই যে লেখকের পাত্র-পাত্রীরা যদি লেখকেরই ভাষায় কথা বলে তা নিয়ে আপত্তি তুললে সাহিত্যের বিচারে তা টি'কবে না। এখানে আরো একটু কথা আছে : সমাজের বিভিন্ন স্তরের নর-নারী বিভিন্ন ধরনে কথা বলবে, এমনকি তাদের ভাষাব্যবহারেও স্বাতন্ত্র্য থাকবে এটা আমরা ন্যায্যতই শিল্পীর কাছে আশা করতে পারি, এবং সব দেশের সাহিত্যেই এর ব্যবহারও প্রচুর। শরৎচন্দ্রের গোড়ার দিককার গল্পে উপন্যাসে কথোপকথনের বাস্তবিকতা খুব বেশি—গ্রাম্য বামুন, গ্রাম্য বিধবা, গ্রাম্য কৈবর্ত—এদের দলের মধ্যে লেখক হঠাৎ যখন শহুরে লেখাপড়া-শেখা নরেন কি রমেশকে আমদানি করেছেন তখন এই দুই শ্রেণীর কথোপকথনে ভাষার পার্থক্য সহজে ফুটেছে, বাস্তব জীবনে সে-পার্থক্য এতই স্থূল যে সাহিত্যে সেটা সহজেই দেখানো যেতে পারে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পেও শিক্ষিত ভদ্রলোক আর বস্তিবাসীদের কথাবার্তার স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করবার। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝিরা বিশুদ্ধ পূর্ববঙ্গীয় ভাষা না-বললে ঐ অতি সুন্দর উপন্যাসখানার রচনাই ব্যর্থ হ'য়ে যেতো। যেখানে কোনো বিশেষ শ্রেণীর, কিংবা বিশেষ-কোনো প্রাদেশিক ভাষা ব্যবহার করা দরকার সেখানে সমস্যাটি অনেক সহজ, সেই ভাষা জানা থাকলেই লেখকের আর ভাবনা থাকে না। কিন্তু সেই শ্রেণী বা সেই প্রদেশ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না-থাকা সত্ত্বেও যদি লেখক তার ছবি আঁকতে যান তবে, লেখক যতই না শক্তিশালী হোন, সেই চিত্রণ

কিছুটা অবাস্তবিকতার অভিযোগ এড়াতে পারবে না। এই ক্ষেত্রে—'যা জানি না তার কাছে ঘেঁষবো না' এই নীতি অবলম্বন করাই লেখকের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ।

৬. এখন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কথা এই যে শরৎচন্দ্রের কথোপকনে যে-'স্বাভাবিকতা' আমাদের আকর্ষণ করে তা রবীন্দ্রনাথেরও গোড়ার দিককার গল্পে-উপন্যাসে প্রচুর পরিমাণে বর্তমান—সত্যি বলতে, এটি শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথেরই কাছ থেকে সূক্ষ্ম কৌশলে আহরণ করেছেন। যেখানে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে চরিত্র আহরণ করা হয়েছে, সেখানে কথোপকথনেও প্রভেদ স্পষ্ট, 'ঘরে-বাইরে'র পঞ্চু অবশ্যই নিখিলেশের মতো ক'রে কথা বলে না, 'গল্পগুচ্ছে'র কাবুলিওয়ালা, স্টিমার-আপিশের কেরানি, পত্নী-হন্তা কৃষক, পল্লীগ্রামের নিরক্ষর স্ত্রীলোক—এদের কথাবার্তায় বাস্তবিকতার আদর্শ থেকে কোনোখানেই স্খলন হয়নি। এমনকি তাঁর নাটকগুলিতে প্রধান পাত্রপাত্রীর ও জনগণের মুখের কথাতে পার্থক্য আছে—ভাষা হয়তো অনেকটা একরকম কিন্তু ভঙ্গির প্রভেদ স্পষ্ট। তাঁর কৌতুকনাট্যগুলিতেও ভাষা সর্বদাই অত্যন্ত শালীন ও সুন্দর, কিন্তু কোনোখানেই এতখানি অ-সাধারণ নয় যে পাঠক কি শ্রোতা বিমূঢ় হ'য়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের কথোপকথন সম্বন্ধে আপত্তি যাঁরা করেন বিশেষ ক'রে 'শেষের কবিতা' ও তার পরবর্তী গল্প-উপন্যাসগুলিই তাঁদের লক্ষ্য।

পূর্বে বলেছি একেবারে পাঁচজনের মুখের কথার মতো কথা সাহিত্যে সম্ভবই নয়। সাহিত্যে আমরা সে-কথাই চাই, যা আমরা নিজেরা প্রকৃতপক্ষে কখনোই বলতে পারতাম না, কিন্তু শুনে মনে হয় অনায়াসেই পারতাম। আমাদের দেশের অধিকাংশ পৌরাণিক-ঐতিহাসিক নাটকের বাগাড়ম্বর যে মনে কোনো ছাপ রাখে না তার কারণই এই যে ঐ ভাষা জীবনের বাস্তবক্ষেত্র থেকে বহুদূরে অপসৃত। 'একটু অপেক্ষা করো' এই অর্থে যখন গদ্যনাটকের নায়িকা 'ক্ষণেক অপেক্ষা' বলেন তখন হাস্যসংবরণ কঠিন হ'য়ে পড়ে। দেখা যায়, ভাষাকে যথাসম্ভব সুদূর ও অবাস্তব ক'রে তুলতেই আমাদের প্রাচীনপন্থী

নাট্যকার আপ্রাণ সচেষ্ট এবং তার প্রভাব আধুনিক সামাজিক নাটকগুলিতেও কিছু কম নয়। বস্তুত, আমাদের দেশে স্বতন্ত্র একটা নাটুকে ভাষা এবং নাটুকে বলার ধরন গ'ড়ে উঠেছে—সিনেমা ও রেডিও উভয়ই তার দ্বারা সংক্রামিত। অথচ আশ্চর্য এই যে এই অসহ্য কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে জনসাধারণকে বিশেষ-কিছু বলতে শোনা যায় না, রবীন্দ্রনাথের ভাষাকে যাঁরা 'অবাস্তব' বলেন তাঁরাও এই নাটুকে হৈ-চৈ অনায়াসে মেনে নেন। অতএব দেখা যাচ্ছে কাকে বলে বাস্তব আর কাকে বলে না, সে-বিষয়ে আমাদের মনে স্পষ্ট ধারণা নেই, আমাদের মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলি অভ্যাসের দাসত্বমাত্র করে। অপর পক্ষে, অত্যন্ত বাস্তব হবার চেষ্টায় আধুনিক বিলেতি নাটক ও সিনেমার (কখনো-কখনো নভেলেরও) ঝোঁক হচ্ছে লম্বা বক্তৃতা, আবেগপ্রধান কথা সব ছেঁটে ফেলে পিংপং খেলার মতো পিঠ-পিঠ কথাবার্তা চালানো। এখানেও ভেবে দেখবার আছে যে ঠিক এ-ধরনের কথাবার্তা বাস্তবজীবনে কখনোই হ'তে পারে না, এটাও অন্য নানা রীতির মতো একটা সাহিত্যিক রীতি মাত্র। সাহিত্যে যে অনেকখানি কলাকৌশলের ক্ষেত্র আছে, জীবনকে ছেঁটে-কেটে ভেঙে-গ'ড়ে না-নিলে সে যে কিছুই করতে পারে না, এ-কথা একবারে স্বীকার ক'রে নেয়াই ভালো।

এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে কথোপকথনের সর্বত্র রাবীন্দ্রিক সমতার 'শেষের কবিতা'ই চরম উদাহরণ, এবং তার পরের বইগুলিও ('দুই বোন,' 'মালঞ্চ', 'বাঁশরী', 'চার অধ্যায়,' 'তিন সঙ্গী') এই পথ ধ'রেই চলেছে। এর একটা কারণ অবশ্য স্পষ্ট: 'শেষের কবিতা'র সকল চরিত্রই একই সামাজিক স্তর থেকে গৃহীত এবং সেটি বাঙালি সমাজের উচ্চতম স্তর; শিক্ষা-দীক্ষায় তারা সকলেই প্রায় সমান, এবং সে-শিক্ষা উচ্চশিক্ষা। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে কথাবার্তার প্রভেদ এত স্থূল যে তা শুধু যে সহজেই দেখানো যায় তা নয়, না-দেখানোটাই অন্যায়, কিন্তু সকলে একই স্তরের হ'লে পার্থক্যটি ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যে এসে ঠেকে, এবং সেটি পৃথিবীর বহু মহৎ লেখকই সাহিত্যে চিত্রিত করেননি এ-আলোচনা পূর্বেই করেছি। সেটা আমরা আশা করবো

না, যদি কদাচ কখনো পেয়ে যাই সেটা হবে আমাদের উপরি পাওনা। কিন্তু 'শেষের কবিতা'র অত্যন্ত কবিত্বময় ভাষা কথোপকথনের অনেক ক্ষেত্রেই অসংগত হয়েছে এ-কথা না-মেনে উপায় নেই। বিষয়টি তুচ্ছ, ভাষা হয়েছে তার অনুপাতে বড্ড বেশি জমকালো। 'এখন যাই' কি 'কাল আসবো' এ-ধরনের কথাও যদি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিবিধ উপমা ও সাহিত্যিক উল্লেখের সাহায্যে বলা হয় তাহ'লে একদিকে শাদা কথাটা স্পষ্ট হয় না, অন্যদিকে কবিত্ব জিনিসটাকে নষ্ট করা হয়। 'শেষের কবিতা'র প্রধান পাত্র অমিত রায় অবশ্য প্রধানতই বাণীবিলাসী, অতি সুন্দর, এবং তার চেয়েও বেশি চমক-লাগানো কথা অনর্গল ব'লে যাওয়াই তার জীবনের কাজ, তার কাছ থেকে এ-রকম আতিশয্যের জন্য আমরা প্রস্তুত হ'য়েই থাকি—তবু তারও সব কথা যে বরদাস্ত করতে পারি তা নয়। প্রায়ই তাকে মনে হয় অভিনেতা—তার কথাগুলি যেন প্রাণের তাগিদে বলা নয়, ভালো শোনাবে ব'লেই বলা। তবে অমিতকে আমরা জানি, তার কাছে এ ছাড়া অন্য কিছু আশা করাও উচিত নয় তাও বুঝি। কিন্তু সবচেয়ে বিস্মিত হই যখন দেখি লাবণ্য, যোগমায়া স্বয়ং আর শেষের দিকে বেচারা যতিশঙ্কর—সকলেই অমিতর অনুকরণ ক'রে কথা বলছে, একটা সোজা কথা কারো মুখ দিয়ে যেন বেরোতেই চায় না। এখানে রবীন্দ্রনাথ সকলের মুখে তাঁর ভাষা বসিয়ে দিচ্ছেন না—তাহ'লে আপত্তি করতুম না—এখানে অমিতর ভাষাই অন্যদের ভাষা। এ-ব্যবস্থায় মন স্বভাবতই বিমুখ হয়, এবং হাওয়া-বদলের জন্য সিসি-লিসির দলের সামান্য আলাপ-আলোচনা অনুধাবন করে—ওরা অমিতর চাইতে অন্তত কম মেকি—এবং ওদের কথাবার্তায় সরসতা বেশি না থাক, সাধারণ সততা আছে। আর যে একটিমাত্র পরিচ্ছেদে কেটি মিটার ভালো ক'রে দেখা দিলো, এবং দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেলো—সেখানে কেটির মুখের কথায় সৌন্দর্য আছে যথেষ্ট, কিন্তু সেই সঙ্গে আছে প্রাণের স্পর্শ। ওগুলো তার ভাণের কথা নয়, তার প্রাণের কথা, বলতে-বলতে তার বুকের মধ্যে কী হচ্ছে তা কল্পনা করা আমাদের পক্ষে শক্ত হয় না। কথাটা বলতে হয়তো সাহস দরকার,

তবু বলি যে এতখানি গভীর বেদনার সুর অমিত-লাবণ্যের কথোপকথনে একবারও লাগেনি।

'শেষের কবিতা'র কথোপকথন সম্বন্ধেই নানা তর্ক-বিতর্ক, কিন্তু তার বর্ণনা বা আখ্যানের অংশ, যেখানে রবীন্দ্রনাথই বক্তা, সেখানে ভাষার অপরূপ ঐশ্বর্য বারে-বারেই আমাদের রুদ্ধশ্বাস অভিনন্দন কেড়ে নেয়। পাতায়-পাতায় এমন আশ্চর্য কারুকর্ম, পংক্তিতে-পংক্তিতে এমন ধ্বনিবৈচিত্র্য, এমন বর্ণবিচ্ছুরণ যে আমাদের অবস্থাটা হয় ঠিক যেন 'পদ্মের মাঝখানে ভ্রমরের মতো'—এটাও রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলছি। দু' একটা বহু-উদ্ধৃত উদাহরণই দিচ্ছি:

অমিতর দুর্লভ যুবকত্ব নির্জলা যৌবনের জোরেই, একেবারে বেহিসেবি, উড়নচণ্ডী, বান ডেকে ছুটে চলেছে বাইরের দিকে, সমস্ত নিয়ে চলেছে ভাসিয়ে, হাতে কিছুই রাখে না।

এ কবিতার মতো ক'রে পড়তে হয়, ধীরে-ধীরে, চেখে-চেখে, যেটুকু বলবার তা বলা হ'য়ে গেলেও এ ফুরিয়ে যায় না, মনের মধ্যে ধ্বনির গুনগুনানি চলতে থাকে।

আর-একটি উদাহরণ নেয়া যাক—একটি বিশুদ্ধ গদ্যকবিতা:

তাই ও যখন ভাবছে পালাই, পাহাড় বেয়ে নেমে গিয়ে পায়ে হেঁটে শিলেট শিলচরের ভিতর দিয়ে যেখানে খুশি, এমন সময় আষাঢ় এল পাহাড়ে পাহাড়ে বনে বনে তার সজল ঘনচ্ছায়ার চাদর লুটিয়ে। খবর পাওয়া গেল, চেরাপুঞ্জির গিরিশৃঙ্গ নববর্ষার মেঘদলের পুঞ্জিত আক্রমণ আপন বুক দিয়ে ঠেকিয়েছে; এইবার ঘন বর্ষণে গিরিনির্ঝরিণী-গুলোকে খেপিয়ে কূলছাড়া করবে। স্থির করলে, এই সময়টাতে কিছুদিনের জন্যে চেরাপুঞ্জির ডাকবাংলোয় এমন মেঘদূত জমিয়ে তুলবে যার অলক্ষ্য অলকার নায়িকা অশরীরী বিদ্যুতের মতো, চিত্ত-আকাশে ক্ষণে ক্ষণে চমক দেয়, নাম লেখে না, ঠিকানা রেখে যায় না।

কাব্যের দৈহিক উপকরণ সবই এখানে আছে—নিখুঁত ছন্দ, বিচিত্র অনুপ্রাস, অতর্কিত উপমা, আশ্চর্য রূপক। আর এর ভাববস্তু যে কাব্যের তা অবশ্য না-বললেও চলে।

এমনি ছোটো-ছোটো এক-একটি গদ্যকবিতা 'শেষের কবিতা'র এখানে-ওখানে রবীন্দ্রনাথ দু'হাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছেন, যেন তাদের মূল্য

কিছুই নয়, যেন রচনাকালে তাদের প'ড়ে দেখবার জন্য এক মুহূর্ত তিনি থামেনওনি। গল্পের স্রোতে তারা ভেসে এসেছে, গল্পের টানে গেছে পিছনে প'ড়ে, সমস্ত কাহিনীটির মধ্যে কবি তাদের বুনে দিয়েছেন, কোনো-এক জায়গায় তারা বিশেষ হ'য়ে, দ্রষ্টব্য হ'য়ে ফুটে নেই। তারা আলাদা নয়, তারা গল্পেরই রক্তমাংসের অংশ, যে-সব পাঠক 'বর্ণনা' বাদ দিয়ে গল্প পড়েন তারা এ-সব বাদ দিতে গেলে গল্পের সূত্রই হারিয়ে ফেলবেন—তবে 'বর্ণনা' যাঁরা ভালোবাসেন না হয়তো তাঁরা 'শেষের কবিতা' পড়বেনই না।

'শেষের কবিতা' শুধু যে কবিত্বের জাদুকর-আলোয় উজ্জ্বল তা নয়, উপরন্তু ক্ষণে-ক্ষণে বিদ্রূপের বিদ্যুৎবিকাশে উদ্ভাসিত। এর মেজাজ অনেকখানিই ব্যঙ্গরচনার, তাই এতে চিত্তপ্রফুল্লকারী বিশুদ্ধ হাস্যকৌতুক যেমন অজস্র, তেমনি আবার মাঝে-মাঝে তীব্র বিদ্রূপ বিস্ফোরক পদার্থের মতো জ্ব'লে ওঠে, যার উদ্দেশ্য স্পষ্ট এবং আঘাত প্রচণ্ড। কবিত্বের উদাহরণ দু'একটি দিয়েছি, এইবার রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ-রীতির একটি নমুনা তুলে এ-প্রসঙ্গ শেষ করি। একটু বেশি ক'রেই তুলবো, চতুর্দশ পরিচ্ছেদে নরেন মিটারের বর্ণনার সমস্তটা। এই অংশটুকুতে এক ধরনের গদ্যের চরম উৎকর্ষ প্রকাশ পেয়েছে, এ-কথা বলতে আমার একটুও কুণ্ঠা নেই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ-লেখকদের শ্রেষ্ঠ রচনার পাশে এর স্থান :

নরেন মিটার দীর্ঘকাল য়ুরোপে ছিল। জমিদারের ছেলে, আয়ের জন্য ভাবনা নেই, ব্যয়ের জন্যেও; বিদ্যার্জনের ভাবনাও সেই পরিমাণে লঘু। বিদেশে ব্যয়ের প্রতিই অধিক মনোযোগ করেছিল, অর্থ এবং সময় দুই দিক থেকেই। নিজেকে আর্টিস্ট বলে পরিচয় দিতে পারলে একই কালে দায়মুক্ত স্বাধীনতা ও অহৈতুক আত্মসম্মান লাভ করা যায়। এই জন্যে আর্ট সরস্বতীর অনুসরণে য়ুরোপের অনেক বড়ো বড়ো শহরের বোহিমীয় পাড়ায় সে বাস করেছে। কিছুদিন চেষ্টার পর স্পষ্টবক্তা হিতৈষীদের কঠোর অনুরোধে ছবি আঁকা ছেড়ে দিতে হল, এখন সে ছবির সমজদারিতে পরিপক্ক বলেই নিজের প্রমাণনিরপেক্ষ পরিচয় দেয়। চিত্রকলা সে ফলাতে পারে না কিন্তু দুই হাতে সেটাকে চটকাতে পারে। ফরাসি ছাঁচে সে তার গোঁফের দুই প্রত্যন্তদেশকে সযত্নে কণ্টকিত করেছে, এদিকে মাথায় ঝাঁকড়া চুলের প্রতি তার সযত্ন অবহেলা। চেহারাখানা

তার ভালোই, কিন্তু আরো ভালো করবার মহার্ঘ্য সাধনায় তার আয়নার টেবিল প্যারিসীয় বিলাসবৈচিত্র্যে ভারাক্রান্ত। তার মুখ ধোবার টেবিলের উপকরণ দশাননের পক্ষেও বাহুল্য হত। দামি হাভানা দু-চার টান টেনেই অনায়াসেই সেটাকে অবজ্ঞা করা, এবং মাসে মাসে গাত্রবস্ত্র পার্সেল পোস্টে ফরাসি ধোবার বাড়িতে ধুইয়ে আনানো—এ-সব দেখে ওর আভিজাত্য সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি করতে সাহস হয় না। য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ দরজিশালার রেজিস্ট্রি বহিতে ওর গায়ের মাপ ও নম্বর লেখা, এমন সব কোঠায়, যেখানে খুঁজলে পাতিয়ালা-কর্পূরতলার নাম পাওয়া যেতে পারে। ওর স্ল্যাঙ্-বিকীর্ণ ইংরেজি ভাষার উচ্চারণটা বিজড়িত বিলম্বিত, আমীলিত চক্ষুর অলস কটাক্ষসহযোগে অনতিব্যক্ত; যারা অভিজ্ঞ তাদের কাছে শোনা যায় ইংলণ্ডের অনেক নীলরক্তবান্ আমীরদের কণ্ঠস্বরে এই রকম গদ্‌গদ জড়িমা। এর উপরে ঘোড়দৌড়ীয় অপভাষা এবং বিলিতি শপথের দুর্বাক্যসম্পদে সে তার দলের লোকের আদর্শ পুরুষ।

'শেষের কবিতা'য় মুহূর্তের জন্যও যে দেখা দিয়েছে তাকেও রবীন্দ্রনাথ সবিস্তারে বর্ণনা ক'রে ধন্য করেছেন, একমাত্র ব্যতিক্রম বোধ হয় শোভনলাল। এতগুলি বর্ণনার মধ্যে এই নরেন মিটার, গল্পস্রোতে যার বলতে গেলে কোনো অংশই নেই, তারই ভাগ্যে জুটলো একটি অমর রচনা—মনে হয় কোনো-কোনো দিক থেকে অমিতর বর্ণনাকেও এ ছাড়িয়ে গেছে। এটাও মনে রাখতে হয় যে কোনো-কোনো বর্ণনায় একটু যেন চেষ্টার আভাস আছে—ভাষার ঐশ্বর্য অফুরন্ত, কিন্তু ঠিক সেই অনিবার্যতার ভাবটি যেন নেই; পড়তে-পড়তে মন যেন তৎক্ষণাৎ সায় দিয়ে ব'লে ওঠে না—ঠিক, ঠিক! এ তো হ'তেই হবে! নরেনের অব্যবহিত পরেই রবীন্দ্রনাথ কেটিকে ধরেছেন, সেখানে কেটি একটি সামাজিক ছাঁদের প্রতিনিধি হ'য়ে গেছে, মনে হয় জীবনে না হোক সাহিত্যে এ-রকম অনেক মেয়েই দেখেছি; যোগমায়া সম্বন্ধেও সেই কথা, এমনকি লাবণ্য সম্বন্ধেও তা-ই। কিন্তু উদ্ধৃত অংশে নরেন মিটারেরই ব্যক্তিস্বরূপ কঠিন দীপ্তিতে প্রকাশিত; ভালো-মন্দ যা-ই হোক, সে যা সে তা-ই, সে আর-কেউ নয়, সে নরেন মিটার। এই লোকটি কিছুই বলে না বা করে না, কিন্তু শুদ্ধু এই বর্ণনাটুকুর জোরে সে আমাদের মনে চিরকালের মতো আঁকা হ'য়ে রইলো। বাস্তব জীবনে তার সঙ্গ নিশ্চয়ই বিশেষ উপাদেয় হবে না, কিন্তু

শিল্পকলার অমরাবতীতে তার স্বকীয়তায় আমরা মুগ্ধ হলুম। তাকে পছন্দ করি আর না করি, তাকে ভুল করবার কিংবা ভুলে যাবার উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথ একেবারে জ্যান্ত মানুষটাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, শুধু তাঁর ভাষার আশ্চর্য কলাকৌশলে। বিদ্রূপাত্মক গদ্যের তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম ব্যবহারে এখানে রবীন্দ্রনাথ যেন প্রায় নিজেকেই ছাড়িয়ে গেছেন। শ্লেষ-নৈপুণ্যে, অনতিব্যক্ত পরিহাসের মর্মান্তিক আঘাতে, আঠারো শতকের ইংরেজি পদ্যের ও ফরাসি গদ্যের স্মারক অ্যান্টিথিসিসের চতুরালিতে, সবচেয়ে বেশি অভাবনীয় বিশেষণের আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাতে—এই রচনাটুকু আমাদের সাহিত্যের একটি পরম সম্পদ। এ-গদ্যের স্বাদ এতই নিবিড় তা যেন জিভ দিয়ে চেখে দেখতে হয়, কথাগুলোকে জিভে রেখে গড়িয়ে-গড়িয়ে একটু-একটু ক'রে গ্রহণ করলে তবে এর সম্পূর্ণ স্বাদ উপভোগ করা যায়—ঢকঢক ক'রে গিলে খাবার জিনিস এ নয়, এর সম্ভোগ কবিতার মতোই দীর্ঘায়ত। যাঁরা নিছক গল্পের নেশায় ঊর্ধ্বশ্বাসে নভেল পড়েন, কোনো অংশই একবারের বেশি দু'বার পড়েন না, কোনো-কোনো অংশ বাদও দেন, 'শেষের কবিতা' হাতে নিলে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের প্রতি ও নিজেদের প্রতি সমান অবিচার করবেন।

অনেকের এমন মত হ'তে পারে যে ভাষার স্বতন্ত্র মূল্যীকরণ শুধু কবিতার ক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিক, কথাসাহিত্যের আলোচনায় এর বিশেষ মূল্য নেই কেননা ভাষা উপন্যাসের ক্ষেত্রে মিডিয়ম মাত্র, সেখানে গল্পটাই আসল। উপন্যাস পড়বার সময় আমাদের মনে যা পৌঁছয় তা কতগুলো ভাষাবিন্যাস নয়, গল্পের একটা ধারাবাহিক স্রোত, ভাষা ছাড়া গল্পটা পৌঁছিয়ে দেবার উপায় নেই, এ ছাড়া ভাষার কোনো মূল্য নেই। অন্যপক্ষে, কবিতা যখন পড়ি ভাষা নিজেই আমাদের মনে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে। কবিতা ও গল্প-উপন্যাসের এ-মৌল প্রভেদ অনস্বীকার্য, কিন্তু এ দুয়ে মেলামেশা হ'লেও আমরা আপত্তি করি না। গল্প যখন কবিতায় (এমনকি গদ্যকবিতায়) লেখা হয় তখন আমরা একাধারে ভাষা-উপভোগের আনন্দ ও গল্প-পড়ার

উত্তেজনা অনুভব করি, আবার গল্প-উপন্যাসের মধ্যে কবিত্বের রস মেশানো থাকলে আমাদের উপভোগ বাড়ে বই কমে না। বস্তুত, কথা-সাহিত্যিকের রচনা একান্ত কবিত্বহীন হ'লে আমাদের পরিপূর্ণ তৃপ্তি যেন হয় না, যে-কারণে শরৎচন্দ্রের রচনা বার বার প'ড়েও আমাদের মনে একটু অভাব-বোধ থেকেই যায়। পৃথিবীতে যে ঋতুর পর ঋতু আসে, গাছ ফুল পাখি বৃষ্টি হাওয়া ইত্যাদি নানা অ-মানুষী জিনিসে যে আমাদের মনুষ্যজীবন দিনে-দিনে ভ'রে ওঠে, এ-বিষয়ে শরৎচন্দ্র অচেতন, তাঁর সাহিত্যে বয়স্ক মানুষ ছাড়া কারো স্থান নেই—শিশুও বর্জিত। এ-অভাব গল্পের নেশায় কিছুদিন ভুলে থাকা যায়; কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই অসম্পূর্ণতায় আপত্তি না-ক'রে উপায় থাকে না। প্রকৃতির উল্লেখ যেখানে সিনেমায় হঠাৎ-দেখানো 'দৃশ্যে'র মতো অকারণ সাড়ম্বর বর্ণনায় পর্যবসিত, সেখানে অবশ্য তা বাদ দেয়াই ভালো, কিন্তু কবিত্ব যাকে বলি আমার তো মনে হয় তা উপন্যাসের পূর্ণতার পক্ষেও দরকার। সেটা না-থাকলে দৃষ্টি যথেষ্ট ব্যাপক হয় না। ইঁটে কাঠে গড়া বাড়ির মধ্যে কয়েকটি মানুষের জীবন নিয়ে একটি গল্প সহজেই গ'ড়ে উঠতে পারে, কিন্তু ও-সব ঘটনারই সঙ্গে-সঙ্গে যে বৃষ্টি পড়েছে, চাঁদ উঠেছে, হাওয়া দিয়েছে, এগুলোও তো বাস্তব সত্যই, এদের সম্বন্ধে সচেতন না-হ'লে গল্পটিই ঠিক সম্পূর্ণ নয়। এরা গল্পের বাইরের কোনো জিনিস নয়, এরা গল্পের গড়নেরই অঙ্গ।

রবীন্দ্রনাথের যে-কোনো রচনাতেই ভাষাব্যবহারের দিকটা এত প্রধান যে তার প্রতি দৃষ্টিপাত না-করলে সমালোচকের কর্তব্যপালনে ত্রুটি থেকে যায়। বিশেষ ক'রে, 'ঘরে-বাইরে' কি 'শেষের কবিতা'র মতো উপন্যাসের বেলায় ভাষাকে স্বতন্ত্রভাবে পরীক্ষা না-করলে সমালোচনা সম্পূর্ণ হ'তেই পারে না। 'ঘরে-বাইরে'র ভাষার আলোচনা প্রসঙ্গে আমি বলেছিলাম যে 'ঘরে-বাইরে' আর 'শেষের কবিতা'—এ দুটি রবীন্দ্রনাথের গদ্যের মোড়-ফেরানো গ্রন্থ। 'ঘরে-বাইরে'তে তিনি চলতি ভাষাকে জাতে তুললেন, কিন্তু জাতে তুলতে গিয়ে সাধুভাষার অনেক-কিছু লক্ষণ তাতে রেখে দিলেন,

যাতে কেউ তাকে অবজ্ঞা করতে সাহস না পায়। 'শেষের কবিতা'য় তিনি চলতি ভাষাকে—তথা বাংলাভাষাকে—নতুন ক'রে সৃষ্টি করলেন; ১৯২৮ সালে চলতি ভাষাকে অবজ্ঞা করবার কথাই ওঠে না, তাই এ-ভাষা সত্যিকার চলতি ভাষা হ'তে পারলো। জাত খোয়াবার ভয় এর আর নেই, তাই এর শব্দসম্ভার একদিকে মুখের বুলি থেকে আহরিত হ'লো, অন্যদিকে সংস্কৃত অভিধানটাকেও উপেক্ষা করলে না, তার উপর রবীন্দ্রনাথের নিজের উদ্ভাবিত নানা বিচিত্র শব্দে থেকে-থেকে ঝলমল ক'রে উঠলো। 'বন্ধুনি,' 'পাথার বাড়ি,' 'ঘোড়দৌড়ীয় অপভাষা,' 'শাড়িটা গায়ে তির্যগ্‌ভঙ্গীতে আঁট করে ল্যাপ্টানো'—এ-ধরনের কথা রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে-বাইরে'তে লেখেননি, 'লিপিকা'য় অবশ্য এর সুযোগই ছিলো না—এ-সব প্রথম এলো 'শেষের কবিতা'য়, আর তারই সঙ্গে রইলো অনিন্দ্য সাংস্কৃতিক শালীনতা। এই অপরূপ গুরুচণ্ডালী দ্বারা রবীন্দ্রনাথ বাংলা গদ্যের এক বিশাল অপূর্ব সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিলেন—এর প্রভাব আজ এতই ব্যাপক যে 'শেষের কবিতা'র যাঁরা ভক্ত নন তাঁদেরও রচনা অজ্ঞাতসারেই এর ভাষার কাছে ঋণী।

রচনারীতির দিক থেকে 'ঘরে-বাইরে' আর 'শেষের কবিতা'র প্রভেদ রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষাতেই বলা যায়। অমিত রায় তার সাহিত্যসভার বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যা বলছে তা উদ্ধৃত ক'রে আমরা বলতে পারি যে 'ঘরে-বাইরে'তে রবীন্দ্রনাথের 'রচনারেখা তাঁরই হাতের অক্ষরের মতো—গোল বা তরঙ্গরেখা, গোলাপ বা নারীর মুখ বা চাঁদের ধরনে'। এ-কথা অমিত অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাবলী সম্বন্ধেই বলেছিলো, এবং কথাটা মিথ্যেও নয়। তবে এ-বর্ণনা 'ঘরে-বাইরে' সম্বন্ধে বিশেষভাবেই প্রযুজ্য, ও-বইয়ের রচনারীতি ঢেউ-খেলানো, গড়ানো, গোল-গোল ছাঁদে ব'য়ে চলা, তার ধারাবাহিকতা নিরবচ্ছিন্ন, তার স্রোত অব্যাহত। এদিকে অমিত তার সাহিত্যজগতের নতুন প্রেসিডেন্টের কাছে যা চাইছে, 'শেষের কবিতা' তারই কিছু-কিছু সর্তপূরণ করেছে, সবগুলি যদিও নয়। '...চাই কড়া লাইনের খাড়া লাইনের রচনা—তীরের মতো, বর্শার ফলার মতো, কাঁটার

মতো, ফুলের মতো নয়, বিদ্যুতের রেখার মতো, ন্যুর্যালজিয়ার ব্যথার মতো, খোঁচাওআলা, কোণওআলা, গথিক গির্জের ছাঁদে, মন্দিরের মণ্ডপের ছাঁদে নয়, এমন কি, যদি চটকল, পাটকল অথবা সেক্রেটারিয়েট বিলডিঙের আদলে হয়, ক্ষতি নেই।' 'শেষের কবিতা'য় কোণ অগুনতি, মোড় অসংখ্য, খোঁচা খুবই আছে, কাঁটাও মাঝে-মাঝে বেঁধে, যাকে বেঁধে সে-ই বোঝে সে কতখানি। এর রচনারীতি তীরের মতো, বিদ্যুতের রেখার মতো নিশ্চয়ই, ঠিক উপলক্ষ্যটি ঘটলে বর্শার ফলার মতো হ'য়ে উঠতেও তার বাধে না। কাটাছাঁটা এর ধরন, আঁটোসাঁটো এর গড়ন, এর ঝোঁক সংহতির দিকে, এর রূপ উজ্জ্বল কঠিন ধাতব পদার্থের, এর আকস্মিক মনীষার দীপ্তি হীরের মতো চোখ-ঝলসানো। আমরা যারা সে-সময়ে গদ্য লেখায় হাত পাকাচ্ছিলাম সেই সব যুবকদের রচনায় হয়তো কখনো-কখনো ন্যুর্যালজিয়ার ব্যথার আমেজ লাগতো, কিংবা তার ছাঁদটা হয়ে উঠতো চটকল পাটকল সেক্রেটারিয়েট বিলডিঙের ধরনের; তীব্র দ্রুত সংক্ষিপ্ত হ'তে গিয়ে আমরা প্রায়ই হয়তো পাঠকের কান ও মনকে কঠোরভাবে নিপীড়ন করতুম, একেবারে ছন্দ-ছাড়া, ছন্নছাড়া হয়ে পড়তুম। 'শেষের কবিতা' সংহত হ'লো অথচ কর্কশ হ'লো না; তীব্র হ'লো, দ্রুত হ'লো, তবু লাবণ্য হারালো না; বীতছন্দ হ'লো না, হ'লো মুক্তছন্দ। আমরা যুবকরা যা করবার চেষ্টা করছিলাম, সেই চেষ্টাকে রবীন্দ্রনাথ বিদ্রূপ করলেন আবার তারি সঙ্গে-সঙ্গে তা-ই সৃষ্টি করলেন যা আমাদের চেষ্টার লক্ষ্য। আমাদের মানসলোকের বাণী তিনি আহরণ ক'রে যখন নিয়ে এলেন, নতশিরে গ্রহণ করলুম সেই অমূল্য উপঢৌকন, আর মনে-মনে বললুম, তুমি আমাদের প্রণম্য।

বুদ্ধদেব বসু

* রবীন্দ্র-রচনাবলী। দশম খণ্ড।

কাঠখোদাই : রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

শিল্পীর সৌজন্যে

বিভিন্ন কোরাস

জীবনানন্দ দাশ

১

পৃথিবীতে ঢের দিন বেঁচে থেকে আমাদের আয়ু
এখন মৃত্যুর শব্দ শোনে দিনমান।
হৃদয়কে চোখঠার দিয়ে ঘুমে রেখে
হয়তো দুর্যোগে তৃপ্তি পেতে পারে কান ;

এ রকম একদিন মনে হয়েছিল ;—
অনেক নিকটে তবু সেই ঘোর ঘনায়েছে আজ ;
আমাদের উঁচুনিচু দেয়ালের ভিতরে খোড়লে
ততোধিক গুণাগার আপনার কাজ

ক'রে যায় ;—ঘরের ভিতর থেকে খসে গিয়ে সন্ততির মন
বিভীষণ, নৃসিংহের আবেদন পরিপাক ক'রে
ভোরের ভিতর থেকে বিকেলের দিকে চ'লে যায়,
রাতকে উপেক্ষা ক'রে পুনরায় ভোরে

ফিরে আসে ;—তবুও তাদের কোনো বাসস্থান নেই,
যদিও বিশ্বাসে চোখ বুজে ঘর করেছি নির্মাণ
ঢের আগে একদিন ;—গ্রাসাচ্ছাদন নেই তবুও তাদের,
যদিও মাটির দিকে মুখ রেখে পৃথিবীর ধ্যান

রুয়ে গেছি একদিন ;—অন্য সব জিনিষ হারায়ে,
সমস্ত চিন্তার দেশ ঘুরে তবু তাহাদের মন
অলোকসামান্যভাবে সুচিন্তাকে অধিকার ক'রে
কোথাও সম্মুখে পথ, পশ্চাদ্‌গমন

হারায়েছে ;—উতরোল নীরবতা আমাদের ঘরে।
আমরা তো বহুদিন লক্ষ্য চেয়ে নগরীর পথে
হেঁটে গেছি ;—কাজ ক'রে চ'লে গেছি অর্থভোগ ক'রে ;
ভোট দিয়ে মিশে গেছি জনমতামতে।

গ্রন্থকে বিশ্বাস ক'রে প'ড়ে গেছি ;
সহধর্মীদের সাথে জীবনের আখড়াই, স্বাক্ষরের অক্ষরের কথা
মনে ক'রে নিয়ে ঢের পাপ ক'রে, পাপকথা উচ্চারণ ক'রে,
তবুও বিশ্বাসভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে জীবনের যৌন একাগ্রতা

হারাই নি ;—তবুও কোথাও কোনো প্রীতি নেই এতদিন পরে।
নগরীর রাজপথে মোড়ে মোড়ে চিহ্ন প'ড়ে আছে ;
একটি মৃতের দেহ অপরের শবকে জড়ায়ে
তবুও আতঙ্কে হিম—হয়তো দ্বিতীয় কোনো মরণের কাছে।

আমাদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, নারী, হেমন্তের হলুদ ফসল
ইতস্তত চ'লে যায় যে যাহার স্বর্গের সন্ধানে ;
কারু মুখে তবুও দ্বিরুক্তি নেই—পথ নেই ব'লে,
যথাস্থান থেকে খ'সে তবুও সকলি যথাস্থানে

র'য়ে যায় ;—শতাব্দীর শেষ হ'লে এ রকম আবিষ্ট নিয়ম
নেমে আসে ;—বিকেলের বারান্দার থেকে সব জীর্ণ নরনারী
চেয়ে আছে পড়ন্ত রোদের পারে সূর্য্যের দিকে :
খণ্ডহীন মণ্ডলের মত বেলোয়ারি।

২

নিকটে মরুর মত মহাদেশ ছড়ায়ে র'য়েছে :
যতদূর চোখ যায়—অনুভব করি ;
তবু তাকে সমুদ্রের তিতীর্ষু আলোর মত মনে ক'রে নিয়ে
আমাদের জানালায় অনেক মানুষ,

চেয়ে আছে দিনমান হেঁয়ালির দিকে।
তাদের মুখের পানে চেয়ে মনে হয়
হয়তো বা সমুদ্রের সুর শোনে তারা,
ভীত মুখশ্রীর সাথে এ রকম অনন্য বিস্ময়

মিশে আছে ;—তাহারা অনেক কাল আমাদের দেশে
ঘুরে ফিরে বেড়িয়েছে শারীরিক জিনিষের মত ;
পুরুষের পরাজয় দেখে গেছে বাস্তব দৈবের সাথে রণে ;
হয়তো বস্তুর বল জিতে গেছে প্রজ্ঞাবশত ;

হয়তো বা দৈবের অজেয় ক্ষমতা—
নিজের ক্ষমতা তার এত বেশী ব'লে
শুনে গেছে ঢের দিন আমাদের সুখের ভণিতা ;
তবুও বক্তৃতা শেষ হয়ে যায় বেশী করতালি সুরু হ'লে।

এরা তাহা জানে সব।
আমাদের অন্ধকারে পরিত্যাক্ত ক্ষেতের ফসল
ঝাড়ে-গোছে অপরূপ হ'য়ে উঠে তবু
বিচিত্র ছবির মায়াবল।

ঢের দূরে নগরীর নাভির ভিতরে আজ ভোরে
যাহারা কিছুই সৃষ্টি করে নাই তাহাদের অবিকার মন
শৃঙ্খলায় জেগে উঠে কাজ করে,—রাত্রে ঘুমায়
পরিচিত স্মৃতির মতন।

সেই থেকে কলরব, কাড়াকাড়ি, অপমৃত্যু, ভ্রাতৃবিরোধ,
অন্ধকার সংস্কার, ব্যাজস্তুতি, ভয়, নিরাশার জন্ম হয়।
সমুদ্রের পরপার থেকে তাই স্মিতচক্ষু নাবিকেরা আসে;
ঈশ্বরের চেয়ে স্পর্শময়
আক্ষেপে প্রস্তুত হয়ে অর্দ্ধনারীশ্বর
তরাইয়ের থেকে লুব্ধ বঙ্গোপসাগরে
সুকুমার ছায়া ফেলে সূর্য্যিমামার
নাবিকের লিবিডোকে উদ্বোধিত করে।

৩

ঘাসের উপর দিয়ে ভেসে যায় সবুজ বাতাস।
অথবা সবুজ বুঝি ঘাস।
অথবা নদীর নাম মনে ক'রে নিতে গেলে চারিদিকে প্রতিভাত হয়ে উঠে নদী
দেখা দেয় বিকেল অবধি;
অসংখ্য সূর্য্যের চোখে তরঙ্গের আনন্দে গড়ায়ে
ডাইনে আর বাঁয়ে
চেয়ে দেখে মানুষের দুঃখ, ক্লান্তি, দীপ্তি, অধঃপতনের সীমা;
উনিশশো বেয়াল্লিশ সালে ঠেকে পুনরায় নতুন গরিমা
পেতে চায় ধোঁয়া, রক্ত, অন্ধ আধারের খাত বেয়ে;
ঘাসের চেয়েও বেশী মেয়ে;
নদীর চেয়েও বেশী উনিশশো তেতাল্লিশ, চুয়াল্লিশ, উৎক্রান্ত পুরুষের হাল;
কামানের উর্দ্ধে রৌদ্রে নীলাকাশে অমল মরাল
ভারতসাগর ছেড়ে উড়ে যায় অন্য এক সমুদ্রের পানে—
মেঘের ফোঁটার মত স্বচ্ছ, গড়ানে;

সুবাতাস কেটে তারা পালকের পাখি তবু;
ওরা এলে সহসা রোদের পথে অনন্ত পারুলে
ইস্পাতের সূচীমুখ ফুটে ওঠে ওদের কাঁধের পরে, নীলিমার তলে;
অবশেষে জাগরূক জনসাধারণ আজ চলে?
রিরংসা অন্যায়, রক্ত, উৎকোচ, কানাঘুষো, ভয়
চেয়েছে ভাবের ঘরে চুরি বিনে জ্ঞান ও প্রণয়?
মহাসাগরের জল কখনো কি সৎবিজ্ঞাতার মত হয়েছিল স্থির—
নিজের জলের ফেণশির
নীড়কে কি চিনেছিল, তনুবাত নীলিমার নিচে?
না হ'লে উচ্ছল সিন্ধু মিছে?
তবুও মিথ্যা নয়: সাগরের বালি পাতালের কালি ঠেলে
সময়সুখ্যাত গুণে অন্ধ হয়ে, পরে আলোকিত হয়ে গেলে।

সাইরেন

প্রতিমা ঠাকুর

নির্মোক খসে পড়ে গেল,
সেই ভাল,—
দেখা দিল নগ্ন রূপ,
চিনে নেব কতদূর কামনার
নীচের সীমায়,
যেতে পার নেমে,
গরিয়সী পাশ্চাত্য সভ্যতা—

কবিতা

কার্তিক, ১৩৪৯

আজিকার ব্যর্থতায়
ভূলুণ্ঠিত উচ্চ মাথা
গৌরবের ইতিহাস তব
লজ্জা লাল ॥
লুব্ধ ক্ষুব্ধ বাসনার তাণ্ডব চীৎকার
মর্ত্যের হৃদয় জোড়া
স্বার্থঘন ছায়া
ধ্বংসের বিকট মূর্তি ধরি
জীবনেরে করিতেছে গ্রাস।
এতকাল যারে ভুলায়ে রাখিয়াছিল
বড় কথা বড় নাম দিয়ে
মানুষের সেই আদিমতা
ভস্ম-চাপা আগুনের
ইন্ধন-ক্ষমতা
অলক্ষ্যে বীর্যেরে করে ক্ষয়।
নিষ্ঠুরের আবির্ভাব
ধূমকেতু
বিমানে বিমানে—
উদ্গারিছে অকস্মাৎ
উল্কানল শিখা,
মৃত্যুর চরম অস্ত্র
করিয়া প্রয়োগ
গর্বিত মানুষ চায়
করিতে খর্বিত
বিশ্বের রহস্যলোক।

ভাগ্যের সে উপহাসে পরিব্যাপ্ত
নিখিল আকাশ
সেথা কিছু ক্ষয় ক্ষতি নাই—
যুগ হতে শুধু যুগান্তের তীরে
জন্মব্যথা আঁধারের
গর্ভকারা ভাঙি
অনন্তে গুমরি ফেরে
প্রলয়রাত্রির পরপার
নবজাতকের বার্তা ঘোষিত করিল আজ
মৃত্যুর সাইরেন।

মন্দাকিনী

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

রূপসী মন্দাকিনী,—
রূপ নিয়ে এসেছিল বাবা মায়ের
কিন্তু ভাগ্য নিয়ে এসেছিল সে আপনার।
মেয়ের দিকে এক নজর চেয়েই
মন্দাকিনীর মা চোখ বুঁজলেন
তিন দিনের দিন আঁতুড় ঘরে।
—আঃ মরণ রাক্ষসী—
মাটি ছুঁতে না ছুঁতে মাকে খেলি ?—
না গো,—বলে' ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌লেন
মন্দাকিনীর দিদিমা।

বাপের বুকে কথাটা বাজ্‌ল তীরের মত,
বল্‌লেন—অমন কথা বলো না মা,
ও যে আমার আঁধার ঘরের আলো
আশীর্বাদ কর—বেঁচে থাকুক।

গুরু পুরুতের আদি নিবাস ব্রহ্মশাসন ;
শাস্ত্রীয় তর্কের এলোমেলো হাওয়ায়
এবং অবিরাম নস্যের ধূলিতে
নস্যাৎ হয়ে যেত সেথা ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান ;
উচ্চানাসা হয়গ্রীব সমাজপতিদের কড়া শাসনে
সন্ত্রস্ত ছিল ব্রহ্মশাসন,
কিন্তু রাঢ়ে বঙ্গে বিধান দিতে
ডাক পড়্‌ত মৃত্যুঞ্জয় স্মৃতিতীর্থের
মন্দাকিনীর বাবার
এ ছিল মন্দাকিনীর গর্ব্ব।

বিয়ের বয়স পেরিয়ে বিয়ে হ'ল মন্দাকিনীর,
কুলিনের ঘরে অমন হয় ;
কিন্তু যে-বয়সে বিয়ের কনেকে সাজন্ত দেখায়
মন্দাকিনীর সে বয়স তখন পেরোয় নি,
এ যেন ভাদ্রের ভরা নদী—
দেখে দেখে আত্তি মেটে না।
রূপ দেখে বিয়ে করলেন অনূপকুমার,
নিজের বল্‌তে রূপ ছিল না তার
কিন্তু নগদ টাকা ছিল তার বাপের প্রচুর।
নববধূর সারা অঙ্গ ঢেকে
একুজিবিসন বস্‌ল তাই জড়োয়া গহনার।

কৌলীন্যের মর্য্যাদা দেবে বর পক্ষ
এমন রেয়াজ তখন ছিল না সমাজে
কিন্তু দফাদস্তুর ফর্দ্দমোতাবেক
প্রাপ্য হ'ল যা' কন্যাপক্ষের
তাকে রীতিমত বাহুল্য বলা চলে।

কন্যা সমর্পণ হ'ল হরিতকী মাত্র পণে,
অনূপের মা বল্‌লেন—চোখ জুড়োল,
আহাহা, মা যেন আমার লক্ষ্মী প্রতিমা
তুলি দিয়ে আঁকা।
মৃত্যুঞ্জয় ভাব্‌লেন—মেয়ে আমার ভাগ্যবতী।
কিন্তু অনূপের কোষ্ঠি বদলের পালাটা
শেষ হয়েছিল এদিকে সংগোপনে
এবং কিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্যের বিনিময়ে ;
জ্যোতি বাচস্পতির অভ্রান্ত বিচারে দাঁড়াল তাই
একেবারে রাজযোটক মিল।
সুন্দরী বলে সম্প্রতি জিতে গেল মন্দাকিনী
কিন্তু হার হ'তে লাগ্‌ল তার ভবিষ্যতের কাছে,
একটার পর একটা,
গাঁটছড়ার বাঁধন খুলতে লাগল উল্টো পাকে।

বিয়ের বছর ঘুরতে ভর সইল না
সিঁদুর পরা ঘুচে গেল মন্দাকিনীর ;
মূর্চ্ছা ভেঙে শাশুড়ী দেখেন
মাথার শিয়রে পুত্রবধূ,

মনের সমস্ত তিক্ততা ঢেলে
ঝাঁঝিয়ে উঠে বল্‌লেন—
তুমি আবার কেন মা ? রক্ষা কর।
সাম্‌নে তুমি আর এসো না আমার।
চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে
উঠে চলে গেল মন্দাকিনী।
হায়রে ! সে আজ স্রোতে-ভাসা ফুল,
ঢেউ দিয়ে ভাসিয়ে দিলে
ফিরে আসে আবার ঘাটের কিনারায় ;
নির্মাল্যের কোনো মূল্য নেই আজ
নিষ্প্রাণ দেবতার কাছে।
পালঙ্কের পায়ায় হেলান দিয়ে ভাবে মন্দাকিনী
আকাশ পাতাল ভাবনা—
চোখের সাম্‌নে ভেসে চলে যায়
একটি বছরের নানারঙের দিনগুলি।

মন্দাকিনীর ম্যালেরিয়া হ'ল,
শ্বশুরবাড়ীতে তাই নিয়ে মহা জটলা।
শাশুড়ির ত মুখের বুলি,
জ্বালায় প্রাণ জ্বলে গেল—।
গরম ভাতে পাখা করতে করতে
স্বামীকে বলেন ইনিয়ে বিনিয়ে,—
যেখানকার আপদ
সেইখানেই দাও বিদেয় করে,
ব্যাটার বউএর সাধ আমার মিটেছে।
কাশী চলে যাব দিদিমণির কাছে,

ও কাল্‌ সাপ পুষবে কে ?
বরকন্দাজের লাঠির জোরে
সাক্ষীর জবান বদ্‌লাতে পার
কিন্তু কোষ্ঠির ফল বদ্‌লাবে টাকার জোরে
এমন কপাল নিয়ে তুমি আসনি।

গয়া কাশী বৃন্দাবন
মথুরা এবং প্রয়াগ তীর্থ সেরে
হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় এলেন শ্বাশুড়ী ;
তীর্থ পর্য্যটনে পুত্রশোক ভুলে বাড়ী ফিরলেন
কিন্তু ভুলতে পারলেন না পুত্রবধূর মন্দ ভাগ্যকে।
এক এক ক'রে গয়নাগাটি খুলে নিয়ে
থান কাপড়ে বিদায় দিলেন মন্দাকিনীকে,
বাড়ীর আট-বেহারার পাল্কীতে নয়
ভাড়া-করা গরুর গাড়ীতে।
জ্বর গায়ে বাপের বাড়ী-এল মন্দাকিনী,
চণ্ডীপাঠ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মৃত্যুঞ্জয়,
এ যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।

মন্দাকিনীকে দেখ্‌লে মনে হয়
সে যেন স্তব্ধ নীলাকাশে স্থিরজ্যোতি নক্ষত্র,
ঔজ্জ্বল্য আছে ষোল আনা
কিন্তু চঞ্চলতা নাই একেবারে।
সে যেন অতি দূরে,—নাগালের বাইরে ;
আকর্ষণ আছে চুম্বকের মত
কিন্তু ব্যবধানের দূরত্ব দেখ্‌লে পা এগোয় না।

এ-হেন মন্দাকিনীর জ্যোতি যে হ'বে ম্লান,
অস্থির নৈরাশ্যে স্থানচ্যুতি হ'বে তার দিগন্তসীমায়,
নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে চেয়ে থাক্‌বে সে অনিমেষে
তুচ্ছ মাটির পৃথিবী থেকে দুর্নিরীক্ষ আকাশের পানে,—
—একথা ভাবতেও কেউ পারেনি,
পারেনি বলেই মৃত্যুঞ্জয় স্মৃতিতীর্থের কন্যাকে
বিধবা মন্দাকিনীকে
সম্ভ্রমের চোখে দেখত না
এমন লোক ব্রহ্মশাসনে ছিল না।

তিন মাস জ্বরে ভুগে ভুগে
মন্দাকিনী বিছানা নিলে কিছুদিনের মত।
নিবারণ কবিরাজের জ্বরান্তক বটিকা
অথবা অব্যর্থ সঞ্জীবন রসে
বশে এল না মন্দাকিনীর অবাধ্য ম্যালেরিয়া;
ডাক পড়ল অগত্যা অসিত ডাক্তারের,
গাঁয়ের ছেলে মেডিকেল কলেজের পাশ করা
যেমন হাতযশ তেমনি পসার,—
অবশ্য গাঁয়ের চেয়ে ভিন গাঁয়ে বেশী।
দেখে শুনে ডাক্তার বল্‌লে—
বিশুদ্ধ ম্যালেরিয়া, তবে যাবে না সহজে,
বহুদিনের বসবাসে মৌরসী করে বসেছে।
তবে সুব্যবস্থাও তার আছে।

ভিজিটের টাকা হাতে দিতে গিয়ে
অপ্রস্তুতই হয়ে গেলেন মৃত্যুঞ্জয়।

পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে
অসিত ডাক্তার বল্‌লে—
মাপ করবেন জ্যাঠামহাশয়
ব্যবসা করি বলে কি মনুষ্যত্বও হারিয়েছি?
মন্দাকিনী আমার বোনের মত,
তাছাড়া শুনেওছি আমি সব;
কর্ত্তব্য একটা আমারও ত আছে।
মন্দাকিনী ভাল হোক
একদিন বরং প্রসাদ পেয়ে যাব আপনার পাতের।

জ্বর ছাড়ল মন্দাকিনীর মাসখানেক পরে,
পথ্যও পেলে,
কিন্তু শরীরের দুর্ব্বলতা আর কাটে না।
অসিত ডাক্তারের টনিক চলে,
আসা-যাওয়াও চলে যখন তখন,
ভিজিট নেয় না, ফুরসৎমত আসে, যায়
সেই ত ভালো।
তা' ছাড়া রমণীরঞ্জনের ছেলে অসিত
ও আমাদের ঘরের ছেলের মত—
মৃত্যুঞ্জয় এই ভেবেই সান্ত্বনা পান।

সংসারের রান্নাবান্না করে মন্দাকিনী,
কিন্তু কান্না আসে তার উনোনের ধারে বসে,
বলে—রাধারাণীর জ্বালায় জলে ম'লাম,
কাঁচা কাঠে এ পিণ্ডি গলে কি করে'!
রাধা বলে—দিদিমণির মুখ খুলচে দিনে-দিনে,

৩

বাক্যিতে মরা মানুষ জ্যান্ত হয়,
আমারও আর সয় না বাপু,
গতর খাটাব, খাব, এত অপমান্যি কেন ?
জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি।
বাড়ী আসুন বাবাঠাকুর আজ
জবাব নিয়ে তবে অন্য কথা।
জাত বোষ্টমের মেয়ে আমি
কারো কথার তক্কা রাখিনে।

মন্দাকিনীর ম্যালেরিয়া ভাল হ'ল,
কিন্তু তার জের চলতে লাগল একটানা।
জর যায় কিন্তু জরের তাত যায় না
মজ্জাগত এমন ব্যাধির চিকিৎসা নেই,
এ-কথা অসিত ডাক্তার স্বীকার করে না।
পড়ন্ত বেলায় মাথা ধরে'
গা হাত পা জলে যায় মন্দাকিনীর,
কিন্তু নাড়ীতে তার জর ওঠে না।
ডাক্তার আসে, প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন লেখে,
রাধাকে ডেকে বলে,—বোষ্টমদি,
হাতের কাজ সেরে
এসো একবারটি ডাক্তারখানায়,
অষুধটা বদ্‌লাতে হ'বে।
রাধারাণী একবার ঘাড় বেঁকিয়ে তাকায়
পিতলের পোড়া হাঁড়িটা উঠোনে ঘস্‌তে ঘস্‌তে
ঠেলে সরিয়ে দেয় তিনহাত দূরে ;—
বলে,—বলিহারি চিকিচ্চে তোমার ভাই,

ধানচাল দিয়ে শেখা নাকি ?
ঘেন্নায় মরি।
মাথার কাপড়টা টেনে দিয়ে
দরজার আড়ালে সরে যায় মন্দাকিনী,—
ডাক্তার ফিরে চাইতেই সে সাম্‌লে নেয়,
কিন্তু মুখ টিপে-টিপে হাসে কিনা
সেটা ঠিক দেখা যায় না।

আসাম

বিমলচন্দ্র ঘোষ

নিরাশ্রিত অন্ধকার মাথা খুঁড়ে মরে
পাহাড়ী নদীর শব্দে বনের মর্ম্মরে
মাংসলুব্ধ পশুর চীৎকারে
আতঙ্ক-গম্ভীর নীলাকাশ
কাঁপায় অদ্ভুত প্রতিধ্বনি।
পথিকের পদচিহ্ন হয়তো পড়েনি কোনোকালে
সে দুর্গম নরকের প্রত্যন্ত প্রদেশে।
সম্মুখে সমাধিমগ্ন আদিম আসাম
শ্বেতাঙ্গের চা বাগান
শ্রমিকের গোরস্থান
সশব্দে আকাশে ওড়ে বোমারু বিমান।
ওরাং খাসিয়া নাগা কুকির স্নায়ুতে
বেপরোয়া উদ্ধত আয়ুতে
উজ্জ্বল রক্তের ধারা তপ্ত বেগবান।

অন্ধকারে
বনের ওপারে
রাহুগ্রস্ত মাতৃভূমি।
শরীর অবশ হয়ে এল। সূর্য্য কাঁপে জয়ন্তী পাহাড়ে,
রুক্ষ ত্বক্ শিলীভূত নালার শরীরে—
নানারঙা ফুল ফোটে
সুঁদরী সেগুন শাল অন্ধকার করে বনপথ
ঝিঁঝিঁ ডাকে একটানা।
ঝরা পাতা মরা পশু অনাদির পুঞ্জিত জঞ্জালে
পাহাড়-চোঁয়ানো জল পচে পচে দুর্গন্ধ ছড়ায়।
কোথাও বৃংহতিনাদ শত শত মত্ত মাতঙ্গের
বলিষ্ঠ বাঘেরা ঘোরে ফেরে।
কোথাও বিষাক্ত সর্প লম্বমান গাছের শাখায়
ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে যায়।

আকাশে প্রদীপ্ত সূর্য্য
ব্রহ্মপুত্র সালুইন চিন্দুইনে কাঁপে স্বর্ণ ছায়া
বালুতটে ধ্যানমৌন বক
আলোয় কল্লোলে মুগ্ধ হরিণশাবক,
কোথাও বা চোখে পড়ে
ঘনশ্যাম বনপথে পাংশু অন্ধকার।
সুদীর্ঘ আকাশপথে চুংকিং-এর নামহারা পাখি
উড়ে যায় উদাসীন!
গিরিবলয়িত দূর দিগন্তে বিলীন।
পশ্চাতে তিমিরমগ্ন মৃত ব্রহ্মদেশ
ধ্বংসের আগুন জ্বলে,

সিঙ্গাপুর
বেদনায় বিবর্ণ সুদূর,
নির্ব্বীর্য্য নিস্তেজ আত্মা সদ্যশৃঙ্খলিত
বর্ণচোরা শৃঙ্খলের পুনরাবর্ত্তনে।

পাহাড়ী উদরাময়ে কালাজ্বরে মরে শত শত
নিরন্ন আশ্রয়প্রার্থী ক্লান্ত অসহায়
নিবে গেছে উৎসাহের শিখা
মরীচিকা জীবন যৌবন
অনাগত অজানিত মহাভবিষ্যের।
মৃত্যুর কম্পন
হৃদ্‌পিণ্ডে জমে গেছে যক্ষার মতন।

ভারতের ভৌগোলিক সীমা
বাঘের আস্তানা
ক্রূর খর্ব্ব হল্‌দে বাঘ সম্প্রতি বোষ্টম
অতিসূক্ষ্ম রোম
মালয় রেঙ্গুন প্রোম
সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধায় হজম।
বেতারে বক্তৃতা দেয় স্বাধীনতা দেবে ব-কলম
অশক্তের দুরারোগ্য ক্ষতের মলম।

আর তো সরে না দেহ মৃত্যু আসে ছায়ার মতন
ক্রমক্রূর নৃশংস ভয়াল।
অতর্কিত সর্পাঘাত
কিম্বা কোনো পাহাড়ের খদে
মুহূর্ত্তে নির্ব্বাণপ্রাপ্তি শ্বাপদের বুভুক্ষা মোচন।

সূর্য্য ডুবে যায়
দৈনন্দিন মরণের অতল গহ্বরে—
রক্তমাখা ইতস্ততঃ পাণ্ডুর আকাশ।

মাতৃস্তন মুখে দিয়ে মরে যায় আদরের ছেলে
একফোঁটা দুধ নেই অনশনক্লিষ্টা জননীর
মরে যায় প্রিয়তম অনাহারে অনিদ্রায়
গভীর স্মৃতির মৌনে—
মরে যায় শত শত মাতা ভগ্নী প্রিয়া
রাজ্যলোভী বর্ব্বরের ঘৃণ্য অত্যাচারে।
সীমান্তের পাহাড়ী নরকে
তস্করের বর্শার ফলকে
দস্যু মগ জেরবাদীর বিষাক্ত ছোরায়।
দুর্গম পথের অন্ধকারে
মরে যায় শত শত উৎপীড়িত মানবসন্তান।

চীন

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

শত্রুপক্ষ হার মানে।
বিধ্বস্ত চীনের মৃতচিহ্নিত শ্মশানে
ভূমিষ্ঠ নতুন শক্তি। জনতার দুরন্ত প্রতাপ—
বিভক্ত প্রবাহ মেলে;
ছত্রভঙ্গ পরাক্রান্ত জাপ।

গ্রামে গ্রামে
নগরে নগরে
গোলায় খামারে আর বাজারে বন্দরে
অরণ্যে পর্বতে জনবাহিনীর তরঙ্গিত ভিড়
—ওঠে আত্মরক্ষার প্রাচীর।
বজ্রের দাপট কণ্ঠে, বাহুতে পৌরুষ—
স্বপ্নে জাগে ছিন্নপত্র সংসারের ছবি,
চোখে জ্বলে বিপর্যস্ত উত্তরপুরুষ।

শৃংখল দুহাতে দেবে,
—এখনো কোমরবন্ধে রয়েছে কার্তুজ।
কঠিন প্রতিজ্ঞা নেয় মাঠের সবুজ।
অতর্কিত গেরিলার উচ্চকণ্ঠ গানে
শত্রুর হৃৎকম্প জাগে; ভগ্নদূত দুঃসংবাদ আনে:
'ফসলের সূচিমুখে দৃপ্ত বাধা; প্রতিবন্ধ চিম্‌নির হাঁ-মুখ।
অরণ্যের ডালে ডালে বর্ধিত চাবুক।'

হিংস্র পশু মাটি চায়—
এশিয়ার হবে দণ্ডধর;
হঠকারী আক্রমণ নিষ্ঠুর থাবায়।
সে লুব্ধ দুরাশা ভাঙে;
চীনের পল্টন আজ দুঃসাহসী খুঁড়েছে কবর।
শরীরে সঙীন ফোটে,
রক্তের ফোয়ারা ছোটে,
আকাশের নিচে ওঠে প্রতিধ্বনি:
'এ দেশ আমার।'

শয়তানের দম্ভ ভাঙে; দিকে দিকে শাসানো তর্জনী।
দুর্জয় প্রাকার।

প্রতিরোধ! জনস্রোতে বিক্ষুব্ধ টাইফুন;
হাত তোলে বজ্রমুঠি,
বুকে খনিগর্ভের আগুন।
ইতিহাস প্রতিশ্রুত; কাঁধে কাঁধ মিলিত জীবনে
ক্রান্তি দিন গোণে।
লুপ্ত আজ গৃহযুদ্ধ, বিভীষণ ব্যর্থ মনে করেছে প্রস্থান।
সাবাস সিয়ান।
চিয়াঙের চোখে আজ অখণ্ড চীনের মৃত্যুপণ।

বিপ্লবের রক্তপথে জানি আসে উজ্জ্বল আগামী;
শয়তান যদিও আনে অনশন, দুঃখের প্লাবন—
হে চীন! তোমার পাশে আমি।

শত্রুপক্ষ হার মানে
বিজয়ী চীনের মৃতচিহ্নিত শ্মশানে।
সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুনের, পথে পথে রক্ত দেয় চীন—
ভূগোলে অবাধ আজ পদক্ষেপ সশস্ত্র মুক্তির;
মৈত্রীর সংকল্প নেয় সুতীক্ষ্ণ সঙীন।
অথর্ব নায়ক হবে গদিচ্যুত—
দ্রুতগতি ইতিহাস,
ক্রমেই কদম তার হয় যে অস্থির॥

আকাশে সন্ধ্যা

অমিতাভ সেন

(সমর সেন-কে)

এখন বাতাস নড়ে কেঁচোর বিবরে;
শূন্যাকাশে খাবি খায় সৈন্যময় বালকের দল—
যেই সব বালকেরা মৃত্যুর মতন বিদ্বান।
বালিহাঁস জড়ো করে রহিয়াছে গভীর উদ্যান॥

—পাখীরা কখন চলে গেছে
লেখাপড়া সব শেষ করে।

আদার জাহাজ তাই লাল;
ব্যাপারীরা দর করে শূন্য ক্ষেতে গিয়ে।
তবুও দয়ার কথা ভোলে নাকো তারা
অদৃশ্য দানের শ্বেত স্রোতে
ভরে তোলে পশু দিনগুলি।

হয়ত যখন কেউ মরে গেছে খ্যাতি ভালোবেসে—
শূন্য, খুনী, ঋণ আর মাতৃস্নেহ দিয়ে
গড়েছে আকাশ এক;
অথবা বাতাস এক—প্রাসাদের মতন বাতাস।
……………………মৃত মাঠে চরে পীত ঘাস॥

ভিত্তি

অমিতাভ সেন

(ধ্যানচাঁদ-কে)

আকাশের কোণগুলো ভেদ করে
অসহ্য আশ্চর্য ঝড়
ক্রমে এসে হল উপস্থিত।
আমি তাই চেখে দেখে—সন্ধ্যার মতন—বটের আঁধারে হয়ে চিত

জানালাম মৌরীর হাঁড়িকে :
"এইসব বাতাসের ধোঁয়া
ঘূর্ণি রচে নিয়ে মেঘ আর যত কাকের ঔরসে
(—মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্য্য যেন—)
শেষে যদি যায় তবু ফেঁসে ?"

নিরুত্তর হয়ে গেল প্রশান্ত প্রতিভা। কর্ণাটক-তীরে
মধুব্রতমদমত্ত পুঞ্জ পুঞ্জ ভ্রমরকে ঘিরে
গুঞ্জরণ স্তব্ধ হয়ে এল। বিশিষ্ট প্রাসাদ
লীন হয়ে গেল পাকিস্থানে। সমুদ্রের শুক্তির শিথরে
নেমে এল ক্লান্ত ছিন্ন আশাহীন মৌন অবসাদ ॥

আশাভঙ্গ

বীণা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভালো লেগেছিল! সেই ভালো ছিল মোর,
ভুল করে ভালোবাসলে কেন!
উদাসী হৃদয় নিথর পাথর ছিল,
প্রেমবন্যায় ভাসলে কেন!

আমিই হারব, এই ছিল মোর পণ,
আগে থেকে হার মানলে তুমি,
নিঃশেষে দিতে নিজেরে বিকিয়ে উৎসুক ছিল মন
ভিখারীর হাত হানলে তুমি!

আশা ছিলো এই—তুমি শিব, আর আমি হব পার্ব্বতী
মদন-ভস্মে হবে মোর পরাজয়,
আমার কঠিন তপস্যা সে যে তোমার পাওনা ছিল,
কেন তা হারালে, সে আশা ভাঙলে কেন!

একটি রাত

বীণা বন্দ্যোপাধ্যায়

চুপ্ চাপ্ গঙ্গার তীর,
ছোট ছোট ঢেউগুলি শুধু অস্থির,
আকাশে আলোর বান, পূর্ণিমা-রাত,
তুমি আমি ব'সে আছি হাতে দিয়ে হাত,
কারো মুখে কথা নেই, শুধু বাড়ে রাত,
এমনিই রাত কেটে যাক্।

ওই দূরে দেখা যায় নদীর ওপার
পরীর ওড়না ওড়ে আবছা ছায়ার,
পাশে তুমি ব'সে আছ, তবু যেন দূর,
এ-রাতের ভাষা নেই, আছে শুধু সুর।
কিছু তার বোঝা যাক্, নাই বোঝা যাক্,
এমনিই যাক কেটে যাক্।

এ-রাত ফুরায়ে যাবে, তুমি যাবে চ'লে,
পূর্ণিমা শেষ হবে পশ্চিমে গ'লে।
একা এসে ব'সে র'ব ঠিক এইখানে,
হৃদয়ে হাওয়ার দোলা স্মৃতির উজানে।
মুখরতা দিয়ে যাবে মৌনেরে ডাক,
'এমনিই রাত কেটে যাক্।'

চন্দ্রকলা

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কবিতা আমার চন্দ্রকলা।
অতীত আকাশ সংক্রমণের
অতিথি চাঁদের পথ-চলা।

ষোল শ' বছর আগে
প্রতীচীর তটে বিরোধী আভাস
সিন্ধুনদের বিকলোচ্ছ্বাস
উত্তরঙ্গ শোণিত-রজনী রাগে।

যুগ পার হ'ল। নিভে গেল সম্বোধি
গুহা-মন্দিরে স্তূপের পাজায়।
মৈত্রীতে ঘুণ; ওধারে সাজায়
বণিকের তরী তরিতে লোহিত-উদধি।

অপাপবিদ্ধ ক্রশের মহিমা
প্যাশন-নাট্য কত!
পাশবের জের চলিয়াছে ঢিমা
সাম্য মরণাহত।

শিখে নাও মন শক্তির ছলা
শেষ হ'ল বুঝি ষোড়শের কলা
গৃহ্য অগ্নি পরিনির্ব্বাণ
ফুরায় শ্রৌত সূত্রের গান।

জানো কি কিসের সর্ব্বনাশ?
চন্দ্রকলার সংবর্ত্তনে
দর্শ অথবা পৌর্ণমাস?

বুর্জোয়া

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বুর্জোয়া, তুমি বুর্জোয়া!
যতো মার্জিত হোক্ না শিক্ষা
শত সযত্ন সমাজ-দীক্ষা
কৃত্রিম সুখ-পরিবেশ পাশে
শুধু ইজ্জত-ভিক্ষা।

এর চেয়ে ভালো ইতরতা !
নোংরা পাঁকের উদ্ধত ফুলে
প্রাণবান দেহে, ঈপ্সিত ভুলে
হিংস্র বনের স্বপ্তির কূলে
আছে কামনার সফলতা।

বেঁচে থাক্ তব সিঁথির সিঁদুর
বিজয়ী হাতের নোয়া !
ভদ্র ভাষার চাপে অনাতুর
জীবন কখনো হবে না বিধুর
মাটির শিরায় বাজলো যে সুর
করবে না বেপরোয়া।

একটি মেয়ের মিলের আশায়
কবিতার মিল—হায় রে হাসায়
তুরুপের খেলা—শুধুই পাশায়,
বুর্জোয়া প্রিয়া বুর্জোয়া !

কলরব

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বৃষ্টির পর বাদামি হাসপাতালে অদ্ভুত রোদ
মন তবু বৃষ্টির কাদায় ক্লান্ত
অনেক আশার পদচিহ্ন
অনেক হতাশার দীর্ঘশ্বাসে এলোমেলো।

কখনো বা সমুদ্র পেরিয়ে চকিতে কানে এসেছে
গেরিলার গান :
—কালো ব্যূহ ভেঙে আনব মুক্তি
অস্ত্র তোলো
খারখন্ডে শোনো কী কল্লোল—
তারপর রাস্তায় উড়ো ছোঁড়া শিষ দিয়ে ওঠে
—ছোড়ি দে রে সইয়া, ছোড়ি দেরে ম্যায়—

আমি শুধু
অসংখ্য মানুষের সারির মধ্যে
চিনির প্রত্যাশী।
দোকানের সামনে দীর্ঘ আপেক্ষা,
আর কানে আসে নানা রকম গান।

প্রেমের জন্ম

সুধীরকুমার চৌধুরী

জানি সে বাসেনি ভাল, ভাল তারে বাস নাই নিজে,
দুজনার মুখে চাহি স্বরে স্বরে কেঁপে ওঠেনি যে
দুটি হৃদয়ের তার। ঘনায়েছে দুর্যোগের রাত,
নীরবে নিকটে এসে হাতটিতে রাখিয়াছ হাত,
প্রাণের পরশখানি পেয়েছ কি পাও নাই কি বা,
পাশাপাশি বাঁধা আছে দুটি তার চির রাত্রি দিবা।

মিলন-অলস দিনে তৃপ্তি পেলে, তৃপ্তি তারে দিলে,
আর কারে চাহ নাই কোনোদিন এ সারা নিখিলে,
জ্বেলে দিলে গন্ধদীপ, গলে দিলে যূথিকার মালা,
সেবায় নিপুণ হাত বুলাইয়া মুছে নিলে জ্বালা
রোগ-শোক-হতাশার। নীরবে সে হাতে দিল তুলি'
জীবনের বেলাভূমে সেরা তার আহরণ-গুলি,
তোমারে আড়াল করি' অকরুণ দুঃখতাপ হতে
আপন শোণিত তার ঢেলে দিল তপ্ত মর্ম্মক্ষতে,
ফিরে ফিরে দিল প্রাণ। মানি তবু আপনার প্রাণে
প্রাণের পরশ তার পাও নাই, রুদ্রনেত্র ধ্যানে
এ-উহারে হের নাই। নাই হের, একাগ্র আগ্রহে
দেবতার ধ্যানদৃষ্টি যে গভীর মৌনতারে বহে
দূর চরিতার্থতায়, পাশাপাশি সেথা পেলে ঠাঁই,
না হয় বাসনি ভাল, সে তোমারে ভালবাসে নাই।

কত জন্মযুগ যাবে, সারা হবে তারে সুর বাঁধা,
এক হয়ে মিলে যাবে দুজনার যত হাসাকাঁদা,
দোঁহারে হারায়ে তার নব জনমের বিস্মৃতিতে
খুঁজিতে সুরের মিলে এ-উহারে আঁখিজলে তিতে।
শুধু শুধু মন ভার, অকারণে বুক দুরুদুরু,
কার তরে তপশ্চর্য্যা না জেনেও হবে তপ সুরু,
হয়ত পাবে না দেখা, দেখা পেলে মিলনের আশা
চিরজন্মে মিটিবে না—জনম লভিবে ভালবাসা।

কাঠখোদাই : শম্ভু সাহা
শিল্পীর ও দেবসাহিত্য কুটিরের সৌজন্যে

সমালোচনা

নূতনা রাধা। অন্নদাশঙ্কর রায়। ডি. এম. লাইব্রেরি। দুই টাকা।

কবিতাসংগ্রহ প্রকাশ করবার সৌভাগ্য বাঙালি কবির প্রায়ই হয় না; প্রৌঢ়ত্বে কিংবা মৃত্যুর পরে প্রকাশিত একটি কাব্য-সঞ্চয়নই তাঁদের জীবনব্যাপী কবিকর্মের নিদর্শন হ'য়ে থাকে। কাব্যসঞ্চয়ন-প্রকাশের প্রথাও আমাদের দেশে অল্পদিনের; দেবেন্দ্রনাথ সেন বা গোবিন্দচন্দ্র দাসের ও-রকম কোনো সঞ্চয়নগ্রন্থ নেই, তাঁদের বইগুলিও সম্পূর্ণ লুপ্ত, ফলে আধুনিক পাঠকের তাঁদের সঙ্গে কোনো পরিচয় হবারই সম্ভাবনা নেই। সত্যেন্দ্র দত্তের কোনো-কোনো বইও অনেকদিন হ'লো বাজারে নেই, কেন তাদের পুনর্মুদ্রণ হচ্ছে না জানি না। দোকানের শেল্‌ফ্‌ থেকে বসুমতী, বসুমতী থেকে ফুটপাথ, এবং ফুটপাথ থেকে অবলুপ্তি—এই তো বাঙালি লেখকের সাধারণ ভাগ্য, তার উপর কবিভাগ্য বিশেষরূপে শোচনীয়, কারণ কাব্য-গ্রন্থের প্রকাশ ব্যবসার দিক থেকে লোভনীয় নয়। আমাদের বিস্মৃত ও বিস্মৃতপ্রায় কবিদের সম্পূর্ণ কাব্যসংগ্রহ প্রকাশ করবার সৎবুদ্ধি কি কোনো-দিন কোনো প্রকাশকের হবে না?

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় ভবিষ্যতের কিংবা অদৃষ্টের উপর ভরসা রাখেননি, তিনি প্রাক্-চল্লিশেই নিজের কাব্যসংগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আধুনিক কবিদের মধ্যে এ-ধরনের উদ্যম তাঁরই প্রথম। অবশ্য সম্পূর্ণ কাব্যসংগ্রহ হ'লেও বইটির আকার বেশি বড়ো নয়, মাত্র ১৬৮ পৃষ্ঠা। 'কাগজের দাম বুঝে অনেক কবিতা' তিনি গ্রহণ করেননি, সম্প্রতি প্রকাশিত 'উড়কি ধানের মুড়কি'ও 'পরবর্তী কালের' ব'লে এ-বই থেকে বাদ গেছে। তাহ'লেও এটা বোঝা যায় যে তাঁর কবিতার পরিমাণ খুব বেশি নয়। কবিতাগুলি বারো বছর ধ'রে লেখা, এবং 'নূতনা রাধা' তাঁর কবিজীবনের প্রথম পর্যায়ের অভিজ্ঞান।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে গদ্যলেখক হিসেবে অন্নদাশঙ্করের স্থান প্রথম শ্রেণীতে। একটি স্বচ্ছ উজ্জ্বল মনোহর গদ্যরীতির তিনি অধিকারী। তাঁর গদ্যরচনায় সেই জাদু আছে যার প্রভাবে বক্তব্য বিষয়ে আমূল মতবিরোধ হ'লেও শিল্পকর্ম হিসেবে সেটি উপভোগ করতে বাধে না। এমন খুব কম গদ্যরচনাই তাঁর কলম দিয়ে বেরিয়েছে যা উপভোগ্য নয়।

প্রথম জীবনে তিনি গদ্য-পদ্য সমানে লিখছিলেন, পরে গদ্যের দিকেই বিশেষ ক'রে ঝুঁকেছেন। সেইজন্যেই তাঁর কবিতার পরিমাণস্বল্পতা। 'নূতনা রাধা' প'ড়ে এ-কথাই মনে হয় যে তাঁর কবিত্বশক্তি গদ্য-সতীনের প্রসারের চাপে তাঁর জীবনগৃহের একটুখানি জায়গা মাত্র জুড়ে আছে, তার মূর্তিটি কুণ্ঠিতা অবগুণ্ঠিতা নববধূর, দীপ্তিময়ী ঐশ্বর্যশালিনী জীবনসঙ্গিনীর নয়।

'প্রথম স্বাক্ষর' ও 'রাখী' 'নূতনা রাধা'র প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ। এই কবিতাগুলি ভাববিলাসী নবযৌবনের সহজ আবেগ থেকে উৎসারিত, বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে প্রথম অপূর্ব সচেতনতার আনন্দে কবি এ-জীবনকে পরিপূর্ণ ক'রে উপভোগ করবেন, এই কথাটি নানা ছন্দে, নানা ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কথাটি নতুন নয়, প্রায় সকল তরুণ কবিরই এই কথা, কিন্তু এই ভাবটি প্রায় একই সময়ে লেখা 'পথে-প্রবাসে' গ্রন্থে অন্নদাশঙ্কর যেমন সুন্দর ক'রে প্রকাশ করেছিলেন, কবিতায় ঠিক সে-রকম হয়নি। রচনায় কাঁচা হাতের ছাপ স্পষ্ট, তাছাড়া প্রায় আগাগোড়াই রবীন্দ্র-ছায়াচ্ছন্ন। এরই মধ্যে 'রাখী'র উৎসর্গের চারটি লাইনে কবির বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে, এই ক্ষুদ্র স্তবক প'ড়েই বোঝা যায় যে যদিও এখনো তাঁর বাণী কুণ্ঠিত, এই কবি যথার্থ শক্তিশালী।

আমরা দু'জনা দুই কাননের পাখী
একটি রজনী একটি শাখার শাখী
তোমায় আমায় মিল নাই মিল নাই
তাই বাঁধিলাম রাখী।

তৃতীয় গ্রন্থ 'একটি বসন্ত' থেকে পরিণতির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। প্রথম যৌবনের অস্পষ্ট আবেগ-নীহারিকার ফাঁকে-ফাঁকে দেখা দিয়েছে সুগঠিত জ্যোতিষ্কদল। এখান থেকে শেষ পর্যন্ত 'নূতনা রাধা'য় প্রেমের ও প্রকৃতির অনুভূতি বিচিত্র ভঙ্গিতে লীলায়িত। এই পাতাগুলির মধ্যে কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রেমের কবিতা পাওয়া যাবে। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—'পূর্ণিমা'।

আমার প্রিয়া আছে আমার ঘরে
আমার মন আছে ভালো।
আকাশ হ'তে খালি কুসুম ঝরে
মাটির ফুলদানি ফাটিয়া পড়ে
ধরায় ধরে না যে আলো।

আমার পূর্ণিমা আমার পাশে
হৃদয়ে কোনো খেদ নাই।

আমার জামাখান বুনিছে তা সে
কদাচ মুখ তুলে মুচুকি হাসে
আকাশে পূর্ণিমা তাই।

'জামাখান' ও 'তা সে' এ দুটি কথা দাঁতে কাঁকরের মতো হ'লেও কবিতাটি যে ভালো তাতে সন্দেহ নাই।

আমার নিজের সবচেয়ে ভালো লাগলো 'জার্নাল' অংশ। এই ছোটো-ছোটো টুকরো কবিতাগুলোয় কবির প্রেম ও প্রকৃতিসম্ভোগ যেন উপচে পড়ছে—অথচ আতিশয্য কোথাও নেই, সবটুকুই স্নিগ্ধ ও কমনীয়।

জীবন কী বিমোহন রে জ্যোৎস্নাবিকীরিত রাত্রে
সমীর শীকর যায় বরষি' তরণী দুলিছে জলগাত্রে।
ভুবনে তাহার কিবা ভাবনা প্রণয়প্রতিমা যার অঙ্কে
কণ্ঠে যাহার সুরমদিরা তাহারে কাঁপাবে কী আতঙ্কে!

মনের এই কথাটুকু—শুধু নিজের নয়, পাঁচজনের মনের মতো ক'রে বলতে পারা যে শক্তিসাপেক্ষ, শুধু তাই নয়, ভাগ্যের বিশেষ অনুকম্পা হ'লেই যে তা বলা যায় এ-কথা আর কেউ না জানুক আমরা কবিরা জানি। এ-সব জিনিস ভারি ওজনের নয় ব'লে সাধারণ পাঠক অবজ্ঞা করতে পারেন কিন্তু কবিদের কাছে এর চিরকালের আদর।

আর-একটি উদাহরণ দিচ্ছি, এটি প্রকৃতিবর্ণনার:

গুরু মন্থর মেঘের সঙ্গে লঘু চঞ্চল মেঘের
নভ প্রাঙ্গণে বায়ুরথে আজ প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেগের।
ঘর্ষণে ওঠে ঘর্ঘর রব তাহারি সঙ্গে মেশা
রথ তুরঙ্গ ধাবন রভসে সঘনে ছাড়ে যে হ্রেষা।
খুরেতে চাকায় চকমকি ঠোকে ফুল্‌কি ছোটায় ছড়ায়
ব্যোম মার্গের দীপ্তি সে আসি' দিক্ বলে দেয় ধরায়।

এ-রকম নিটোল উজ্জ্বল রত্নকণিকা 'জার্নালে' আরো আছে।

অন্নদাশঙ্কর তাঁর 'ক্রীডো' কবিতায় বলেছেন—'মনের কথা মনের মতো ক'রে কইবো আমার মনের মতনকে, কবি হবার নেই দুরাশা ওরে সার মেনেছি সত্যকথনকে।' 'নূতনা রাধা' তাঁর এই ক্রীডকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করছে। 'Ambitious' বলা যেতে পারে এমন একটি কবিতাও এতে পাওয়া যাবে না, তাঁর সাহিত্যিক উচ্চাভিলাষের ক্ষেত্র গদ্য, পদ্য তাঁর শখ। অথচ 'নূতনা রাধা' নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছে যে অন্নদাশঙ্কর একজন সত্যিকার কবি। উইলিয়ম মরিসের মতো ইনি একজন happy poet, এবং সকলেই

জানেন যে সুখী কবি বিরল। কবি হ'য়েও ইনি কোনো দুঃখের গান করেননি, না ব্যক্তিগত না বিশ্বমানবিক দুঃখের। দুঃখের গানই আমাদের মধুরতম গান কিনা জানি না, কিন্তু এই কবিতাগুলি যে মধুর তা মানতেই হয়। অন্নদাশঙ্করের বিশেষত্ব তাঁর ভাষার লাবণ্য, তাঁর ভঙ্গির কমনীয়তা, তাঁর আনন্দিত কৌতুকোজ্জ্বল বিশ্ব-দৃষ্টি। শুধু প্রিয়ার নয়, সমস্ত পৃথিবীর প্রেমেই তিনি পাগল, আপন সুখ-নীড় ও বিশ্বপ্রকৃতির অফুরন্ত ঐশ্বর্য নিয়ে তিনি এত সুখী যে সেই সুখ কবিতায় প্রকাশ না-ক'রে তাঁর মন শান্ত হ'তে পারে না। তাঁর রচনায় wit-এর দ্যুতি থেকে-থেকে ঝলক দিচ্ছে, কখনো বা conceit-এর চমক লাগে, প্রায়ই তিনি সতেরো শতকের রাজভক্ত ইংরেজ কবিদের কথা মনে করিয়ে দেন, এ-বিষয়ে বিষ্ণু দে-র প্রথম পর্যায়ের সঙ্গে তাঁর মিল আছে। যথার্থ light verse আধুনিক বাংলায় যাঁরা লিখতে পেরেছেন তাঁরা হলেন অন্নদাশঙ্কর, বিষ্ণু দে ও অজিত দত্ত—কেউ-কেউ হয়তো অমিয় চক্রবর্তীর কোনো-কোনো রচনাও এই শ্রেণীতে ফেলতে চাইবেন। আমাদের মনে রাখা দরকার যে light verse light হ'লেও slight নয়, এবং কবিত্বের সঙ্গে wit-এর বিবাহ ঘটাতে খুব পাকা পুরোহিত প্রয়োজন। এই পৌরোহিত্যের সকল গুণই অন্নদাশঙ্করের আছে, এই কারণে বাংলা কাব্যে তাঁর বিশিষ্ট স্থান। আমাদের আক্ষেপ শুধু এই যে তিনি আরো বেশি লেখেন না। তাঁর 'উড়কি ধানের মুড়কি' প্রায় সকল শ্রেণীর পাঠককেই আনন্দ দিয়েছে, হালকা কবিতার ক্ষেত্র তিনি যেন আরো নিবিড়ভাবে কর্ষণ করেন এই আমাদের অনুরোধ। তাঁর কবিত্ব-বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রতীক্ষা আমরা সাগ্রহে করবো।

বুদ্ধদেব বসু

বসুন্ধরা। চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়। কবিতা-ভবন। দাম বারো আনা।

চঞ্চলকুমারের লেখায় সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দের প্রভাব প্রত্যক্ষ। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে চঞ্চলকুমার আত্মম্ভরিতায় আস্থা রাখেন না। তিনি এঁদের প্রভাব স্বচ্ছন্দে মেনে নিয়েছেন, এবং নিজ কাব্যে স্বকীয়তা এনেছেন। ফলে তাঁর লেখায় সংহতি সর্বত্র বর্তমান, অস্পষ্ট ভাবালুতা ও নবীন লেখকদের ভারসাম্যের অভাব থেকে তিনি বিস্ময়করভাবে মুক্ত। কয়েকটি কবিতায় অবশ্য সুধীন্দ্রনাথের রচনার এবং বিষ্ণু দের সনেটগুলির কথা একটু বেশী মনে

পড়ে, যেমন "শীর্ণ পত্র ঝরে গেল" (পৃঃ ১৪)—এর সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের বর্ষপঞ্জকের প্রথম দিকের মিল সহজেই মনে পড়ে।

আধুনিক সমাজের বিকলন ও ব্যর্থতা উল্লেখযোগ্য কবিমাত্রেই প্রকাশ করেছেন। এ বিকলনের অর্থনীতিক ও সামাজিক কারণ অধিকাংশ বিজ্ঞেরই বুদ্ধিগোচর, সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এটা বাংলা কবিতার জীবনীশক্তির প্রমাণ যে সাম্প্রতিক অনেক কবিই সক্রিয়ভাবে ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করেছেন এবং বৃহত্তর জীবনের আভাস দিতে প্রয়াস করেছেন। অনেকদিন কবিরা মধ্যবিত্তের অন্ধ খোঁয়াড়ে ছিলেন, সেখানে আত্মরতিতে, উন্নাসিক বিদ্রূপে ও পলায়নী মনোবৃত্তির পরাজিত দৃষ্টিতে তাঁদের দিন কাটত। সম্প্রতি যে নতুন সুর বাংলা কবিতায় দেখা দিয়েছে তা আশাজনক। চঞ্চলকুমারের লেখায় খোঁয়াড়ী মনোবৃত্তি ও তার থেকে মুক্তির প্রয়াস, দুইই আছে। এ প্রসঙ্গে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বর্ষশেষ'-এর কথা মনে রাখলে সুবিধে হবে। 'বর্ষশেষে', মোটের ওপর, চঞ্চলের সামাজিক বিকলনের কারণানুসন্ধান বহির্মুখী ছিল, কিন্তু 'বসুন্ধরা'য় তিনি বোধ হয় তুলনায় অনেক বেশী অন্তর্মুখী হয়েছেন। যে মড়কের বীজ নানারূপে বিশ্বব্যাপী তার সংক্রামক উপস্থিতি তিনি নিজ সত্তায় অস্পষ্ট পাপবোধে ও বিচলিত অস্বস্তিতে আবিষ্কার করেছেন। যথা :

প্রাক্তন পাপের ভারে আজো বুঝি হবে পরাজয়;
ভ্রান্তিশেষে চেতনাও যাত্রাপথে নিতান্ত অক্ষম।
অনির্দ্দিষ্ট পদচিহ্ন সম্মুখেতে এনেছে সংশয়।
সুমেরুর দূরে দেখি অনুদ্দেশ্য মৃত্যুর আগম।

(পলাতক)

মনে হয় সময়ের অন্তিম প্রয়াণে
মননের অভিযানে শবযাত্রী কোনো।

(সনেট, ১৫ পৃঃ)

এবং "পাপী" কবিতার চার লাইন।

প্রথম অংশে 'পলাতক', সনেটগুলি এবং কয়েক লাইনের ছোট কবিতাগুলি সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় অংশে কয়েকটি "গ্রীক" কবিতা আছে। 'বসুন্ধরা'য় চঞ্চলের দৃষ্টিকোণ অন্তর্মুখী, খোঁয়াড় থেকে মুক্তির জন্য গ্রীক নাটকের কয়েকটি কাহিনীর বহিরাশ্রয় অবলম্বন তিনি করেছেন। 'বর্ষশেষে' এ ধরনের কাহিনীর বহিরাশ্রয় নেই, কারণ সেখানে সমাজের বাইরের রূপ নিয়ে তিনি

ব্যস্ত ছিলেন। 'বসুন্ধরা'য় হয়ত তিনি আবিষ্কার করেছেন যে সমাজের গ্লানির বর্ণনা করে অবক্ষয় থেকে নিস্তার নেই, কবির কাছে নানাকারণে অবক্ষয়ের নিকটতম উৎস নিজের মন। মনের বিকার কাটিয়ে স্বাবলম্বী সাহস তিনি অর্জন করতে চেষ্টা করেছেন ওডিসিয়ুসের প্রতিকূল প্রতিবেশের বিরুদ্ধে অভিযান ও সাফল্যের ইতিহাসের সাহায্যে।

বারে বারে ঠেকে গিয়ে এসেছে নির্ভয়,
একনিষ্ঠ স্বধর্মে প্রত্যয়।

কাসাণ্ড্রা পরাজিতা ও বন্দিনী, কিন্তু পরাজিতার ভবিষ্যদ্‌বাণীতে কবি আশ্বাস পেয়েছেন। বিজেতার পরাক্রম স্বদেশে বাহত হবে, যে বীজ রোপণ রক্তে বাকী তার আছে পরিচয়। যে সংহারক মূর্তি সামাজিক অবক্ষয়ের চরম প্রকাশ তারো ভবিষ্যৎ সঙ্কীর্ণ, কালের প্রতিশোধে সে মূর্তিও অবিলম্বে চূর্ণ হবে।

এর পর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবিতা "বসুন্ধরা"। আমাদের জীবনে মধ্যবিত্ত অক্ষমতা ও ব্যর্থতার থেকে মুক্তির উপায় জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ। সে-যোগাযোগ এতদিন একেবারে ছিল না, তাই আমাদের মানসলোকে নানা ধরনের ছেলেখেলা চলত। আজ কালান্তক যুদ্ধের পটভূমিকায় বোঝা যায় যে এ যোগাযোগ না থাকলে আমাদের যাত্রা ব্যর্থ হতে বাধ্য। এই নতুন উপলব্ধিতে আমাদের আগেকার পণ্ডশ্রম প্রয়াসের রূপ বদলেছে।

"বসুন্ধরা" সম্বন্ধে একটি আপত্তি ওঠে। শেষের দিকে চঞ্চলকুমার যে পথের ইঙ্গিত করেছেন তা রাজনীতিক বাকবিতণ্ডার পর্য্যায়ে পড়ে। শেষের এপিগ্রামগুলির কয়েকটি কবিতা হিসেবে চতুর এবং সার্থক, কিন্তু তাদের মূলমন্ত্র :

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে কর গৃহবিবাদের গান।
শ্রেণী সংগ্রামে লিপ্ত থাকুক যুদ্ধনিরত দেশ।

যাঁরা ১৯৪১-এ পরিবর্তিত পরিস্থিতির জন্য "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে জনযুদ্ধে পরিণত কর"—এই আওয়াজ তুলছেন তাঁদের রসবোধ রাজনীতিক কারণে ব্যাহত হলে অস্বাভাবিক হবে না।

সমর সেন

একচক্ষু, মণীন্দ্র রায়। কবিতা ভবন, এক টাকা।

আজকালকার তরুণ কবিদের মধ্যে কবিত্ববর্জনের প্রতিযোগিতা চলেছে। তাঁদের ভাষা কর্কশ, ছন্দ রুক্ষ, তাঁদের বলবার বিষয় দৈনিকপত্রে প্রকাশিত সংবাদ, তাঁদের অন্তরে এক বিশীর্ণ শুষ্কতা। তাঁরা সযত্নে লালিত্য এড়িয়ে চলেন, ভুল ক'রেও একটি সুশ্রাব্য পংক্তি লেখেন না—কিছুতেই 'রোম্যান্টিক' হবেন না এই তাঁদের পণ। অথচ যে-কারণে রোম্যান্টিসিজ্‌ম্ আজ অপরাধী, যথা, ভাষা ব্যবহারে শৈথিল্য, শব্দপ্রয়োগে সচেতনতার অভাব, ভাবাবেগ আর ভাবালুতার পার্থক্য সম্বন্ধে অন্ধতা—ঠিক সেই সব অপরাধ এই রোম্যান্টিক-বিরোধী কবিদের রচনায় সর্বদাই দেখতে পাওয়া যায়, তফাৎ শুধু এই যে তথাকথিত রোম্যান্টিকদের উচ্ছ্বাসের বিষয় ফুল, পাখি, চাঁদ, ইত্যাদি আর তথাকথিত প্রগতিশীলদের উচ্ছ্বাসের বিষয় বোমা, বেঅনেট, সাইরেন ইত্যাদি। ফুল-পাখির চাইতে বোমা-বেঅনেট কবিতার বিষয় হিসেবে অনেক বেশি অপ-টু-ডেট, এ ছাড়া এ-প্রভেদ সম্বন্ধে আর-কিছু বলবার নেই।

অপ-টু-ডেট হওয়া দোষের নয়, সেটা ভালোই। কিন্তু কবি হ'তে হ'লে সেই সঙ্গে আরো কিছু চাই, এমনকি অপ্-টু-ডেট না-হ'য়েও কবি হওয়া সম্ভব। আজকালকার নবীন কবিদের অনেকের লেখা প'ড়েই মনে হয় যে তাঁদের বক্তব্য গদ্যে লিখলেই ভালো হ'তো, এমনকি সংবাদপত্রের প্যারাগ্রাফ হ'লেও বেমানান হ'তো না। কবিতাপদবাচ্য পংক্তি যে তাঁরা সাধারণত লেখেন না, সেটা হয়তো তাঁদের ইচ্ছাকৃত নয়, তাঁদের ক্ষমতার অভাবই তার কারণ। তাই যদি হয় তাহ'লে তাঁদের রচনা-গুলিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করলে দোষ হয় না, বরং সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

কিন্তু এঁদের মধ্যে কয়েকজন আছেন যাঁরা কবিত্বশক্তির অধিকারী, এবং জেদ ক'রে কবিত্ববর্জন করতে গিয়ে তাঁরা আপন স্বভাবের বৈপরীত্যই করছেন। বলা বাহুল্য, তার ফল ভালো হবার নয়। আমি বিশ্বাস করি কবিত্ব ছাড়া কবিতা হয় না—ইংরেজরা তো ও-দুই বস্তু একই কথা দ্বারা প্রকাশ করে। কবিত্ব কী জিনিস তার কোনো সংজ্ঞা দেয়া চলে না, সেটা অন্তরে অনুভব করবার। কবিত্বপ্রকাশের উপায়—অর্থাৎ রচনার টেকনীক—নানাবিধ হ'তে পারে, কিন্তু প্রদীপের গড়ন যেমনই হোক, আলো সমানই উজ্জ্বল। আর আলোই যদি না জ্বললো, তাহ'লে তাকে প্রদীপ বলবো কেমন ক'রে?

আলোচ্য গ্রন্থের লেখককে আমি কবিত্বশক্তির অধিকারী ব'লে মনে করি, সেই জন্যেই এই ভূমিকা। "একচক্ষু" মণীন্দ্র রায়ের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। কবিত্ববর্জনের চেষ্টা এর সর্বত্র। "একচক্ষু" নামটি কানে কি প্রাণে আনন্দ আনে না, বইয়ের মলাটটিও এমন যে তা দেখে মলাটের ঢাকনা তুলে ভিতরে উঁকি দেবার ইচ্ছা না-হওয়াই স্বাভাবিক। অবশ্য বইয়ের নামের ব্যাখ্যা কবি ঐ নামেরই কবিতায় করেছেন। ঈশপের গল্পের একচক্ষু হরিণের সঙ্গে আধুনিক বুর্জোআ সমাজের এবং তারই প্রতিনিধি হিসেবে নিজের তুলনা তিনি করেছেন :

ভগ্নজানু এ কালের উজ্জীবন-সম্ভাবনা হীন
নির্বাত বুদ্ধির শূন্যে একচক্ষু পলায়নে মরি মূর্খ বিভ্রান্ত হরিণ।

'একচক্ষু'র বেশির ভাগ কবিতায় এই সুরই বেজেছে। সব শূন্য, সব বন্ধ্যা, কবি 'ভ্রান্তির বিমূঢ় শূন্যে' ঘুরে বেড়াচ্ছেন, চারদিকে, 'ক্লিন্ন পরাজয়ের প্রেতনৃত্য'—এই সব আরকি। কবিতাগুলো ভালো, পয়ারের ব্যবহার ভালো, কিন্তু এ-কথা আর কতবার শুনবো? এই গ্লানি, ব্যর্থতাবোধ, হতাশা—এও একরকমের romantic agony ছাড়া আর কী? যৌবনসুলভ দুঃখবিলাস যথার্থ রোম্যান্টিকভাবে প্রকাশ করতে পারলে সে-কাব্যের মদির আস্বাদ যুগে-যুগে অক্ষুণ্ণ থাকে, কিন্তু মণীন্দ্র রায় শেলির ভক্ত হ'য়েও শেলির শিষ্যত্ব স্বীকার করেননি, তিনি যথাসম্ভব শুষ্ক শীর্ণ ভাষায় তাঁর হৃদয়ের বেদনা প্রকাশ করেছেন। ফলে কবিতাগুলো ভালো লাগে কিন্তু নেশা ধরায় না।

মণীন্দ্র রায় সম্বন্ধে আমার মনে উচ্চাশা আছে ব'লেই এই অপ্রিয় কথা ক'টি বলতে হ'লো, নয় তো 'বেশ ভালো' ব'লে সংক্ষেপে সমালোচনা সেরে দিতে পারতুম। এই গ্রন্থের অনেক কবিতাতেই তিনি দস্তুরমতো সফল হয়েছেন, প্রথম স্বদেশ-বন্দনার কবিতাটি তো রীতিমতো ভালো। ছন্দে মিলে তাঁর দক্ষতার প্রমাণ 'নব চতুর্দশপদী' নামে পাঁচটি সনেট; এই ক'টি সনেট আমার এত ভালো লেগেছে যে বার-বার পড়েছি, মনে-মনে মিলের চাতুর্যকে বাহবা না-দিয়ে পারিনি। এই সনেট ক'টিতে শুধু অভিনবত্ব নয়, যথার্থ শক্তির পরিচয় আছে, সকলকে প'ড়ে দেখতে অনুরোধ করি। তিনমাত্রা আর পয়ার মিশিয়ে লেখা 'রাত্রি ও রেবা' কবিতাটিও বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য, কবির পূর্ববর্তী গ্রন্থ 'ত্রিশঙ্কু-মদনে'ও এই ধরনের একটি মিশ্রিত ছন্দের কবিতা আমাকে চমক লাগিয়েছিলো। 'রাত্রি ও রেবা'য় কলাকৌশল অনিন্দ্য, তাছাড়া সরাসরি প্রেমের কবিতা ব'লে এতে একটা সহজ ভঙ্গি আছে যা অন্য কবিতায় প্রায়ই

নেই। এই কবিতাটির প্রথম স্তবকটি আমার মতে এই গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে ভালো রচনা—

হে প্রিয় রাত্রি, প্রেমনিলয়,
হ'লো কি সাঙ্গ পৃথিবী জয়।
স্নায়ুতে তোমারই সুরভি বয়,
যাচে তোমারেই মর হৃদয়,—
হে প্রিয় রাত্রি, প্রেমনিলয়।

'অদীক্ষিত শ্রমজীবীর প্রার্থনা'য় একটি স্তবক নিখুঁত হ'তে-হ'তে হ'লো না—

গোলা ভরা ধান, পুকুরে মাছ,
জোলার কাপড়,—হাল বলদ,
সারাদিন করি খামারে কাজ,
কারো মনে নেই কোনো গলদ।
কী মহাসুখের সেই সমাজ
হবে বল!—যেন পাথারে গাছ।

এর চালটা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের, কিন্তু সুভাষ কখনো 'পাথারে গাছ' লিখতেন না। এই একটি খুঁতে ভালো একটি স্তবক নষ্ট হ'য়ে গেলো।

'একচক্ষু' নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছে যে তার লেখক কবি। এই কবির ভবিষ্যৎ পরিণতির দিকে আমরা সাগ্রহে তাকিয়ে থাকবো। যেদিন তিনি অত্যন্ত আত্মসচেতনতা থেকে মুক্ত হবেন, প্রচলিত কোনো থিওরির সঙ্গে মিলিয়ে-মিলিয়ে কাব্য-রচনার চেষ্টা না-ক'রে নিজের অন্তরের নির্দেশকেই চরম ব'লে গ্রহণ করবেন সেদিন বাংলার কবিসভায় তাঁর আসন আপনা থেকেই পাতা হবে, আমি আজ তাঁকে অগ্রিম অভ্যর্থনা জানিয়ে রাখছি।

বুদ্ধদেব বসু

চিত্রভানু—সুধীরচন্দ্র কর। মূল্য চার আনা।

ওপারেতে কালো রং—সুধীরচন্দ্র কর। 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালা। কবিতা ভবন, চার আনা।

বাইশে শ্রাবণ আবার ঘুরে এল। অকাল-সংক্রান্তি শেষে কিন্তু মনে হয় কবিগুরু এখনো জীবিত রয়েছেন। ক্ষতিটা এতোই অপরিমেয় যে অবিশ্বাস্য। তবু যখন সত্যিই তিনি আজ প্রত্যক্ষ দৃষ্টির বাইরে, তখন তাঁর গান, ছবি,

গল্প, কবিতাই আমাদের অবলম্বন। যাঁরা তাঁকে নিকটে পাবার সৌভাগ্য লাভ করেন নি, তাঁদের সান্ত্বনা কবির রচনাবলী। আর যাঁরা ছিলেন পার্শ্বচর, তাঁদের কাছে সান্নিধ্য-সুরভিত স্মৃতি অনতিক্রান্ত বিচ্ছেদে করুণ। আকাশে-বাতাসে ছড়ানো পরম ব্যক্তিত্বের অজস্র দান মনকে উতলা ক'রে তোলে। সুধীরবাবুর 'চিত্রভানু'তে এই অন্তরঙ্গ, অদর্শনবিধুর সুরটি সুন্দর ফুটে উঠেছে। নানাভাবে দেখা কবির মূর্ত্তি, মনে-প্রাণে অনুভব করা তাঁর সত্তা ও মহামানবতা অতি সরল ছন্দে, প্রাঞ্জল ভাষায় চিত্রিত হয়েছে। এগারোটি কবিতাই সমস্তরের রচনা নয়। তবে তারি মধ্যে তিন আর পাঁচ নম্বরের কবিতা দুটি শূন্যতাবোধ সত্ত্বেও একটি গভীর প্রশান্তির তৃপ্তি এনে দেয়।

"ওপারেতে কালো রং" বইখানিতে সব চেয়ে চিত্তাকর্ষক লাগ্‌ল ছন্দের বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল কবিতাগুলির লঘু ও অনায়াস গতি। কয়েকটি ছবি সুন্দর। বর্ষার কবিতা ধরতে গেলে সবই কিন্তু তার মধ্যে গুটি কয়েক ব্যক্তিগত প্রেমের কবিতা আছে। আমার বেশ ভালো লাগ্‌ল প্রথম ছড়াটি আর তৃতীয় এবং চতুর্থ কবিতা দুটি যেখানে কবির রোমান্টিক মন তার সার্থক প্রকাশ খুঁজেছে। ছোট্ট চার লাইনের সর্ব্বশেষ কবিতাটিও বেশ পরিচ্ছন্ন, কিন্তু কৈফিয়ৎ কেন? কবিতা রচনা অথবা রোমান্টিক কাব্য-আলাপন কি এতো বড়ই দুষ্কৃতি?

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

অন্তঃশীলা—রসময় দাশ। হবিগঞ্জ থেকে কুমুদরঞ্জন দাশ বি.এল. কর্তৃক প্রকাশিত। ১৷০

এমন অনেক দেখা যায় যে একজন মানুষের নাক মুখ চোখ রং সমস্তই সৌন্দর্য্যের আদর্শে প্রথম শ্রেণীর তথাপি সে মানুষ সুন্দর নয় অথচ আরেক-জন, আলাদা আলাদা করে দেখতে গেলে যার কিছুই দেখবার যোগ্য নয় তাকে দেখামাত্রই আমাদের চোখ যেন আপনা থেকেই আপ্যায়িত হয়ে ওঠে। মুহূর্ত্তকাল আমরা সেখান থেকে চোখ ফেরাতে পারি না। সেটা কি? মানুষের বেলায় আমরা তার আখ্যা দিই লাবণ্য বলে। শিল্পকলাতেও দেখা যায় ঠিক এই লাবণ্যের অভাবেই অনেক ওস্তাদ কারিগরও ব্যর্থকাম হন—খুঁত ধরতে না পারা সত্ত্বেও তাঁর শিল্প নিখুঁত হয় না। কেননা যাঁরা শিল্পকলার অনুরাগী তাঁরা এসব থেকে এমন একটা অপার্থিব আনন্দের স্বাদ খোঁজেন যে যতক্ষণ সেটা না পান ততক্ষণ তাঁরা তৃপ্ত হতে পারেন না।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রসময় দাশের কবিতার বইখানা পড়ে আনন্দ হল। এঁর কাব্য যে লাবণ্যের অধিকারী সেটা হয়তো কোনো পাঠকই অস্বীকার করবেন

না এবং সেদিক থেকে ইনি নিশ্চয়ই সার্থক কবি। একজন সঙ্গীতজ্ঞ যখন গান গেয়ে আমাদের মুগ্ধ করেন তখন যেমন আমরা তার টেকনিক নিয়ে বিচার করি না, কি রাগিণী গাইলেন তা নিয়ে মাথা ঘামাই না তেমনি যে কবিতা পাঠে আমাদের মন আপনা থেকেই আকৃষ্ট হয়, তৃপ্ত হয় তখন তাকেও কাটাছেঁড়া করে শ্রেণীবিভাগ না করাই হয়তো উচিত। কাজেই আমি এখানে এই কবিতা ক'টির আকৃতি বা আঙ্গিক নিখুঁত কিনা সে বিষয়ে কিছু বলে রসভঙ্গ করতে চাই না। কবিতাগুলি সবই চতুর্দশপদী বা সনেটজাতীয়, এবং প্রায় সবই ভালোবাসার কবিতা। খুঁটিনাটি বিচারে অনেক ত্রুটি হয়তো ধরা পড়বে, কিন্তু মোটের উপর বইটি পড়ে খুশি হওয়া গেলো, সেটুকুর জন্যই লেখককে ধন্যবাদ জানাই।

প্রতিভা বসু

মন পবন (এক পয়সায় একটি সিরিজ)—মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। চার আনা। 'কবিতা ভবন'।

কবিতা-ভবন যখন প্রথম 'এক পয়সায় একটি' সিরিজের কবিতার বই বার করা ঠিক করেছিলেন তখন তাঁদের অসংখ্য ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছিলো। কিন্তু প্রথম দু-তিনটি বই বেরুবার পর দেখা গেল আজকের পৃথিবীতেও অঘটন ঘটে। যুদ্ধের আকাশ যখন ক্রমশই ঘোলাটে হয়ে আসছে, যখন চিনি-দেশলাই জামা-কাপড় ক্রমশ অদৃশ্য ও অস্পৃশ্য হয়ে উঠ্‌ছে, সেই সময় কি বাঙালিরা বেশি কাব্যপ্রিয় হয়ে উঠলো? নইলে কবিতার বই-এর সমাদর বাড়লো কী ক'রে? আর একটির পর একটি 'এক পয়সায় একটি' বেরুতেই বা লাগলো কী ক'রে?

এতোদিন এই ছোটো-খাটো বইগুলি দেখলেই ভালো লাগতো। সরল অথচ সুন্দর প্রচ্ছদপট দেখে সবাইকারই লোভ হ'তো একটু নেড়ে-চেড়ে দেখতে। মঙ্গলাচরণের বই-ই এই সিরিজের প্রথম বই যার মলাট শস্তা ধরনের। যাতে ভবিষ্যতে অন্য কোনো 'এক পয়সায় একটি'র চেহারা এ-রকম শস্তা ধরনের না হয় সে বিষয়ে কবিতা-সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

অবশ্য বই-এর গেট-আপই সমস্ত নয়, তাই মলাট দেখেই যাঁরা 'মন-পবন'কে অবজ্ঞা করবেন, তাঁরা ভয়ানক ঠ'কে যাবেন। কারণ মঙ্গলাচরণ-এর বাস্তবিকই কবিতার হাত আছে। কিছুদিন আগে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কবিতার বই 'স্নায়ু' বোধ হয় বিশেষ-কেউ লক্ষ্য করেননি,

কার্তিক, ১৩৪৯

• কিন্তু ‘মন-পবন’ আকারে ছোটো হ’লেও উৎকর্ষে অনেকটা অগ্রসর। এ-কবিতাগুলি যে ভালো তা নিঃসংশয়েই বলা যায়। ‘স্নায়ু’-তে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রভাব বড়ো বেশি স্পষ্ট ছিলো, কিন্তু এখানে সে-প্রভাব লেখক তাঁর জারক রসে গালিয়ে দিতে পেরেছেন, তাই স্বকীয়তার আভাস দেখা দিয়েছে। ‘মন পবনে’ ছন্দে মিলে এমন দক্ষতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন যা নামজাদা কবিদের মধ্যেও সকলের নেই। তাঁর বিদ্রূপ উপভোগ্য, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক। তরুণ কবির এই চটি বইটি সমালোচক ও পাঠক-সাধারণের দৃষ্টি আশা করি আকর্ষণ করতে পারবে।

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কাঠখোদাই
শম্ভু সাহা

শিল্পীর ও
দেবসাহিত্য
কুটিরের সৌজন্যে

সম্পাদকীয়

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী

নাট্যপ্রসঙ্গ ‘কবিতা’ পত্রিকার সাধারণ সংকল্পের বহির্ভূত, কিন্তু যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর মৃত্যুর উল্লেখ না-করলে আমাদের সম্পাদকীয় কর্তব্য সম্পূর্ণ হবে না। এই অভিনয়শিল্পীর আকস্মিক বিয়োগ সংবাদ শুধু আমাদের রঙ্গমঞ্চের পক্ষে নয়, আমাদের সমগ্র সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের পক্ষেই শোকাবহ। জীবনের প্রথম পর্বে যোগেশচন্দ্র ছিলেন শিক্ষক, কিন্তু বালকশিক্ষার পরিবর্তে লোকশিক্ষার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করলেন, হ’লেন অভিনেতা ও নাট্যকার। শিশিরকুমার যখন বিদ্যাসাগর কলেজের প্রোফেসরি ছেড়ে নাট্যমন্দির স্থাপন করলেন, বাংলা রঙ্গমঞ্চের সেই ক্ষণিক পুনরুজ্জীবনের দিনে যে-ক’জন নটনটী শিশিরকুমারের নিকটতম সহযোগী ছিলেন, এবং শেষ পর্যন্তও যাঁদের ভাদুড়ী-ভক্তি অটল ছিলো, যোগেশচন্দ্র তাঁদের মধ্যে প্রধান। যে-‘সীতা’ নাটক দিয়ে শিশিরকুমার প্রথম বাংলা দেশের চিত্তজয় করলেন, সে-নাটক যোগেশচন্দ্রেরই লেখা। এ ছাড়াও অনেকগুলি নাটক তিনি লিখেছিলেন এবং কতগুলি বিখ্যাত উপন্যাসকে নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। রঙ্গমঞ্চের পরিবেশ থেকে ছিন্ন ক’রে এনে তাঁর রচিত নাট্যাবলীতে কোনো স্বতন্ত্র সাহিত্যিক মূল্য হয়তো খুঁজে পাওয়া শক্ত, কিন্তু এ-কথাও সত্য যে তাঁর গদ্যনাটকের কথোপকথনে এমন একটি স্বাভাবিকতা ছিলো যা অধিকাংশ পেশাদার নাট্যকারের রচনাতেই বিরল।

অবশ্য যোগেশচন্দ্র মুখ্যত ভাষাশিল্পী ছিলেন না, ছিলেন অভিনয়শিল্পী। আমি তাঁর অভিনয়ের বিশেষ ভক্ত ছিলুম। ইংরেজিতে যাকে character-acting বলে, তাতে তাঁর তুল্য দক্ষতা অন্য-কোনো অভিনেতারই দেখিনি। সমাজের কোনো বিশেষ-শ্রেণীর প্রতিনিধিকে যেখানে চিত্রিত করতে হবে সেখানে তাঁর ছিলো নিঃসংশয় শ্রেষ্ঠতা। এদিক থেকে ‘সধবার একাদশী’তে ডেপুটির ভূমিকায় তাঁর অভিনয় অবিস্মরণীয়। অবশ্য শুধু কৌতুকাবহ চরিত্র-চিত্রণেই যে তিনি সিদ্ধ ছিলেন তা নয়, তাঁর আন্তরিক অনুকম্পা এতই উদার ছিলো যে উচ্চতম ট্র্যাজেডি থেকে নিম্নতম প্রহসন পর্যন্ত সর্বত্রই ছিলো তাঁর অবাধ আনাগোনা। তার উপর তাঁর অভিনয়ে উৎকর্ষের একটি আশ্চর্য

সমতা ছিলো; রোজই তাঁর অভিনয় একইরকম ভালো হ'তো এবং যে-কোনো নাটকে যে-কোনো ছোটো ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়ে দর্শকের মনে তিনি একটি স্থায়ী চিহ্ন এঁকে দিতে পারতেন। মনে পড়ে 'রমা' ('পল্লী-সমাজ') নাটকে কলহপ্রিয় অসাধু ব্রাহ্মণের ক্ষুদ্র ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়ে তিনি কত অল্পে ও কত সহজে আমাদের মুগ্ধ করেছিলেন। তাঁর অভিনয়ের বাস্তবিকতা লক্ষ্য ক'রে আমার অন্তরের সাধুবাদ সর্বদাই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে। তাঁর কণ্ঠস্বর, উচ্চারণ-ভঙ্গি, মুখ-চোখের মুদ্রা, চলাফেরা সবই ছিল অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক, লেশমাত্র নাটুকেপনা কিংবা আড়ম্বর ছিলো না। তাঁর কণ্ঠস্বর কখনো চড়তো না, ক্রোধের অভিনয়েও মুখ বিকৃত হ'তো না, শুধু চোখের দৃষ্টির বিভিন্ন ব্যঞ্জনায় সুখ দুঃখ কৌতুক ক্রোধ প্রভৃতি বিভিন্ন ভাব তিনি ফোটাতে পারতেন। এই সুমিত সংযম আমাদের রঙ্গমঞ্চে বিরল। মৃদুভাষী মন্থরগমন সেকেলে প্রৌঢ়ের ভূমিকায় তাঁর আটপৌরে ঘরোয়া ভাবটি অত্যন্ত উপভোগ্য হ'তো। কেননা ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ঠিক তা-ই ছিলেন। তাঁর ধীর নম্বর সহাস্য প্রিয়দর্শন ব্যক্তিত্বে অধুনালুপ্ত আয়েসি ও মজলিশি সেকালের একটি সৌরভ ছিলো, তার মনোহরণ প্রভাব অনেকেই অনুভব করেছেন। আমাদের অভিনয়মণ্ডল যে-সব শৈথিল্য ও উচ্ছৃঙ্খলতার আকর্ষণ আজও কাটিয়ে উঠতে পারছে না যোগেশচন্দ্রকে তার কিছুই সংক্রামিত করতে পারেনি, রঙ্গমঞ্চকে তিনি সত্যই জীবনের সাধনা—এবং জীবিকার উপায়—হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, এই কারণেও তিনি বিশেষভাবে শ্রদ্ধেয়। শেষ জীবনে তিনি সর্বগ্রাসী সিনেমাতেও অভিনয় করেছিলেন, কিন্তু রুপোলি পরদা তাঁর প্রতিভার প্রতি সুবিচার করতে পেরেছিলো ব'লে মনে হয় না। তিনি ছিলেন বিশুদ্ধভাবে ও সর্বান্তঃকরণে একজন রঙ্গমঞ্চের কারুকর্মী।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়েস মাত্র ৫৩ বছর হয়েছিলো এবং তাঁর কোনো পীড়ার সংবাদও পূর্বে পাওয়া যায়নি। তাঁকে এখনই বিদায় দিতে হবে তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। তাঁর অভিনয় আর যে দেখা যাবে না এতে আজকের এই সার্বভৌম দুঃখের সঙ্গে স্বতন্ত্র ও বিশেষ একটি দুঃখ যোজিত হ'লো।

কবিতার পত্রিকা

'কবিতা'ই বোধ হয় বাংলাদেশে—এমন কি সমস্ত ভারতবর্ষে—প্রথম কবিতা-পত্রিকা। এ-কথা গর্ব ক'রে বলছি না, তথ্য হিসেবেই বলছি। এ-পত্রিকাটির পরিকল্পনা প্রথম যখন আমাদের মনে আসে তখন আমরা এর অভ্যর্থনা সম্বন্ধে ঘোর সন্দিগ্ধ ছিলুম, কিন্তু এ-ধরনের পত্রিকার যে প্রয়োজন ছিলো তার প্রমাণ এই যে কিছুদিনের মধ্যেই পর-পর আরো কয়েকটি কবিতা-পত্রিকা বাংলাদেশে দেখা দিলে, তার মধ্যে অবশ্য প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'নিরুক্ত'ই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া রসেটি-র Germ-এর অনুসরণে 'জীবাণু' নামে একটি পত্রিকা কিছুদিন তরুণ লেখকদের কাব্যচর্চা পরিবেষণ ক'রে বন্ধ হ'য়ে গেছে। সম্প্রতি তরুণতর কবিযশোপ্রার্থীদের দু' একটি মুখপত্র প্রকাশিত হচ্ছে। 'পরিক্রমা' নামে একটি সুদৃশ্য পুস্তিকার দুটি সংখ্যা আমরা পেয়েছি। এটি ঠিক পত্রিকা ব'লে বোধ হ'লো না, মাঝে-মাঝে এক-এক গুচ্ছ কবিতা বহন ক'রে পাঠকদের জানানি দিয়ে যাওয়াই বোধ হয় এর উদ্দেশ্য। আহমেদাবাদ থেকে প্রকাশিত একটি গুজরাটি কবিতা-পত্রিকাও আমরা কিছুদিন ধ'রে পাচ্ছি, এটিরও নাম 'কবিতা'।

সব-শেষে বেরিয়েছে 'একক' নামে একটি পত্রিকা, এটিও শুধু কবিতার। এর প্রথম সংখ্যায় ফাল্গুনী রায়ের দুটি কবিতা আমাদের ভালো লাগলো। এই কবিজনোচিত নামধারী তরুণ কবির মৃত্যুসংবাদ অত্যন্ত দুঃখের সহিত আমরা কিছুদিন আগে শুনেছিলাম। ফাল্গুনী রায়ের কবিতা নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হ'লেও সাহিত্যসমাজের স্বীকৃতি লাভ করবার মতো বৈশিষ্ট্য তাতে দেখা যায়নি। এতই অকালে জীবিতলোক থেকে বিচ্ছিন্ন না হ'লে কালক্রমে সে-বৈশিষ্ট্য হয়তো তাঁর রচনায় দেখা দিতো। এখন তাঁর বন্ধুরা যদি তাঁর ভালো কবিতাগুলি বেছে নিয়ে একটি বই ছাপান তাহ'লে তাঁর স্মৃতিটুকু অন্তত বাংলা সাহিত্যে থাকতে পারে।

বছর বারো পূর্বে এমনি তরুণবয়সে সুকুমার সরকারের মৃত্যু হয়েছিলো। তাঁর একটি কবিতার বই সে-সময়ে বিজ্ঞপিত হ'য়েও আর বেরোয়নি। তৎকালীন সাময়িক পত্রে তাঁর বহু কবিতাই প্রকাশিত হয়েছিলো মনে আছে। তাঁরও একটি কবিতার বই যদি কেউ একটু গরজ ক'রে প্রকাশ করেন তাহ'লে বাংলা সাহিত্যের একটি ক্ষুদ্র কিন্তু যথার্থ কাজ করা হয়।

বু. ব.

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

পৌরাণিক ভাষায় বলতে গেলে মানতেই হয় লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সমান কৃপা ছিল হীরেন্দ্রনাথ দত্তের উপর। আইনজীবী মহলের খবর যাঁরা রাখেন তাঁদের কাছে শ্রীযুক্ত দত্তের কৃতিত্ব ও সৌভাগ্যের কথা বাহুল্য মাত্র। তবে আমাদের কাছে তাঁর সম্মান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রকারণে, কারণ ধনীব্যক্তি মাত্রেই উল্লেখযোগ্য নন। সুখের কথা, হীরেন্দ্রবাবুর প্রধান পরিচয় তাঁর বিত্ত নয়, তাঁর পাণ্ডিত্য। তাছাড়া বক্তা হিসেবেও তাঁর প্রাপ্য সম্মান প্রচুর। বস্তুত, লেখনীর চেয়ে তাঁর রসনা ছিল অনেক সরস, অন্তত আমার তাই বিশ্বাস। বক্তৃতা অবশ্য অনেক জাতের হয়: শ্রীযুক্ত দত্তের বক্তৃতার প্রধান গুণ ছিল সরলতা ও সরসতা। তাঁর বক্তৃতা শেষ শুনেছি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের জয়ন্তীর দিন—এই সেদিন, তখন তাঁর বয়স অনেক। তবু আশ্চর্য লাগল; মনে হল অজস্র গ্রীষ্ম অনেক উত্তাপ বর্ষণ ক'রেও তাঁর প্রাণ থেকে এক ফোঁটা রস শুষে নিতে পারে নি।

লেখার কথা অবশ্য আলাদা। মানতেই হবে যে, তাঁর এদিকটা অনেক বেশী কঠিন। প্রথম দিককার বইগুলি "গীতায় ঈশ্বরবাদ" ইত্যাদি—অবশ্য সাধারণ পাঠকের পক্ষে অনধিগম্য ছিল না। এবং বাংলা ভাষায় দার্শনিক আলোচনার মধ্যে এগুলির বিশিষ্ট স্থান আছে। কিন্তু, জ্ঞানের বোঝা যতই বাড়তে লাগল, তাঁর রচনাও হয়ে এল তত উদ্ধৃতিবহুল, এবং সাধারণ পাঠক, বিশেষ ক'রে আমাদের দেশের "সাধারণ" পাঠক দুর্বোধ্য বোধ করলেন। তবু, কয়েকটা পাতা উলটিয়ে পালটিয়েই এ-কথা সবাইকে স্বীকার করতে হয়েছে যে শ্রীযুক্ত দত্তের জ্ঞানের ভাণ্ডার বিরাট।

হীরেন্দ্রবাবুর জ্ঞানচর্চ্চা নিছক লাইব্রেরীর চার-দেয়ালের মধ্যে ঠাসা ছিল না। দেশের বহু জ্ঞান-চর্চ্চা-সমিতির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল, এবং প্রায় সবগুলিতেই তিনি প্রচুর শ্রম ও অর্থ ব্যয় করেছিলেন। তাঁর কর্ম্মজীবনের সম্পূর্ণ খবর এখানে দেওয়া সম্ভব নয়; শুধু কয়েকটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করতে পারি যেখানে তাঁর দান ও সম্মান প্রচুর: ন্যাশানাল্ কাউন্সিল অব্ এডুকেশন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, যাদবপুর কলেজ, ব্রহ্মবিদ্যা সমিতি। তাছাড়া স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাঁর স্বদেশসেবা স্মরণীয়।

তাঁর মৃত্যু আমাদের সকলের পক্ষে বিশেষ দুঃখের কারণ। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আধুনিক বাংলা সাহিত্যে স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে এই শোকে আমরা সমবেদনা জানাচ্ছি।

দে. চ.

কবিতা

অষ্টম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা   পৌষ, ১৩৪৯   ক্রমিক সংখ্যা ৩৫

পত্রগুচ্ছ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত ও বিশ্বভারতী-কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত)

৮

উত্তরায়ণ
শান্তিনিকেতন

মানুষের জগৎ দেখতে দেখতে উলট পালট হয়ে যাচ্চে। অত্যন্ত বিশ্বাস ছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার উপরে—ভুলে গিয়েছিলুম সভ্যতার অর্থ ক্রমশই দাঁড়িয়েছে বস্তুব্যবহারের আশ্চর্য নৈপুণ্যে। তার পিছনে অনেকদিন ধরে যে মারাত্মক রিপু বীভৎস হয়ে উঠছিল তার সম্বন্ধে লজ্জাভয় হয়েছে অনভ্যস্ত। এই রক্তপিপাসু বসে আছে পুলপিটের পিছনেই, কলেজ ক্লাসের আঙিনায়; ধর্ম্মতত্ব, বৈজ্ঞানিক তত্ব, সমাজতত্ব অর্থনৈতিক তত্ব এর চারদিকেই বিচিত্র বাক্যপ্রবাহ বইয়ে দিয়ে চলেছে কিন্তু একে কিছুতেই স্পর্শ করতে পারচে না। এ বসে বসে ভিৎ খুঁড়ে চলেছে—আজ Babel-এর স্তম্ভ পড়বে ভেঙেচুরে। এর কোনো প্রতিকার আছে বলে ভেবে পাইনে—মারের পর মার আবর্তিত হচ্চে, থামবে কোথায়! এরা আমাকে দিয়ে কিছু বলাতে চায়, নিজের মনের মতো কিছু—আমার দ্বারা সে কখনোই ঘটে না। কিছু বলব বলে ভেবেছিলুম। এবার আমার শরীর অত্যন্ত অপটু—বোমা লাগা ভাঙা সহরের মতো—কলম চলে নেহাৎ খুঁড়িয়ে। মনে যে একটা নৈরাশ্য ঘনিয়েছে তার ধাক্কা খেয়ে মনে করি ব্যক্তিগত জীবনের যে স্বাতন্ত্র্য আছে তারি চারদিকে কাব্যের প্যাটারন গেঁথে একাধিপত্য করি নিজের মনোজগতে—সাহায্য করবে চারদিকের গাছপালা, ঋতুপর্যায়। একে কি বলবে আত্মকেন্দ্রিক জীবন—ঠিক তা নয়, এর কেন্দ্র সেই বিরাটের মধ্যে, যা সমস্ত মলিনতা, জটিলতা, আবিলতার মধ্যে থেকে তাকে অতিক্রম করে বিরাজ করে—একে বলবে মিস্টিক। যদি বলো

এই হচ্চে এস্‌কেপিজম্‌ প্রতিবাদ করব না—যে অঘাসুরকে আমি ঠেকাতে পারিনে এমন কি স্বয়ং চেম্বারলেনের ছাতাও পারে না, কী করব তার মার খেয়ে; ধিক্কার দিতে পারি—বিবর্বর্বী শতঘ্নীর প্রচণ্ড গর্জ্জনের কাছে সেটা শোনাবে অত্যন্ত হাস্যকর। কবির আলটিমেটম্‌ দেওয়া হয়ে গেছে তার মেয়াদের শেষ তারিখ হয়তো বা তিন চার শতাব্দী পরে। আমার যা বলবার, তার শেষ কথা বলে নিয়েছি—পড়ে দেখো বলাকার ৯৩ পৃষ্ঠায়—

ওরে ভাই কার নিন্দা করো তুমি, মাথা করো নত,
এ আমার, এ তোমার পাপ—
বিধাতার বক্ষে এই তাপ
বহুযুগ হতে জানি বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়—
ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ,
জাতি অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান
বিধাতার বক্ষ আজি বিদারিয়া.
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।

আমার যদি কণ্ঠ থাকত তা হলে এই কবিতার সমস্তটা আমি মানব বিশ্বের কাছে পড়ে শোনাতুম। এর উপরে একটা কথাও আমার বলবার নেই। মীটিং করে কী হবে,—মীটিঙের কতটুকু পরিধি, কতটুকু প্রাণ, কতটুকু কণ্ঠস্বর। কবি কি খবরের কাগজের প্রতীক? আমার এই কবিতা তোমরা হয়তো ভুলে গেছ—যদি না ভুলতে তাহলে বলতে আমার যা কাজ আমি শেষ করে দিয়েছি—আবার তাতে জল মিশিয়ে তাকে নতুন করে পরিবেষণ করা সাহিত্যিক দুর্নীতি।

ইতি ১৮।৯।৩৬
তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯

চন্দননগর

এ বৎসর অসহ্য গরমে তাড়া করে বের করে এনেছে শান্তিনিকেতন থেকে। গঙ্গার শরণাপন্ন হয়েছি—অনেককাল পরে আরেকবার সেই বোটের আতিথ্য নিতে হোলো। এ পদ্মার চর নয় চন্দননগর নদীতীর। ঠিক এই জায়গাটাতে সামনের ঐ বাড়িতে ছিলুম যখন আমার বয়স আঠারো। মনে পড়ে সেই কাঁচা বয়সের কথা। মনটা কী রকম ছিল নৈহারিক, আপনাকে ভালো করে পাইনি বলে নিজেই নিজের কাছে সব চেয়ে অচেনা ছিলুম। কিন্তু যখন ছিলুম বোটে তখন মনটা দানা বেঁধে উঠছিল। তখন সোনার তরীর কবিতার কাছাকাছি ঘুরচি। সাধনার ছোটো গল্প লিখচি মাসে মাসে। কল্পনার ফোয়ারার মুখে লেখার ধারা তখন অজস্র চলছিল। বোটের বাসা আমার সেই অবারিত রচনার সহায়তা করেছিল সন্দেহ নেই। বোটে প্রাণযাত্রার আয়োজন উপকরণ অত্যন্ত বিরল; প্রকৃতির আমন্ত্রণ চারিদিকে ছিল সীমাহীন বাধাহীন, কিন্তু সংসারটা ছিল নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হয়ে—দিনযাপনের মধ্যে ভার ছিল না, দায় ছিল না, আসবাবপত্রের বোঝা ছিল না, লোকব্যবহারের উত্তর প্রত্যুত্তর ছিল না—আপনার মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়বার পথে দরজার কাছে কিছুই পায়ে এসে ঠেকত না। আজ বোটে এসে কতকটা সেইরকম সামগ্রীবিরল দিন পাওয়া গেছে। এখানে কোনো খবর এসে পৌঁছয় না, খবরের কাগজ পড়িনে, যাদের কিছুমাত্র খাতির করতে হবে এমন সঙ্গী একজনও নেই। পড়বার বই অল্প কয়েকটা আছে, না পড়বার সময় সুদীর্ঘ। বেশ লাগচে। কবিতার সনেট যে রকম বোটের জীবনযাত্রা ঠিক সেই জাতের, সুপরিমিত, তাতে বাহুল্য কিছুই নেই—দিনটা রাত্রিতে এসে পরিসমাপ্ত হয় অতি সহজে।

ইতি মে ২৬ ১৯৩৯
তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০

শান্তিনিকেতন

বাইরে থেকে তোমরা ঠিক বুঝতে পারবে না যে এবার আমার জীবনে প্রদোষকাল ঘনিয়ে এসেছে। মন বলচে সংসারে আমার আর কোনো দায়িত্ব নেই। আমাদের জীবনের আরম্ভকালে শৈশবে আমরা দায়মুক্ত, জীবনের প্রান্তেও তাই। এখন যা কিছু সক্রিয়তা সব অন্তরের দিকে। এই ক্রিয়াটা ধীরে ধীরে বোঁটা আলগা করবার দিকে। আমাদের বয়সে কর্তব্যের দোহাই দিয়েই হোক বা আসক্তির আকর্ষণবশতই হোক সংসারকে যদি চারদিক থেকে আঁকড়ে থাকি তবে সেটাতে কল্যাণ নেই। দীর্ঘ কালের অভ্যাসবশতই সম্বন্ধসূত্রগুলো জীর্ণ হয় তবু মরতে চায় না, আমি সেটাকে লজ্জাকর মনে করি। উপনিষদে আছে দুই পাখী এক ডালে আছে। একটি পাখী ভোগ করে আর একটি পাখী দেখে। সংসার থেকে বিদায় নেবার পূর্ব্বে সেই ভোগের দিক থেকে নিরাসক্ত দেখার দিকে সরে আসতে ইচ্ছে করচি। ভোগ বলতে কেবল সুখভোগ বোঝায় না, কর্ম্মভোগও বটে। তার থেকে ছুটি নেবার অধিকার আমার হয়েছে। আমি ফাঁকি দিইনি, নানা পথ দিয়েই নিজের শক্তিকে উৎসর্গ করেছি। কর্ম্মের উদ্যোগে যেমন সার্থকতা আছে কর্ম্ম থেকে অবকাশের মধ্যে তেমনি সার্থকতা আছে। সেই সার্থকতার জন্যে প্রতিদিনই আমার মন উৎসুক। তোমরা আছ যৌবন জোয়ারের উদ্দাম টানের মধ্যে, আমাদের এই ঘাটের মনোবৃত্তি ঠিকমতো বুঝতেই পারবে না। তা নাই বোঝো, আমরা ডাঙায় এসে আমাদের পণ্য বেচে কিনে দিয়ে অনাগতের অভিমুখে তোমাদের বোঝাই করা নৌকোর ভাসান দেখচি। দেখতে আনন্দ আছে। জলে ঝাঁপ দিয়ে তোমাদের চল্‌তি নৌকায় চড়ে বসব এমন আশা কোরো না।

আমার একটা নতুন কবিতার বই বীথিকা নাম ধরে বেরিয়েছে। এই চিঠি পাওয়ার অনতিকালের মধ্যে পাবে। কী রকম লাগ্‌বে জানিনে। এর অধিকাংশ কবিতা এক সূত্রে গাঁথা নয়। তারা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র। একটা থেকে আরেকটাতে যাবার সেতু না থাকাতে মনকে ফাঁক ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে

চল্‌তে হয়, পড়বার আরাম তাতে ঘনিয়ে উঠতে পারে না। কেবল এক একখানি কবিতা এক একদিনের মতো যদি জোগান দেওয়া যেতে পারত তা হলেই ভালো হোতো—কিন্তু এ রকম ছাপানো বই হাটের মতো, সেখানে বিচিত্র অসংলগ্ন পণ্যের বাজার। তাদের আলাদা আলাদারূপ, আলাদা আলাদা দাম। তাই আশঙ্কা হচ্ছে এ বইটা সাধারণের গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু সেটা দুশ্চিন্তার বিষয় নয়। কবিতা জিনিষটা হাত পেতে সদ্য গ্রহণ করবার নয়। গ্রহণ করা ব্যাপারটার একটা পরিণতিকাল আছে—দেওয়া এবং নেওয়া একেবারে অব্যবহিতভাবে মিলিত হয় না।

এখানে শারদোৎসবের আয়োজন চলেচে। কিন্তু বর্ষা এবার বিলম্বে এসে কিছুতে দখল ছাড়চে না—স্তূপাকার মেঘে শরৎকে অবরুদ্ধ করে রেখেচে। বস্তুত এবার আমার শারদোৎসব একটা protest meeting-এর মতো হবে। ...

ইতি ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫
তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১

ওঁ

(শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র মিত্রকে লেখা)

কল্যাণীয়েষু

আমার কলমে এখনো বর্ষা নামেনি। মনের মিটিয়েরলজির উপর হুকুম চলে না। বোধ হচ্ছে কালক্রমে আবহাওয়া বদলেছে। একদিন ছিল যখন ধারাবর্ষণের জন্যে দীর্ঘকাল শূন্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে হোতো না, চাতকের দল দাবী না করলেও মেঘের দানসত্র ছিল অবিরাম। এখন শ্রাবণের মেঘ ভাণ্ডার উজাড় করে দিয়ে রিক্ত হাতে শরতের দিগন্তে শুভ্রবেশে

দাঁড়িয়েচে, চাত্‌ককে ঋতু পরিবর্তনের অপেক্ষা করতে হবে—তার পরেও ফল অনিশ্চিত। আমাদের সময় গেছে। ভাষা নিয়ে ছন্দ নিয়ে বাংলা সাহিত্যে আমরা আসন বানিয়ে দিয়েছি, এখন নেপথ্যে সরে পড়বার বেলা। যুবরাজ যখন আসবেন তখন তাঁর অভিষেকের জন্য নিতান্ত লজ্জা পেতে হবে না।

একটা হাল্কা রকমের গান পাঠাই। পয়লা বৈশাখে লেখা। খেলাচ্ছলে সুরে তালে রচনা, ঝুলির মধ্যেই পড়ে থাকত, কিন্তু তোমরা ক্ষুদ কুঁড়ো কিছুই ফেলতে দেবে না, সাহিত্যের বর্জ্জনীয় ও অর্জ্জনীয় বিভাগের মধ্যে ভেদ ঘুচিয়ে দেবে। পেটের দায়ে আমাদের সাময়িক পত্র অভেদানন্দী সম্প্রদায় গড়ে তুলছে। আমার মনটা দীর্ঘ দিনের পর ছুটি-পাও ইস্কুলের ছেলের মতো, কোন দুর্গমে দৌড় দিয়েচে ডেকে সাড়া পাওয়া যায় না। এই পলাতকার কাছ থেকে গল্প আদায় করা শক্ত। হয়তো হঠাৎ এক সময় আচমকা গল্পের ঝোঁক পেয়ে বসবে। সেদিন একটা খাতা হাতে এল, তাতে "রাজা" নাটকটাকে নূতন করে লিখতে বসেছিলুম "সুদর্শনা" নাম দিয়ে। প্রথম অঙ্ক পর্য্যন্ত লেখা হয়ে থেমে গেছে। সেটা সম্পূর্ণ করে তোমাদের দেওয়া অসম্ভব হবে না। জিনিষটা অপাঠ্য হবে না।

ক্লান্ত আছি। ইতি ৫ই আষাঢ় ১৩৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিঠি

অমিয় চক্রবর্তী

আমি ভালো আছি। তোমার জাহাজের উর্দ্ধে নতুন তারার মণ্ডলী—
জলের ম্যাপ মনে এঁকে জায়গা ঠিক করেচি, চঞ্চলি'
কত অগণ্য জলে চলে কতটুকু বিন্দু জাহাজ,
তাতেই আমার প্রাণ। আজ
স্বচ্ছ সুয়েজখাল পেরোতে তীর-বালুকায় সন্ধ্যা ঝরল,
রাত্রি করল,
জেটিতে নীয়ন লাইট, জ্বল্‌চে পোর্ট সৈয়দ, দুরু দুরু এই চিঠি
হাতে পৌঁছবে কয়লা তোলার শব্দে, গাইড্ ফেরিঅলার পেরিয়ে উগ্র দিঠি
তোমার চেনা নিরালায়, অজানা ডাঙার হাটে
জাহাজের একটি ওঙ্কার দিয়ে মন্থর বৈরাগ্যে থামার পরে ঘাটে।

এখন আর ভয় করে না মৌমাছি ঘরে চাক বেঁধেচে, রাস্তা চেনা
সারাদিন ভন্‌ভন্ ঘুরচে, আসচে, আহা আসুক্, কামড়াবে না।

শূন্য নেই ঘরে। মাটির পাত্রে সেই সাদা সবুজ পদ্ম, তার কেন্দ্রে জানি
যে শুভশ্রী শুকোবে তার সত্যে আমরা আছি, তারি সুরভি বাণী।

সেদিন অদৃশ্যপ্রায় লাল বাতির গোলকে চেয়ে,
ভেণ্ডর হুইলর স্টল ভেদ ক'রে এল বেয়ে
দিগন্ত পর্যন্ত শূন্য প্ল্যাটফর্ম। পরে
অসাড় গঙ্গার পুল, স্টীমারের হুইস্‌ল্, আবর্তে ঘোরে
স্ট্রাণ্ড রোডের ঘোলা স্রোতে ট্রামের ঘণ্টা, গরুর গাড়ি বোঝাই
সমস্ত সহর, বাড়ি, পেরিয়ে চলে যাই—
অবশেষে নিজের দরজা খুলে ঘরে ব'সেই থাকা

এর্ল মাটির পাত্রে পদ্মফুল,—তোমার পাঠানো—পূবের জান্‌লায় রাখা,
প্রথম আলোটুকু পায় ভোরে,
—রোজ ফুটচে একটু ক'রে।

তোমার এই দেশ। চেয়ে দেখি বাহিরে।
বাহিরে সেই তালগাছটিতে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়চে—চাও ফিরে।
ডেক্-এ উঠে য়ুরোপের প্রথম ঠাণ্ডা হাওয়া কি পাচ্চ? দুই দেশের
স্পর্শ কি পাও? নিরুদ্দেশের
পরপারে দুজনার ডাক পাঠাই; উড়ো এই চিঠি সন্ধ্যায়,
সকালে অকূল সমুদ্রে কে কোথায়॥

ভাঙ্‌ল যখন দুপুরবেলার ঘুম

অশোকবিজয় রাহা

ভাঙ্‌ল যখন দুপুরবেলার ঘুম
পাহাড়-দেশের চারদিক নিঃঝুম,
বিকেলবেলার সোনালি রোদ হাসে
গাছে পাতায় ঘাসে।

হঠাৎ শুনি ছোট্ট একটি শিস,—
কানের কাছে কে করে ফিসফিস?
চম্‌কে উঠে ঘাড় ফিরায়ে দেখি,
এ কী!
পাশেই আমার জান্‌লাটাতে পরির শিশু দু'টি
শিরীষ গাছের ডালের 'পরে করছে ছুটোছুটি।

অবাক্ কাণ্ড—আরে!
চারটি চোখে ঝিলিক খেলে একটু পাতার আড়ে!
তুলতুলে গাল, টুকটুকে ঠোঁট, খুশির টুক্‌রো দু'টি,
পিঠের 'পরে পাখার লুটোপুটি,
একটু পরেই কানাকানি, একটু পরেই হাসি—
কচি পাতার বাঁশি—
একটু পরেই পাতার ভিড়ে ধরছে মুঠি মুঠি
রাংতা-আলোর বুটি।

এমন সময় কানে এলো পিটুল পাখির ডাক,
একটু গেল ফাঁক,—
এক ঝলকে আরেক আকাশ চিড় খেয়ে যায় মনে
আরেক দিনের বনে,—
তারি ফাঁকে পাৎলা রোদের পর্দাটুকু ফুঁড়ে
এরাও গেলো উড়ে,
রইলো প'ড়ে ঝরা পাতা, রইলো প'ড়ে ঢালু,
পাহাড়-ধসা লাল গুহাটার হাঁ-করা ঐ তালু।

এরোপ্লেন

বুদ্ধদেব বসু

''Tis not through envy of thy happy lot,
But being too happy in thine happiness—'

মনে হয়েছিলো তুমি হলদে সবুজ লাল নীল
উদ্দাম উল্কার চতুষ্কোণ;
নির্বায়ু বিশ্বের শূন্যে ধ্রুবকক্ষ নক্ষত্রনিখিল
তোমারে দিয়েছে মুক্তি; তাই এই উজ্জ্বল স্খলন
পৃথিবীর মায়াবি ধূলিরে লক্ষ্য ক'রে।

ক্ষমা করো দৃষ্টির ক্ষণিক
বিভ্রম আমার, হে উর্ধ্বগ তন্ময়তা, স্বর্গে-মর্ত্যে সীমান্ত-সৈনিক,
মহাপক্ষ বিরাট জটায়ু! কী আশ্চর্য উল্কার উদ্দাম গতি,
অথবা নক্ষত্রশোভা আকাশের নির্বায়ু গহ্বরে;
তারো চেয়ে আরো কত অপরূপ, আরো কত আশ্চর্য তোমার
উর্ধ্ব নীলে স্বচ্ছন্দ বিহার!

তুমি যেন ইন্দ্রিয়বন্ধনমুক্ত ধ্যানী মন
আনন্দিত অনুক্ষণ
অভীপ্সার চরম চূড়ায়।
কল্পনার সূক্ষ্ম সত্তা, অক্লেদ, অফেন,
তুমি, এরোপ্লেন।
অথচ এ ধূলিজাল-ইন্দ্রজাল-লীনা
ধরিত্রীরে কখনো করো না ঘৃণা,
দিব্য তব ক্ষমতারে নিত্য টানে মানবী মমতা।
তাই দেখি, চিন্তার কৈলাস জয় ক'রে
প্রেমিক বিহঙ্গ-সম ফিরে আসো ঘরে,
ছন্দে-ছন্দে আন্দোলিত বায়ুমণ্ডলের
আলিঙ্গন গাঢ় ক'রে ক্রমে
নামো এরোড্রোমে।

যদিও মানবচিত্তে তুমি আজ আতঙ্ক-অঙ্কুর;
ক্ষিপ্র, ক্রূর মৃত্যু-দূত সেজে
যদিও সমুদ্রশ্যামা সপ্তদ্বীপা পৃথিবীরে করেছো বেষ্টন;
আমার এ-ধূলি-লব্ধ, ধূলি-লুব্ধ তনু-মন
যে-কোনো মুহূর্তে তব হত্যাবরিষণে

মুষ্টিমেয় অম্লজানে গন্ধকে লবণে
যদিও নিঃশেষ হ'তে পারে;
তথাপি তোমারে
নিন্দা করা অসম্ভব;
তথাপি তোমার স্তব
উল্লসিত কবি-কণ্ঠে বার-বার উচ্চারিত হোক,
স্বর্গলোকে নিষ্পলক হে পুষ্পক!

যে-উন্মত্ত মাৎসর্য তোমারে
সাজায়েছে নরমেধ-যজ্ঞ-উপচারে
প্রধান ঋত্বিক,
তারে ধিক, তারে শত ধিক।
হে মুক্ত, হে আনন্দিত, হে সূর্য-সন্ধানী,
তোমার অপূর্ব বাণী
চূর্ণ ক'রে ভূগোলের, ভূলোকের সীমা,
দীর্ণ ক'রে আকাশের নিশ্চল নীলিমা,
মনোরথ-তুল্য তীব্র বেগে
দুর্বার আবেগে
দেশে-দেশান্তরে বাঁধে মিলনের রাখী,
লুপ্ত করে জাতি বর্ণ, মিত্র করে ইতিহ-শত্রুরে।
হিংসার প্রাচীর তুলে পরস্পরে রাখে যবে দূরে
মানবের দুর্ভাগা সন্ততি, সে-দুর্যোগে, হে আশ্চর্য পাখি,
তুমি শুধু সীমান্ত লঙ্ঘন করো অক্লেশে উল্লাসে।
মূঢ় তারা, যারা বলে তুমি হত্যাকারী।
আমরাই মিথ্যাচারী,
তোমার মিলন-মন্ত্র বুঝেও বুঝি না।

আমি আজ মুগ্ধ চোখে দেখি চেয়ে উর্ধ্ব নীলে তোমার বিহার
হেমন্তের তন্দ্রা-ভরা চন্দ্রালোকে। দুঃসাহসী দৌত্য তব চলেছে অবাধে,
চিন্তার অচিন্তনীয় মানচিত্র থেকে ইন্দ্রিয়ের বিমোহন বিচিত্র প্রাসাদে।
এ-মায়ামালঞ্চ থেকে যাত্রা করো নিরঞ্জন মুক্তির আকাশে,
বৈকুণ্ঠের উপকণ্ঠ থেকে নামো
চৌরঙ্গীর শতরঙ্গ ঘাসে।
আবার মিলাও শূন্যে নীলিমার টানে
ধূলি হ'তে ধ্যানে।
তোমারে করি না ঈর্ষা, তোমার আনন্দে আমি সুখী,
হে পবিত্র পুরোহিত! স্বর্গে-মর্ত্যে বিবাহবন্ধন
মানুষের ইন্দ্রিয়-বিদ্রোহী মন
চিরকাল করেছে কল্পনা,
দৃশ্যে শব্দে তারি মূর্তি তোমারি রচনা,
তারি মন্ত্র করো উচ্চারণ
এঞ্জিনের গুঞ্জরণে যুগসন্ধি-সন্ধ্যার আকাশে।
যদিও আগ্নেয় ত্রাসে
হৃতবুদ্ধি প্রজাদল তোমারে ধিক্কারে
আজ এই কালের কুটিল লগ্নে—
তবু এই কবির বন্দনা-গান ছন্দের হাওয়ায়
তোমারেই লক্ষ্য ক'রে উড়ে চ'লে যায়
হেমন্তের চন্দ্র-নীল স্বপ্নিল আকাশে।
তারে নাও সঙ্গী ক'রে তোমার উদ্দাম অভিসারে,
হে নির্ভীক, প্রচণ্ড প্রেমিক! তার অভিনন্দনের মালা
দিয়ো না ফিরায়ে; লাল নীল হলদে সবুজ আলো-জ্বালা
শরীরী গতির নৃত্যে পূর্ণ করো তার
ইন্দ্রিয়-আত্মার
মিলনের আজন্ম-সঞ্চিত অঙ্গীকার।

তুমি কেমন মানুষ?

প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

আজ এখানে ট্যাঙ্কের আঘাত হানো, কাল এখানে রজনীগন্ধা ফুটবে;
আজ অজস্র রক্ত ছড়াও, কাল প্রভাতে আস্‌বে নতুন ফসল।
বারুদের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন আকাশে ঘণ্টা বাজে—
প্রান্তরে আজ বীজবপনের তারিখ।
তারিখ তুমি ভুলে যাও, তুমি কেমন মানুষ?
মিছিলে তোমার জায়গাটি খালি, তুমি কেমন মানুষ?
মানুষদের রক্তের সারে মহাদেশগুলোর পড়ো জমিতে উর্বরতা নাম্‌ছে,—
তোমার ফোঁটা ঢাল্‌লে না, তুমি কেমন মানুষ?

লাল ইস্পাতের স্রোতের মতো হাজার মানুষের উত্তপ্ত স্রোত,—
দিনের আলো অন্ধ হ'য়ে গেল।
তাই তো শেষ-বসন্তের অপরাহ্নের মতো বেদনাধূসর আমার মন,
কিন্তু তা দিয়ে আমার ইস্পাত গড়াচ্ছি।
তাই তো আমার গলা সীসার মতো ভারি হ'য়ে এল,
কিন্তু আমার গানের কথা বিপুল বাসনায় উষ্ণ।
হে মানুষ ভাই,—
স্বাধীনতার স্বর্ণ-দেয়ালী-লগ্নে কবির এই ছোট্ট দীপশিখার আলো উপহার নাও।
কর্ম্মোচ্চারিত নিশানের বন্যায় মুখরিত করো আকাশ,—
তাতে তোমাদের সবাইকার স্বাক্ষর মেলে ধরো।

রাত্রি

রবীন্দ্রনাথ সরকার

তোমার হৃদয়খানি প্রসন্ন প্রসন্ন রাত্রির মতো। মনে হয়,
উজ্জ্বল তিমিরে
ঘিরে
আমাকে রেখেছে যেন তোমার হৃদয়।
আলোকে বিকৃত রূপ, বিশৃঙ্খল—কোনো সমন্বয় নেই তার,
একখানি গ্রাম—
চুপে চুপে ছেয়ে এলো শান্ত রাত্রি—অন্ধকার,
আমি ডুবিলাম।

বিচ্ছিন্ন জীবনে শক্তি সংলগ্নতা আনিল শর্বরী,
আঁধারের আলিঙ্গনে সমগ্র-স্বরূপে গেছি ভরি'।
এ রাত্রি নিগূঢ়-সত্তা, রহস্যে অপার
ঝলোমলো কবিতার মতো—
যতো খুঁজি অর্থ নেই তার,
ডুবে যাই ততো।

সনেট

বিজনকুমার চট্টোপাধ্যায়

(১)

আমি ঘুমে অকাতর—নিঝুম দুপুর,
দৈব ব্যাপার ঘটে যদি তুমি আসো!
প্রসাধন সেরে' নিয়ো, দেখাবে মধুর,
মেঘদূত-শাড়ী পোরো—যেটি ভালোবাসো!

শিয়রে বসিয়া শিরে রেখো নাকো হাত,
তপ্ত পরশটুকু মিছে মারা যা'বে!
তোমার কী তা'তে?—দেবে আমারে আঘাত,
তা'র চেয়ে পাশে বসে' ধীরে গান গা'বে!

নামিবে আমার চোখে তোমার স্বপন
ভারী ভয়—সংশয়—মিলা'বে কখন!

আমি ঘুমে অচেতন, আর পাশে তুমি,
খুব কাছে, ব্যবধান অথচ সুদূর
হ'বে মন উন্মন ঘুম-চোখ চুমি'?
—ক্ষতি নাই, দামী তবু একটি দুপুর!

(২)

ভাবতে তোমার কথা ভারী ভয় করে,
(তোমার কি ভয় করে ভাবতে আমায়?)
ডাকি যদি আর কারে ওই নাম ধরে',
পড়বো তখন বলো সে কী লজ্জায়!

ভয় করে, স্বপ্নে বা ডাকি যদি ভুলে'
পাশ থেকে শোনে যদি আর কোনো জন!
বলতে যা' বাধা যদি বলি তা' ঘুমুলে,
আমারে ভাববে কী যে সকলে তখন!

সারা মন ঘিরে আজ এ কী সংশয়—
তোমারে পেয়েছি তবু এত কেন ভয়!

সবার আড়ালে তুমি থাকো চিরদিন,
আমার আকাশে হোক্ তোমার প্রকাশ!
গন্ধ তোমার হ'বে আমাতে বিলীন,
আমি ফুল, আর তুমি?—ফুলের সুবাস!

উজান

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

গুরু রবি ঠাকুরের দিব্য, আমি-ও কাব্য গাই
ছন্দ-শিখীরে সুরে নাচাই ॥
ফোটে হৃদাকাশে ভাবের মেঘ
ফাটে বাজ, ছোটে ঝড়-বাদল
রচি মেঘদূত নিরুদ্বেগ
বাজাই বিজনে মন-মাদল,
এ-পাশে, ও-পাশে চারিপাশে বাজে
বাজ-বাজি, ছোটে ঝড়-বাদল ।

আজ বাজার মন্দা । পদ্য চাহে না, গদ্য সব,
ডাল-রুটি চাহে রুদ্র 'মব' ॥
'লাথ্ খেয়ে খাবো শূন্য পাত ?'
রাজপথে জাগে তূর্য-রোল ।
রচি গান সম্পূর্ণ রাত :
'মহি আঁধারে সূর্য তোল্ ।'
রাত্রি-আঁধারে হামা টেনে হাঁটি
খুসি মন, পাই সূর্য-কোল ।

হায় আলো-ভরা মম সূর্য-ছোঁয়ানো উচ্চ মন
এ-কথা বোঝে না তুচ্ছ জন ॥
প্রাণ ধরে' দানে কী হিন্দোল
সামাল, সামাল, সব বেচাল,
কান ধরে' গাহে হট্টগোল,
কেবা শোনে কারে দিই যে গাল,

চিতে জাগে যবে গীতি, চারিভিতে
ভীতি বাজে, সাজে সব বেচাল ।

তবু মাথাটারে নেড়ে (ভাববো ভেবেছ ?) কাব্য গাই,
ছন্দ-শিখীরে সুরে নাচাই ॥
ফোটে হৃদাকাশে ভাবের মেঘ
ফাটে বাজ, ছোটে ঝড়-বাদল,
রচি যুগদূত নিরুদ্বেগ
বাজাই বিজনে মন-মাদল,
এ-পাশে, ও-পাশে চারিপাশে যবে
বাজ বাজে, ছোটে ঝড়-বাদল ।

চন্দ্রাতঙ্ক

রামেন্দ্র দেশমুখ্য

আমার প্রপিতামহ, শুনেছি বাতিক ছিলো তাঁর,
পরিচ্ছন্ন যে-কোনো সন্ধ্যার
দিগন্তে চাঁদের অভ্যুদয়ে,
ঈষৎ চঞ্চল হয়ে
মনের দক্ষিণ কোণে খুঁজতেন কিসের আকার ।
উন্মত্ত ছায়ার মতো সারারাত শুধু ঘোরাফেরা,
খ্যাত এক ইমারত, তার পাশে আড়াআড়ি বামে—
নিমের ছায়ার শিরে ইমারত দিতো যেথা ছায়া,
সেইখানে দেখা যেতো এক রুক্ষ সন্ন্যাসীর কায়া,
আকাশে রয়েছে চেয়ে চেয়ে—
সেই দেহ—প্রপিতামহের সেই চোখ—
জ্যোৎস্নাভুক—ঊর্ধ্ব তার লোক ।

তারপর পিতামহ, শুনেছি নিতান্ত চাঁদভীরু,
চাঁদের রয়েছে কথা, অতএব অমরু শতক
অপঠিত রয় যাঁর।
অথচ ছ'ফুট দীর্ঘ সুগঠিত দেহখানি তাঁর
ছিল জানি। তবু ভীরু আতঙ্কে চাঁদের।

আবার এখানে সেই জের
সে-বংশলতার আমি ফুল,
নির্ঘাত তেমন কিছু ভুল এক রক্তে মোর র'বে ;
কোনো এক রাতে জানি কবে
সে কোন নির্জন পথে পাওয়া গেছে আমারে মূর্ছিত—
রক্তের সংস্কার এ যে—কোষে কোষে হলো বিগলিত।

এই তো বিকাল,
পদ্ম নেই এই জলে, আছে শুধু শুষ্ক কিছু নাল।
সুপারীর মেরুদণ্ড, হে হৃদয়, হ্রদের কিনারে,
ভিতরে যে তরংগিত বাহিরে সে আবদ্ধ প্রাচীরে।
একান্ত জলের কাছাকাছি
আমি যেন কতোকাল আছি।

মাটির বৃহৎ ভাঁড়ে জল,
মাটির চোঁয়ানো জলে শফরীর নর্তন কেবল।
হৃদয়ের তল যায় দেখা
সেইখানে আঁকাবাঁকা কতো কালো শামুকের
আভা-লাল ঝিনুকের
বুকের কিনারে কিছু ঢাকা।

বিকেলের ছায়া এলে কতোগুলি মহৎ চোয়াল,
ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি শ্বেতশ্মশ্রু অনেক বোয়াল
এইখানে সমবেত হয়,
এইখানে ক্রমশ-নির্ভয়।
এখানে বেড়ায় মাছ, মাছরাঙা গেছে দূর মাঠে।
বন্ধুর পতন খুঁজে পশ্চিমের সূর্য পিছু হাঁটে।
অদ্ভুত কবন্ধ-মাছ জলে
বেরিয়েছে প্রথম টহলে।

পুনরায় সেই বাঁকা চাঁদ :
আকাশের পাতা-ফাঁদে মাটির হৃদয় ধরা পড়ে ;
অবসাদ আর কিছু সাধ
কিছু শিশিরের জল ঝরে।
এই জীবনের সেই প্রতিবেশী দুইটি জীবন
বিগত ও অনাগত, দুইপাখা করে' সঞ্চালন
এক পাখী ওড়ে—
মানসের সমতলে শিশিরের কোষগুলি নড়ে।

গৃহকপোতী

বীণা বন্দ্যোপাধ্যায়

গৃহকপোতীর করুণ কাঁদন হাওয়ায় ভাসিয়া যায়
ক্ষীণশিখা যেন ঝড়ে,
চারিদিকে শুনি গুরুগর্জ্জায় মেশিনগান
উদ্ধত অভিযান ;

"তাদেরি ধোঁয়া কি আকাশ ঢেকেছে,
অথবা, কপোতী! এ তোর মনের ভুল?
অমাবস্যার রজনী ছড়ালো কৃষ্ণচুল।"
তবু ভীরু বুক কেঁপে ওঠে তার,
"হায়রে হায়",
কপোতী কাঁদিয়া মরে,
"এ সব কথার অর্থ বোঝাই দায়।"

আকাশে উঠেছে ঝড়;
বনিয়াদি যত সাজানো মমি,
"ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়" তাসের ঘর,
ঝড়ের ঝাপটে নিল জমি।
"কমরেড! ধরো হাতিয়ার",
রণকপোতের হাঁক;
"হও বার, ধরো হাত,
মুক্ত-আকাশ সাঁতরিয়ে হও পার।"
ভীরু এ কপোতী আকাশ চেনে না, খাঁচা কোথায়?
হায়রে হায়
গৃহকপোতীর করুণ কাঁদন বাতাসে ভাসিয়া যায়।

"ভালোই হয়েছে বাঁধন ছিড়েছে, ভেঙেছে খাঁচা,
স্বাধীনতা বিনা কী সুখে বাঁচা?
এসো একবার, মুক্ত আকাশে, খোলা হাওয়ায়,
ঝড়ের ছন্দে দোলা-খাওয়ায়,
নাও জিতে নাও দুনিয়াদারীর তক্তে যে দাবীদার,

এস সঙ্গিনী, রণরঙ্গিনী!
নর্ম্মসখীর লীলার ছল
আজ বিফল।"
কমরেড দিল হাঁক—
"স্বপ্ন হয়েছে ফাঁক,
দুনিয়ার যারা বখরাদার
তারা ঘিরে আসে, দীপ্ত আকাশে
উড়ুক লাল নিশান,
হে কপোতী! আজ গাও যুদ্ধের গান।"

তবুও অবুঝ কপোতী কাঁদে;
পড়েছে মোহের ফাঁদে;
ছলছল চোখে চায়,
এক পাখা তার উড়ে যেতে চায়
হাওয়ায় ভর,
আরেকটি পাখা তখনি গুটায় ভগ্নস্তূপের 'পর,
গতি অতি মন্থর।

হায়রে হায়,
ভীরু কপোতীর বিমূঢ় কাঁদন বাতাসে ভাসিয়া যায়,
পার হ'য়ে যায় জনমনপ্রান্তর,
পার হ'য়ে যায় বেদনায় নীল পস্টারিটির পাতা,
হালকা হাওয়া যে কান্নায় হ'লো ভারি।
গৃহকপোতীর কাঁদন কখন ভেজালো কবির খাতা,
দেখিইনি তা'।

দোয়েল

জীবনানন্দ দাশ

একটি নীরব লোক মাঠের উপর দিয়ে চুপে
ঈষৎ স্থবিরভাবে হাঁটে।
লাঙ্গল ও বলদের একগাল স্থির ছায়া খেয়ে
তাহার হেমন্তকাল দুই পায়ে ভর দিয়ে কাটে।

নিজের জলের কাছে ভাগিরথী পরমাত্মীয়।
চেয়েও পায় না তাকে কেউ তার সহিষ্ণু নিভৃতে।
লাসকাটা ঘরের ছাদের পরে একটি দোয়েল
পৃথিবীর শেষ অপরাহ্নের শীতে

শিষ তুলে বিভোর হয়েছে।
কার লাস? কেটেছিলো কারা?
সারা পৃথিবীতে আজ রক্ত ঝরে কেন?
সে সব কোরাসে একতারা।

অপরাহ্নের চাষা ভুল বুঝে হেঁটে যায় উচ্ছলিত রোদে।
নেই, তবু প্রতিভাত হয়ে ওঠে নারী।
মর্গের মৃতদেহ দোয়েলের শিষে মিটে গেলে—
আদিম দোয়েল এলে—অনুভব করে নিতে পারি।

ইন্দ্রপ্রস্থ

বিমলচন্দ্র ঘোষ

অন্ধকার ইন্দ্রপ্রস্থ!
রাহুগ্রস্ত তুমি আজ বিস্মৃতির ছায়া
প্রশান্ত নীরব।

কালের নিশান ওড়ে তারাঙ্কিত গাঢ় নীলিমায়
মৌন নিশ্চেতন।
যুগান্তের কৃষ্ণবর্ণ ক্রূর ভ্রূকুটিতে
বিধ্বস্ত স্ফটিক-স্তম্ভ
শুভঙ্কর তাম্রকুম্ভ মর্ম্মর কুট্টিম;
মণিময় বেদীমূলে কারুশিল্প আঁকা
নাগেন্দ্র বাসুকী শীর্ষ, রত্নফণা অযুত বিস্তার
ধার্ত্তরাষ্ট্র পাণ্ডব সংহার!
বিধ্বস্ত বিষ্ণুর মূর্ত্তি ত্রাণকর্ত্তা গরুড়-বাহন
ধ্বংস-সাৎ শিলীভূত-স্বর্ণশিখা দেব হুতাশন
পাষাণে স্তম্ভিতকায়া
রূপায়িত বারীন্দ্র বরুণ
সংরক্ষিত যাদুঘর মহাভারতের।

বিশ্বকর্ম্মা-বিনির্ম্মিত বিধ্বস্ত সে-দেবশিল্পাবলী
অত্যাশ্চর্য্য মর্ম্মর খিলান
ক্ষত্রিয়ের স্থাপত্য মহান
ঐশ্বর্য্য-প্রদীপজ্বালা ভারত-গৌরব
নিঃশেষে করেছে গ্রাস বিলুপ্তি-রৌরব!

শক হুন গ্রীক তুর্কী মোগল পাঠান
তাতার আফগান
উড়ে গেছে কালান্তক ঝড়ে
বার বার ওঠে আর পড়ে
সাম্রাজ্যের কীর্ত্তিস্তম্ভ দ্বেষদম্ভ অন্ধ নায়কের।

ধর্ম্মপ্রাণ মুসল্‌মান
মস্‌জিদে আজান্‌ হাঁকে পবিত্র গম্ভীর !
শতজীর্ণ শতাব্দীর
কেঁপে ওঠে ধুলোবালি কবর গম্বুজ
বিষণ্ণ ঈদের চাঁদ।
তারপর খাকী-কোর্ত্তা ইংরাজ সৈনিক।

যুগান্তর ভেদ করে ভেসে আসে স্বপ্নের বিদ্রূপ
খল খল হাসে ক্রূর কালের কঙ্কাল
সর্ব্বনাশা
শকুনির পাশা।
ভেঙে গেছে রাজসূয়-যজ্ঞ-সভামণ্ডপ তোরণ
অপহৃত স্বুবর্ণ কপাট।
কুরুক্ষেত্রে ধূ ধূ করে মাঠ
কালের অমর ছেলে নির্ব্বিকার চাষা চাষ করে।

হয়তো হঠাৎ ওঠে লাঙলের ফালে
শতভগ্ন কপিধ্বজরথচক্রনেমি
গান্ধারীর ছিন্নহার
কুন্তীর বলয়
পাঞ্চালীর মুকুটের মণি,
হাস্য করে মৃত্যুঞ্জয় বিদীর্ণ করোটি অশ্বত্থামা
ধ্বংসের ত্রিযামা।
হয়তো হঠাৎ ওঠে জ্যোতির্ম্ময় লাঙলের ফালে
জানুর হাড়ের টুকরো কুরু-সম্রাটের
খণ্ড খণ্ড মহাকাব্যদ্যুতি
গণেশের হস্তলিপি বৈয়াসিকী কীটদষ্ট পুঁথি।

রাহুগ্রস্ত ইন্দ্রপ্রস্থ মহাবিস্মরণ !
কীর্ত্তিমান কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ
কারণ সে-কবি
রেখে গেছে প্রাণবন্ত ছবি
জ্যোতিষ্মান হৈমকান্তি স্মৃতির অক্ষরে।

রবিশস্য গোধূমের ক্ষেত
ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র
সুদূর উদ্যোগপর্ব্বে দৈবনেত্রে দেখেছে একদা :
অগ্নিমুখ বিশ্বরূপ লেলিহ বদন
চূর্ণীকৃত উত্তমাঙ্গ দশনান্তরালে
শোণিতাক্ত লালাবিম্ব
কৌরব কেশরী
উদ্ভ্রান্ত লোভের স্বপ্নে বিনষ্টির ভয়াল চর্ব্বণ।
প্রতিধ্বনি ভেসে আসে কালান্তক ঝড়ে
বার বার ওঠে আর পড়ে
শত শত মদোন্মত্ত মানব সভ্যতা।

অন্ধকার—ইন্দ্রপ্রস্থ
রাহুগ্রস্ত বিস্মৃতির ছায়া !
'ত্বমুত্তিষ্ঠঃ'—লভো যশ !
কালোঽস্মি করাল !
জেগেছে মানব-গোষ্ঠী গণ-মহাকাল
কোলাহলে মুখরিত স্টেশন বিশাল
দিল্লী নগরীর।
অগণিত শতাব্দীর
ভাগ্যসূত্র ছিন্নভিন্ন হিন্দুস্থান ভীষণ গম্ভীর।

মস্কো রেডিওর এক অজানা গানের সুরে

বিষ্ণু দে

তবু তারা বেঁচেছিল কড়িকেনা দাসদাসী নামহীন চাষী ও মজুর।
বিশ্বামিত্র সৃষ্টি করে আলকেমির নববিশ্ব
ভুঁইফোড় গায়ত্রীর বরে।
ইরার প্রণবছন্দে পুরোডাশে লালায়িত তাপসের সোমরস ঝরে;
যজ্ঞের জ্যামিতিছকে আত্মজ্ঞানে আত্মরত
পুরুষের অঙ্গহানি-ফলে
নাভিস্থিত প্রজাপতি স্মিতস্বপ্নে বারে বারে
বুঝিবা দক্ষিণে বামে টলে।
বরুণ ফিরায় মুখ,
বারুণীও রোগে ক্ষান্ত, মহামারী হাসে।
অনাহারে অনাচারে দস্যু আসে আর্যাবর্তে;
বন্যায় ধূসর মর্ত্যে
দুর্ভিক্ষের রক্তাক্ত আকাশে।

তবু বাঁচে দাসদাসী চাষী ও মজুর যতো!
আশ্চর্য জীবন!

তারপরে বিশ্ব সাজে প্রকৃতি, প্রপঞ্চ, বাজে,
মায়া, মরীচিকা,
জ্বালাহীন ছলা শুধু, অর্থের অনর্থ মাত্র,
সে দায়িত্বহীন
তুরীয় আশ্রমে লোভী শিখা
নেড়ে নেড়ে ঘাম ঝরে আর ক্ষরে
অবিরাম বিশ্বের শূন্যতা,

দ্বিধান্বিত ঘোরে
দেশে দেশে তীর্থে তীর্থে বীতরাগ পরিব্রাজকেরা।
এদিকে চলেছে রাজ্য,
পরিচারিকার ভিড়ে তাম্বুল চামর বয় বণিকেরা,
কেউ বয় স্থূল রাজোদর।
দোর্দণ্ড-প্রতাপ রাজা সসাগরা সাম্রাজ্য-সম্ভার
প্রতিদিন হয় ভাজ্য পারিষদ, প্রিয়সখী,
কোটাল, কুটুম, চোর, রাজগুরুদের মাঝে।

তবু বাঁচে দুঃস্থ ও বর্বর
যারা ছিল দাসদাসী—আর নেই আর নেই নামহীন
চাষী ও মজুর।
কবে থেকে বেঁচে আছে মৃত্যুহীন দাসদাসী
কতো শতবার
মরিয়া মরে না রাম নামহীন এই সব চাষী ও মজুর—
উত্থানে ও পতনে বন্ধুর
আশ্চর্য জীবন!

মতবদল

শিবরাম চক্রবর্তী

বলেছি তোমারে নাই বা থাকলে তুমি
আরো কত মেয়ে আসবে!
এই পথে এল বলে'!
তারা কি আমাকে কিছু কম ভালোবাসবে?
কিন্তু এখন ভেবে ভেবে হই খুন—
কি করলে রাখা যায় তোমায়—

মুখ ফুটে বলা হ'লো যে দায় :
"যেয়ো নাকো তুমি চলে'।"
বল্লে তুমি তো হাস্‌বে।
সেদিন বলেছি তোমারে, বাংলা বই
সিনেমায় আমি দেখিনে কক্ষনোই,—
আগাগোড়া ভরা নাকের চোখের জলে,
একদম্ সব বাজে।
কিন্তু এখন লাগ্‌ছে আমার ধোঁকা,
(কি করে' যে আমি হলাম এমন বোকা) !
এমন সুযোগ হারালাম কোন্ ছলে !
বাংলা সিনেমা বই
অমন অর্দ্ধোদয়-
যোগাযোগ বলো আর-কিছুতে কি হয় ?
সমস্ত ঘর জমাট্ আঁধার ভরা
তোমার হাতটি আমার মুঠোয় ধরা—
তোমার আমার গায়ে-গায়ে-ঠেকানোই—
জনারণ্যের নির্জ্জনতার মাঝে।
বলেছি তোমারে, ভালোবাসা শুধু ধুয়ো—
সব ফাঁকি আর ভুয়ো—
অকারণে যত সময় ইত্যাদির
কেবল বাজে খরচ।
কিন্তু এখন কেন যে হই অধীর,
বুকের কাছে যে কেন করে খচ্‌খচ্।

কর্কশ গান

মণীন্দ্র রায়

(কোকিল-কে : কাকের কৈফিয়ৎ)

আকাশে মেঘের পলেস্তারা মোছে তারকার অশেষ ধারা।
একা চাঁদ ছিল নিমেষহারা, করবে তারেও কি দেশছাড়া
কঠিন মেঘের পলেস্তারা ?

* * *

অন্ধকার। মেঘে মেঘে হানে বিভীষিকা
বন্ধদ্বার ঘরে ঘরে। নেভে দীপশিখা
একে একে এ-ভুবনে। নিরীহ দর্শক
দেখে। দেখে, প্রলয়ের কী রোমহর্ষক
অভিনয় অনুষ্ঠিত নেপথ্যে। পথিক
কবি নয়, কর্ম্মী কিম্বা তাহারো অধিক :
শ্রমিক কৃষাণ। চলে তাদের মিছিল
ক্রমিক নিশান হাতে। আঁধার নিখিল
বর্ব্বরের লীলাভূমি ইতিমধ্যে। তাই
খর্পরের পশুরক্তে গন্ধপুষ্প নাই ॥

* * *

বাজে মৃত্যুর কঙ্কালে দেখি ঝঞ্ঝার হাহারব।
শ্মশানে ভীষণ নরকরোটিতে নবজীবনের স্তব
লাগে কি মধুর ? অদূর দিবসে জানি এ-গলিত শব
ছাড়া পাবে। হারাজীবনের মূলে মুকুলিত কলরব।
ততদিন থাক জ্যোৎস্নাবিহীন মৃত্যুর
কর্কশ লভে পিশাচের অনুচিত সুর।

* * *

আমিও জানি, আকাশে আছে আলো : বাতাস বহে সুবাস কুসুমের ;
শিহরি' মন সহসা বাসে ভালো ; অবশ তনু পরশে কী ঘুমের !
আমিও জানি, শিশুর হাসি আছে ; আছে পাখী রঙীন প্রজাপতি ;
লক্ষকোটি গ্রহতারার মাঝে এই পৃথিবী পরম রূপবতী !
আমিও তার পূজারী, নেই পূজার ফুল শুধু ।
কী এক মরু-নীরস হাওয়া হৃদয় করে ধূ ধূ !
গানের ভাষা হাসায় তাই রসিক গুণীজনে ।
কোথায় গান ? বিলাপধ্বনি পাঠায় শুনি মনে !
বোঝো না তুমি, নালিশে তাই হয়েছি হতবাক !
মধ্যদিনে শীর্ণডালে তৃষিত এই কাক ॥

* * *

সত্যই যদি এ-ধরণী হ'ত ঘরণী
কাব্যের,—হ'ত মহাজীবনের তরণী,—
খুলে যেত হায় প্রেমের মুক্ত সরণি
ধরায় । রভসে রসায়িত হ'ত ধমনী ।
ফুল পাখী শিশু কবিতা চিত্র রমণী
সহজে সবুজে জীবিত হ'ত সে অবনী ॥

* * *

কিন্তু হায়রে জানি, এই যে বসুন্ধরা—
চক্ষে ইহার ছানি । অন্তরে ঘুণধরা ॥
বীর্য্যশুল্কা ইনি, বিক্রমে নেই উদ্ধার
বীরচরণে ঋণ, কাব্যের করে খুঁৎ বা'র ।
নিত্যই বিকি কিনি, কুসীদজীবী যে ভুত তার ;
মন নিয়ে ছিনিমিনি, জীবনেরে হানে ফুৎকার ।···
আমাদের নেই উদ্ধার । আমাদের নেই উদ্ধার ॥

* * *

যদি নাই থাকে মন্‌ভালো সব সঙ্গীতে বজ্র,
কোথা হ'তে আসে জমকালো কবিতাকুসুম অজস্র ?
তাই কি ভাষায় চমকালো রূঢ়ভাষণের বজ্র ?
মধ্য দিনের করুণাহীনের বিদ্যুৎবাহী বজ্র ?

* * *

জানি না, জানি না, তাই কিনা ! হয়তো ভেঙেছে মনোবীণা,
হয়তো থেমেছে ক্ষণিক সে সুর বেসুরে না হেনে মৃত্যুই ।—
চূড়াবিলাসের নিপুণতা ছেড়ে স্থূল কর্ম্মের ভিৎ ছুঁই !
ফলিত প্রাসাদে সুললিত ছাঁদে বাজে যাতে বীণা আজীবন,
হয়তো তাইতে মৃতবীণা ছেড়ে উজ্জীবনেই আজি পণ ॥

* * *

অতঃপর, জানি, ধৈর্য্যহীন এ-ব্যর্থতা হবে পদলীন ।
উন্নত ললাটে জয়টীকা দেবে নব জ্যোতিষ্কের শিখা ।
জীবনের কুহেলীমলিন এ অধ্যায়ে বসন্তের দিন ।
হানে যদি প্রাণে বিভীষিকা এ কর্কশ গান ততদিন,—
সে শুধুই জেনো ততদিন—ততদিন, শুধু ততদিন ।

সুবর্ণ আগুন

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

দাও ফিরে সে বিশ্বাস ।
খোলো আজ নীল যবনিকা ।
অনন্ত আশ্বাসভরা স্নিগ্ধছায়া, অরণ্য বাতাস
ভেসে এলো ।
তৃণগন্ধী দেহ তার, স্বচ্ছ স্নিগ্ধ অপূর্ব মধুর ।
হে আমার অধীশ্বর, নতজানু জীবনের ক্লিন্ন দিনান্তের
একখানি ম্লান হাসি, বৃথা গান, নীরব প্রার্থনা ।

তোমাকে দিয়েছি কবে জীবনে প্রথম চৈত্রমাস
স্বগন্ধের মর্মরের বসন্তের নবপুষ্পহারে।
বজ্র দিয়ে মালা গেঁথে সে কি তুমি প্রতিদান দিলে ?
নীলাভ দক্ষিণ ভুলে ?—কী দুর্জয় তোমার এ দান।

জীবনের হে ঈশ্বর! সে বিশ্বাস ফিরে দাও আজ।
অনেক করবীরঙা গোধূলির স্বর্বর্ণ-সঙ্গীতে
যদি ভুলে থাকি ;
কোনোদিন বসন্তবাতাস
বিভ্রম যদিবা আনে বিবর্ণ জন্মের—
হে ঈশ্বর ভুলে যেয়ো।
বিশ্বাসের প্রদীপ্ত পাহাড়
উত্তরের নির্মম বাতাসে শুধু তুলে দিও।

সৌখীন আকাশ শেষ।
জীবনের ভগ্নপাত্রে বিলাসের যে-স্বর্বর্ণ মদিরা
অতীতে করেছি পান বহুদিন,
তাকে দেখি মূল্যহীন ক্লেদাক্ত নালায়।
বৃথা আজ অশ্রুজল, বৃথা আজ সংগীতের অস্ফুট মর্মর।
ভঙ্গুর এ-দেহখানি তোমার প্রদীপ হয়ে যেন জ্বলে ওঠে,
দিনান্তের অন্ধকারে মুহূর্তেরও আলো যেন হয়।
কামনার শেষ আজ।
একমাত্র প্রার্থনা জানাই, আমার প্রার্থনা সে যে
দাও ফিরে সে বিশ্বাস, খোলো ওই নীল যবনিকা।

মেঘ-দুপুরে

অমল ঘোষ

ধূ ধূ করছে রাত দুপুর। হিমে আড়ষ্ট ডাকে কুকুর।
শূন্যভয় মর্ত্যময় থমথমিয়ে ঘুরচে।

হিম জ্যোছনায় পোড়োর মাঠ নির্জনতার বসায় হাট।
ঝিমরাতের এই কুঁড়েয় উই-পোকা কাঠ কুরচে।

দমকা হাওয়ায় তুলোর ঝড় গড়ছে প্রাসাদ ভাঙচে গড়
নৌকোতে কে আসচে আবার মাঝ সাগরে ভাসচে।

মেঘ-জড়ানো মাটির বন আদিম গুহার শূন্যমন,
খানিক কেমন থমকে থেমে খলখলিয়ে হাসচে।

ধূ ধূ করচে রাত অগাধ। প্রাণ দিগন্তে কোন বিষাদ।
মায়া-মলিন ছায়া-হরিণ চাঁদের বনে চরচে।

ছায়া অরণ্যে প্রাণ প্রাকার খোলে বিষণ্ণ মেঘ দুয়ার
ও কে ছায়ার, মেঘ পাথার! স্বপ্নেতে ঘট ভরচে!

যদিও

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

ঘড়িতে মিনিটেরা ঘোরে।
মনের ভীরু হাত লেগে যদিও ইতিহাস ওড়ে—
তারার চোখ আছে জেগে : যদিও ইতিহাস জ্বলে।

পৌষ, ১৩৪৯

যদিও ইতিহাস বলে :
ট্রামের লাইনের পাশে ঘাসেরা মৃত্যুই জানে,
তবুও চোখ তার হাসে আগামী সূর্যের টানে।

মাটিতে দুর্বল মানা ;
ঘাসেরা গুঁড়ি মেরে হাঁটে। রাতের মানসিক ডানা
ঘুমের ঘোরে হাওয়া কাটে। ঘুমের ফুল যায় ঝ'রে।

তারার পাথা কাঁপে জোরে।
বাতাসে আকাশের হাসি। জীবন ন'ড়ে ওঠে, ন'ড়ে
উঠেছে কারখানা ; চাষী খামারে আন্‌মনা ঘোরে।

অগস্ট, ১৯৪২

সমর সেন

ছানিপড়া চোখে
অন্ধকারে নীল বিদ্যুৎ চম্‌কায়।
শূন্যপেট ইতস্তত উদ্‌ভ্রান্ত মানুষ
চড়কের যন্ত্রণায় সান্ত্বনা চায়।
হয়ত হাওয়া বন্ধ ; এ-প্রান্তরের দিগ্বিদিকে
স্তূপীকৃত স্তম্ভিত বালুর উত্তাপে
আবহাওয়া লাল হয়, মধ্যদিনে সূর্য্য, মনে হয়
এক অতিকায় তৃষ্ণার্ত মহিষের চোখ
শূন্য থেকে একমনে জলাশয় খোঁজে,
ব্যর্থ নিঃশ্বাসে হাওয়ারা হঠাৎ দল বেঁধে চলে
ছিন্নপত্রে, বালুতে, পাথরে অনর্থক হিজিবিজি কেটে।
এ-প্রান্তর আমাদের উত্তরাধিকার।

'দুই বোন' ও 'মালঞ্চ'

'দুই বোন' ও 'মালঞ্চে' প্রথম দৃষ্টিতে অনেক সাদৃশ্য ধরা পড়ে। দুটি গল্পই ('দুই বোন'কে যদি বা উপন্যাস বলা চলে, 'মালঞ্চ' নিশ্চয়ই বড়ো ছোটোগল্পের পর্যায়ভুক্ত) রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন সত্তরের সীমা পেরিয়ে, দুয়ের মধ্যে রচনাকালের ব্যবধানও বেশি নয়। দুটিই 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় ; দুয়েরই বিষয় প্রায়-প্রৌঢ় বিবাহিত পুরুষের প্রাণে নবীন প্রণয়ের আবির্ভাব, এবং উভয় ক্ষেত্রেই খণ্ডিতা নায়িকা সন্তানহীনা ও কঠিন রোগশয্যাশায়িনী। প্রণয়পাত্রীও উভয় স্থলেই আত্মীয়া, 'দুই বোনে'র শশাঙ্কর মাথা ঘুরে গেলো যার সাহচর্যে সে তার স্ত্রীরই সহোদরা, আর 'মালঞ্চে'র আদিত্য আত্মহারা হ'লো তার দূর সম্পর্কের বোন সরলাকে কাছে পেয়ে। দুই গল্পেই এই কাছে-পাওয়াটা ঘটেছে স্ত্রীর পীড়াকে উপলক্ষ্য ক'রেই ; নীরজা অক্ষম হ'য়ে পড়েছে ব'লে সরলাকে আসতে হ'লো দাদার বাগানের— এবং কিছু-কিছু বৌঠাকরুনের—পরিচর্যা করতে ; এদিকে ঊর্মিমালাকে তার কঠোর অধ্যয়ন-তপস্যা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসা হ'লো দিদির সংসারের হাল ধরতে। প্রভেদের মধ্যে এইটুকু যে সরলা বাগানের কাজ ভালো জানে ব'লে তার আসাটা গল্পের ঘটনাবিন্যাসের দিক থেকে সংগত, কিন্তু সংসারের কাজে ঊর্মিমালা যে একেবারেই আনাড়ি তা পাঠক প্রথম থেকেই অনুমান করতে পারে, এবং সেটা প্রকাশ করতে লেখকেরও কোথাও কুণ্ঠা নেই। তাই যদি হয়, তাহ'লে ঊর্মিকে আদৌ আনা হ'লো কেন এ-প্রশ্ন পাঠকের মনে থেকেই যায়।

এ থেকে দেখা যাচ্ছে দুটি গল্পাংশ মূলত এক। 'দুই বোনে'র রচনা একটু বিস্তৃত, ঊর্মির পাণিপ্রার্থী নীরদ মাঝখানে এসে গল্পের স্রোতে একটু বিচিত্রতা এনেছে ; 'মালঞ্চ' অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, তাতে ত্রিভুজ-প্রণয়ের তিনটি কুশীলব ছাড়া আর-কোনো চরিত্রই প্রায় নেই—এইটুকু যা তফাৎ। অবশ্য দু'গল্পের শেষও দু'রকমের, রোগের—আর তার চেয়েও বেশি হৃদয়ের—যন্ত্রণা আর সইতে না-পেরে নীরজা সত্যিই গেলো ম'রে, এদিকে শর্মিলা মরতে-মরতেও শেষ পর্যন্ত সেরে উঠলো সন্ন্যেসির দৈব ওষুধে, ঊর্মি পালালো বিলেতে, ভাঙা সংসার আবার জোড়াতালি দিয়ে স্বামী-স্ত্রী যাত্রা করলে নেপালে। (কেউ-কেউ

হয়তো বাঁকা হেসে বলবেন, শেষটায় সন্নেসির ওষুধে ভালো হ'লো! তা ধ'রে নেয়া যাক শর্মিলা সেরে উঠলো আপন আয়ুর জোরেই, দৈব বড়ি উপলক্ষ্য মাত্র।) উপসংহার কোনোটিরই সুখের নয়—ম'রে যাওয়াটাই বড়ো দুঃখ, না কি বাকি জীবন ভ'রে স্বামীর ভাঙা হৃদয় শুশ্রূষা করবার অপমানটাই বেশি শোচনীয় তা জানিনা—আসল কথা এ-গল্পের শেষ সুখাবহ হ'তেই পারে না; স্বামী-স্ত্রীর শান্ত জীবনস্রোতে এ-বন্যা একবার যদি এসে পড়ে তাহ'লে বাকি জীবনের তটরেখাকেও তা ভাসিয়ে নিয়ে যায়—বন্যা কেটে গেলেও যা প'ড়ে থাকে তাতে পূর্বজীবনের শ্যামশ্রীর চিহ্ন আর থাকে না।

ভাবের দিক থেকে দেখতে গেলে, 'মালঞ্চ' 'দুই বোনের'ই চুম্বক। এ-কথা সত্য যে যে-কোনো বড়ো লেখকের যে-কোনো দুটি বইয়ে এতখানি সাদৃশ্য সাধারণত দেখা যায় না—বিশেষত রবীন্দ্রনাথ, যাঁর রচনায় বৈচিত্র্য অফুরন্ত, তিনি যে একই সময়ে একই বিষয় নিয়ে পর-পর দুটি গল্প লিখবেন এতে খানিকটা বিস্মিত হ'তেই হয়। বিবাহিত বয়স্ক পুরুষ অকস্মাৎ কোনো পরস্ত্রীতে আসক্ত হ'লে বিভিন্ন জীবনে ও সমগ্র সংসারে যে-বিপ্লব উপস্থিত হয়, সাহিত্যের উপাদান হিসেবে এইটে এ-সময়ে তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করছিলো এমন অনুমান করা অন্যায় হয় না। মনে হয় 'দুই বোন' লিখে ঠিক যেন তাঁর তৃপ্তি হয়নি; বিষয়টিকে আরো পরিষ্কার, আরো নির্মমভাবে প্রকাশ করবার ইচ্ছায় কয়েক মাসের মধ্যেই আবার তাঁকে 'মালঞ্চ' লিখতে হ'লো।

শোনা যায় পুরুষের জীবনের দুটি সময় বিপদসংকুল: যৌবনের আরম্ভ ও যৌবনের শেষ। চল্লিশ-পঞ্চাশের পাড়ায় পৌঁছিয়ে পুরুষের মন প্রায়ই নাকি স্খলনোন্মুখ হয়। প্রথম যৌবনে খানিকটা উচ্ছৃঙ্খলতার স্বাভাবিক প্রশ্রয় আছে, কেননা যৌবনেরই আছে সেই শক্তি যার প্রভাব অনেকটা ফেনা এবং খানিকটা ক্লেদ অনায়াসে পরিপাক ক'রে জীবন তার মৌল নির্মলতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে। বলা বাহুল্য, এ-শক্তি প্রৌঢ় বয়সে ক্ষীণ হ'য়ে আসে, তাই সে-বয়সে ছোটোখাটো স্খলনও ওঠে মারাত্মক হ'য়ে। কিন্তু যার ফল খারাপ তা যে জীবনে ঘটবে না তা তো নয়; বাস্তবিকপক্ষে, জীবনে তা তো প্রায়ই ঘটছে। এবং এইরকম কোনো সংঘাতের ধাক্কায় মানুষের মনের অনেক বিচিত্র ভাব ও ভঙ্গি, যা সাধারণ অবস্থায় গোপন থাকে, ঠেলে বেরিয়ে আসে ব'লে এই সংঘাত গল্প-লেখকের মনোমুগ্ধকর বিষয়। নিছক মনস্তত্ত্বের দিক থেকে এখানে প্রচুর উপাদান, মানুষের মনকে একেবারে খুলে দেখাবার এমন সুযোগ অন্যান্য বিষয়ে বিরল। এইজন্যই প্রণয়ত্রয়ীর গল্প এত পুরোনো

হ'য়েও পুরোনো হ'লো না, প্রতি যুগেই তা লেখকদের নতুন ক'রে আকর্ষণ করে।

বলা বাহুল্য, এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ 'দুই বোনে'ই প্রথম হাত দেননি। 'নষ্টনীড়', 'চোখের বালি' ও 'ঘরে-বাইরে' স্মরণীয়। অবিবাহিত তরুণ-তরুণী নিয়েও ত্রিভুজ-প্রণয়ের গল্প হয়, কিন্তু এটা লক্ষ্য করবার যে এ-ধরনের প্রত্যেক গল্পেই রবীন্দ্রনাথের কোনো নায়ক কিংবা নায়িকা বিবাহিত। 'নষ্টনীড়' ও 'চোখের বালি'র নায়ক-নায়িকা তরুণবয়স্ক, তাই তাদের প্রেমের উন্মীলনে ও ও পরিণতিতে নববসন্তের হাওয়া লেগেছে, সে-প্রেম যত দুঃখের ততই মধুর। 'How sad and bad and mad it was—But then, how it was sweet!' এ-প্রেম সম্বন্ধে এই হ'লো শেষ কথা। বিনোদিনীর হৃদয়-বিদারক ব্যর্থতা সত্ত্বেও 'চোখের বালি'র উজ্জ্বলতা তাই আজও অম্লান। সন্দীপ-বিমলা-নিখিলেশ অপেক্ষাকৃত বয়স্ক, তাই 'ঘরে-বাইরে'তে এ-মধুরতা নেই, থাকবার কথাও নয়। সেখানে প্রথম থেকেই আছে আসন্ন সর্বনাশের ভয়াবহ ইঙ্গিত, যদিও সে-সর্বনাশ রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে গেলেন—সন্দীপের প্রতি অবিচার ক'রে। অবিচার এই হিসেবে যে শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো সন্দীপ নিতান্তই একটা নীচ ও ইতর প্রকৃতির মানুষ। নিখিলেশের পাশে সে দাঁড়াতেই পারে না। সন্দীপকে প্রথমে যা মনে হয় সে যদি সত্যি-সত্যি তা-ই হ'তো—তেজস্বী, নির্ভীক, কামনার বলিষ্ঠতায় দীপ্তিমান, তাহ'লে রবীন্দ্রনাথ কী করতেন? কেমন ক'রে বাঁচাতেন বিমলাকে? 'ঘরে বাইরে'র সমস্ত সৌন্দর্য্য সত্ত্বেও এই একটু অতৃপ্তি আমাদের মনকে পীড়া দেয় তা স্বীকার না-ক'রে পারিনে। মন কেবলই বলে, বিমলার সত্য পরীক্ষা তো হ'লো না, লেখক তাকে ফাঁকি দিয়ে জিতিয়ে দিলেন।

'ঘরে-বাইরে'র এই দুর্বলতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজে সচেতন ছিলেন না তা বিশ্বাস করা শক্ত। হয়তো তারই স্খালনস্বরূপ প্রথমে 'দুই বোন' ও পরে 'মালঞ্চ' লিখলেন। তবে এখানে স্খলনোন্মুখ হ'লো মেয়ে নয়, পুরুষ; কেননা পুরুষের জীবনেই সমস্ত শুভবুদ্ধি ছাপিয়ে প্রবৃত্তির জয় হওয়া বেশি স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ কি মনে-মনে ভেবেই নিয়েছিলেন যে এবারে শাস্ত্রনীতির উপরে ধর্মনীতিকে নিঃসংশয়ে জয়ী করবেন? হয়তো তা-ই, কিন্তু 'দুই বোনে' শেষ পর্যন্ত শর্মিলার উপর মমতা হ'লো, তাকে বাঁচিয়ে তুললেন, শশাঙ্ককে যাহোক্ ক'রে বাঁচিয়ে দিলেন—অন্তত আপাতদৃষ্টিতে। 'মালঞ্চে' দেখতে পাই তাঁর কঠোর প্রতিজ্ঞা—কারো 'পরেই মায়া করবেন না, কামনার প্রচণ্ড স্বার্থপরতাকে দৃঢ়চিত্তে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ ক'রে যাবেন।

তারই ফলে 'মালঞ্চে'র অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুরতা। এত নিষ্ঠুর বই রবীন্দ্রনাথের মতো সর্বানুকম্পায়ী লেখক কেমন ক'রে লিখতে পারলেন, রবীন্দ্র-সাহিত্য-আলোচনার এটা একটা সমস্যা হ'য়ে রইলো।

এ-কথা বলা সহজ যে লেখক জীবনেরই লিপিকার, জীবন যদি নিষ্ঠুর হয় তিনি কী করতে পারেন? শাস্ত্রনীতির উপর ধর্মনীতির শ্রেষ্ঠতা সহস্রবার মানি, কিন্তু যেখানে আপন ধর্ম, অর্থাৎ আপন হৃদয়বৃত্তির অনস্বীকার্য প্রেরণা সম্পূর্ণ স্বীকার করতে হ'লে অন্য-একজনকে (কিংবা অনেককে) দারুণ দুঃখ দিতে হয় সেখানে কোনটা শাস্ত্রনীতি আর কোনটা ধর্মনীতি তা-ই বা কেমন ক'রে বুঝবো? আমার জীবনের পূর্ণতাসাধনে বাধা দেবার অধিকার যেমন শাস্ত্রের বা সমাজের নেই, তেমনি আমারও অধিকার নেই অন্যের জীবনকে সমূলে উৎপাটিত করবার। কোন নীতি অনুসারে এটা নিঃসংশয়ে জানবো যে আমি এতই মূল্যবান যে আমার পূর্ণতার জন্য অনেকে অনেক দুঃখ পেলেও কিছু এসে যায় না? তাদের দুঃখের ক্ষতিপূরণ করবে আমার সার্থকতা এ-বিচিত্র যুক্তি কোনো সচেতন মনই তো মানতে পারে না। সেইজন্য দাম্পত্য জীবনে যখন বাইরের কোনো আঘাতে ভাঙন ধরে, তার দুঃখ তার দ্বন্দ্ব অত্যন্ত জটিল ও বহুদূরপ্রসারী, তার তাৎপর্য ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক, এবং এই কারণেই এই বিষয় নিয়ে গল্প লিখতে গেলে কোনো পক্ষকেই নিঃসংশয়ে জিতিয়ে দেয়া বিবেকবান লেখকের পক্ষে সম্ভব হয় না। শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে মানুষের হৃদয়কে যেমন চাপা দিতে পারিনে, শুদ্ধ হৃদয়বৃত্তির খাতিরে কোনো-একজন মানুষেরও দুঃখভোগ স্বীকার ক'রে নেয়া তেমনি অসম্ভব।

অবশ্য দুঃখভোগীর সংখ্যা রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই যথাসম্ভব কমিয়ে নিয়েছেন। ছেলেপুলে থাকলে সমস্যা অত্যন্ত জটিল হ'য়ে ওঠে, তাই শর্মিলা নীরজা দু'জনেই নিঃসন্তান। আত্মীয়-বন্ধু, অর্থাৎ সামাজিক পরিবেষের আভাসমাত্র নেই। বাস্তবজীবনে এ-রকম একটি ঘটনা শুধু প্রণয়ীত্রয়ের জীবনে নয়, চারদিকের অনেকগুলি মানুষের জীবনেই ছায়াপাত করে, দুঃসহ দুঃখ পায় হয়তো দু'একজন, অসুখী হয় অনেকেই। কিন্তু আলোচ্য দুটি বইতেই প্রধান পাত্র-পাত্রী বৃহৎ সমাজ-জীবন থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন, সংকীর্ণ একটি গৃহের সীমানার মধ্যেই এ-দুরন্ত প্রণয়লীলার আরম্ভ ও সমাপ্তি। 'দুই বোনে' যেটুকু ব্যাপ্তি আছে, 'মালঞ্চে' তাও নেই; 'মালঞ্চ' যেন 'দুই বোনে'র নির্যাস, এই বহুদ্বন্দ্ববিজড়িত বৃহৎ সমস্যাটিকে তার সংক্ষিপ্ততম বিশুদ্ধতম সার-বস্তুতে ছেঁকে নেবার চেষ্টা। সাহিত্যরূপের একটি অভিনব পরীক্ষা হিসেবে 'মালঞ্চ' উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নেই; প্রত্যেক পাঠকই লক্ষ্য করবেন যে এটি নামে

উপন্যাস হ'লেও আসলে নাটক, প্রায় আগাগোড়াই কথোপকথনে লেখা এবং এর মেজাজে নাটকীয় অনাসক্তি সম্পূর্ণ বিদ্যমান। পাত্রপাত্রীর মনের কথা রবীন্দ্রনাথ কিছুই বলেননি; তিনি যেন তা জানেনই না; শুধু তাদের মুখের কথায় যেটুকু প্রকাশ পায় তারই ভিতর দিয়ে এই মস্ত ব্যাপারটিকে ফুটিয়ে তোলা তাঁর চেষ্টা। খুব সম্ভব গল্পটি নাটকের রূপেই তাঁর মনে এসেছিলো—'রচনাবলী'র 'গ্রন্থপরিচয়' থেকে জানা গেলো যে 'মালঞ্চ'কে সম্পূর্ণ নাট্যরূপ তিনি দিয়েওছিলেন এবং তার পাণ্ডুলিপি শান্তিনিকেতনে রক্ষিত আছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে 'মালঞ্চে'র পরের (এবং রবীন্দ্রনাথের শেষ) উপন্যাস 'চার অধ্যায়'ও অবিকল নাটকীয় রীতিতে লেখা, স্বল্পমাত্র পরিবর্তন ক'রে তাকে রীতিমতো অভিনয়যোগ্য নাটকে পরিণত করা যায়।

আমার কাছে 'মালঞ্চ' কেন অবিশ্বাস্যরকম নিষ্ঠুর লাগলো সে-কথা এখন বলি। শিল্পী নিরপেক্ষ হবেন তাঁর 'পরে এই আমাদের একটি মৌল দাবি; প্রতি চরিত্রকে তার নিজের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখবেন, যাকে ভালোবাসেন না তাকেও পরিপূর্ণ ক'রে ফোটাবেন। এ থেকে বিচ্যুতি দেখলেই আমাদের মন প্রতিবাদ জানায়। বিনোদিনীর প্রতি রবীন্দ্রনাথ সুবিচার করতে পারেননি—খুব সম্ভব সামাজিক অনুশাসন তাঁর হাত চেপে ধরেছিলো; এদিকে নীরজার প্রতিও ঘোর অবিচারে আমাদের মন প্রতি মুহূর্তে ক্লিষ্ট হ'য়ে ওঠে—আর এ-অবিচারের পিছনে কোনো রীতিরক্ষার তাগিদ পর্যন্ত নেই। মুমূর্ষু নীরজাই যেন অপরাধী, আদিত্য আর সরলাই অনুকম্পার পাত্র, এইরকম একটি ভাব গল্পের আগাগোড়া কখনো প্রচ্ছন্ন, কখনো পরিস্ফুট। অথচ দাক্ষিণ্যের এই অসমান বিতরণে পাঠকের বিবেক কখনোই সায় দিতে পারে না, কারণ নীরজা যে সম্পূর্ণ নিরপরাধ তা তো স্পষ্ট। আদিত্যের সঙ্গে তার দশ বছরের বিবাহিত জীবনে ছিলো উভয়পক্ষের পরিপূর্ণ সুখ, তাতে কোনো সংশয়ের ছায়ামাত্র ছিলো এমন আভাস কোনোখানেই পাওয়া যায় না। স্বামীর জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনকে সে এক ক'রে দিয়েছিলো, স্বামীর যেটি একাধারে আনন্দ ও উপজীবিকা, সেই বাগানটিকে আপন প্রতিভা দিয়ে বিকশিত করাই ছিলো তার জীবনসাধনা। এই পূর্ণমিলনে কোনো এক পক্ষের দীর্ঘ রোগভোগ চিড় ধরাতে পারে না তা বলিনে, কিন্তু তার জন্য যে-বিরাট পটভূমিকা দরকার, যে-ভাবে একটু-একটু ক'রে এই ট্র্যাজেডির জন্য পাঠকের মনকে প্রস্তুত করে তুললে তবে তা বিশ্বাসযোগ্য হয়, 'মালঞ্চে' তার কিছুই নেই। এখানে আদিত্য অকস্মাৎ রুগ্না স্ত্রীর প্রতি বিমুখ হ'য়ে সরলার বাহুবন্ধনে ধরা দিতে এগিয়ে এলো—এতদিনের পরিপূর্ণ বিবাহিত জীবনের পর সে হঠাৎ

আবিষ্কার করলো যে তার বাল্যসঙ্গিনী সরলাই তার যথার্থ প্রণয়পাত্রী, এবং তার সঙ্গে মিলনেই তার জীবনের সার্থকতা। সরলাও সঙ্গোপনে তার আদিত-দা'কেই ভালোবাসতো, এবং তারই জন্য তার কৌমার্যবরণ, এমন আভাসও আছে। এর কোনোটাই অসম্ভব হয়তো নয়—জীবনে সবই হ'তে পারে—কিন্তু ঘটনার যতখানি বিস্তৃতি, চরিত্রের যতখানি সযত্ন ক্রমবিকাশ থাকলে এ-কাহিনী সাহিত্যে বিশ্বাসযোগ্য হ'তে পারে, 'মালঞ্চে' তা কোথায়? এখানে সবই আকস্মিক, ঝোঁকে-ঝোঁকে গল্প এগিয়ে চলেছে, চারদিকের তরঙ্গ-সংঘাত থেকে প্রবালদ্বীপের মতো গ'ড়ে উঠছে না। প্রতি পাতায় পাঠকের মনে মস্ত একটা প্রশ্নচিহ্ন থেকে যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের ভাষার অপরূপ কারিগরিও আমাদের অবিশ্বাসকে ঘুম পাড়াতে পারছে না। রমেন নামে যে-একটি যুবকের ছায়া এখানে দেখতে পাই, শোনা যাচ্ছে সে সরলার প্রণয়লোভী, কিন্তু আসলে সে নীরজাকে কথা-কওয়াবার কল মাত্র, তার কথাবার্তা থেকে শুরু ক'রে সরলাকে সঙ্গে নিয়ে খামকা জেলে যাওয়া পর্যন্ত সবই কেমন যেন অস্পষ্ট, কুয়াশাচ্ছন্ন—কোনোখানেই তাকে বাস্তব ব'লে বোধ হয় না। সবচেয়ে দুঃসহ বোধ হয় যখন সে শয্যালীনা নীরজাকে দানের মহিমা সম্বন্ধে বড়ো-বড়ো উপদেশ দিচ্ছে—'যা নিজে ভোগ করতে পারবে না, তাও প্রসন্ন মনে দান করতে পার না যাকে এতদিন এত দিয়েছ?'—ভুলে যাচ্ছে যে নীরজার এই দানের গ্রহীতা হবে আদিত্য নয়, সরলা, এবং সরলাকে নীরজা তার জীবনসর্বস্ব হাসিমুখে দান করবে এ-প্রত্যাশা অমানুষিক। নিজের গৃহ থেকে, নিজের সংসারকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে রোগশয্যায় প'ড়ে থাকার দুঃখ নীরজার—কি শর্মিলার—মতো মেয়ের পক্ষে রোগযন্ত্রণার চেয়েও মারাত্মক, এবং এ-অবস্থায় তার কর্মভার অন্য-কোনো মেয়েতে ন্যস্ত হ'তে দেখলে ঈর্ষার উদ্রেক সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও ক্ষমার যোগ্য। তার উপর যদি সেই মেয়ে স্বামীর হৃদয়দেশও অধিকার ক'রে বসে, তখন যে-মেয়ে মরতে-মরতেও ঈর্ষায় জ্ব'লে না উঠবে, সে কি মানুষ! এই ঈর্ষার একটি তীব্র জ্বলন্ত রূপ আছে সাহিত্যে যা যথার্থরূপে প্রকাশযোগ্য, কিন্তু নীরজার ঈর্ষা যেন শুধুই তার অন্তরের কৃপণতা এমনকি হীনতাপ্রসূত, এই ইঙ্গিতই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। আদিত্য আর রমেশ ভাগাভাগি ক'রে তাকে দানধর্মে দীক্ষিত করবার ভার নিয়েছে, দাও, সব দিয়ে দাও, উদার হও, হৎ হও,—অথচ যে-দুঃখে নীরজার বুক পুড়ে খাক হ'য়ে যাচ্ছে, তার সম্বন্ধে কোনো বোধ, কোনো অনুকম্পা কোনোখানেই নেই। পড়তে-পড়তে অবাক হ'য়ে ভাবি, আর কত? কিন্তু আরো আছে। আদিত্য, রমেন, সরলা এরা

তিন জনে ধ'রেই নিচ্ছে যে নীরজা দু'দিন পরেই ম'রে যাবে, এমনকি তার সামনেও সে-কথা গোপন করছে না। রমেন আদিত্যকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছে —'আর ক'টা দিন পরেই তো এই পরম দুঃখের জটা আপনিই এলিয়ে যাবে। তুমি তা নিয়ে মিথ্যে টানাটানি ক'রো না।' কথাটার মানে এইরকম দাঁড়ায় —'বৌদি ম'রে গেলেই তো তুমি মুক্ত, তার বেশি দেরিও নেই। এ-ক'টা দিন ভদ্রভাবে ধৈর্য ধ'রে থাকো।' এর চেয়েও নিষ্ঠুর কথা বলছে সরলা আদিত্যের সঙ্গে তার নিভৃত আলাপে: 'শুনেইছ ডাক্তার বলেছেন বেশিদিন ওঁর সময় নেই। এইটুকুর মধ্যে ওঁর মনের কাঁটা তোমাকে উপড়ে দিতেই হবে। এই কয়দিনের মধ্যে আমার ছায়া কিছুতেই পড়তে দিয়ো না ওঁর জীবনে।' সরলার এই ঠাণ্ডা দয়ার চাইতে অকপট প্রতিদ্বন্দ্বিতার মার অনেক ভালো ছিলো। কিন্তু সবচেয়ে হৃদয়হীন, সবচেয়ে অবিশ্বাস্য কথা বেরিয়েছে আদিত্যেরই মুখ দিয়ে। নিজের আসন্ন মৃত্যু উপলব্ধি ক'রে নীরজা যখন ব্যাকুলভাবে আদিত্যের হাত চেপে ধ'রে বলছে: 'একেবারেই থাকব না, কিচ্ছুই থাকব না? বলো আমাকে, তুমি তো অনেক বই পড়েছ, বলো না আমাকে সত্যি ক'রে—'তখন আদিত্য কেমন ক'রে ইস্কুলমাস্টারের মতো গম্ভীরস্বরে বলতে পারলে—'যাদের বই পড়েছি তাদের বিদ্যে যতদূর আমারও ততদূর। যমের দরজার কাছটাতে এসে থেমেছি আর এগোইনি!' তার চোখে জল এলো না, গলা কেঁপে গেলো না—মিথ্যে ক'রেও বললে না নীরজাকে যে সে সেরে উঠবে, ভদ্রতা ক'রেও একবার বললে না—এ-সব কী ছাইভস্ম ভাবছো! ধ'রে নিলুম সরলার মোহের উত্তাপে নীরজার প্রতি আদিত্যের ভালোবাসার স্রোত সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেছে (যদিও সেটা ধ'রে নেয়া শক্ত), তবু—ভালোবাসা না থাক, মনুষ্যধর্ম তো আছে—মনের কথা কি সব সময়ই মুখে বলা যায়, কখনো-কখনো কপটতাই কি মনুষ্যত্বের শেষ আশ্রয় হয় না? শেষ পর্যন্ত পাঠকের মনে এ-কথাটাই স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে যে নীরজা—সেই নীরজা, যার সঙ্গে আদিত্যের দশ বছরের অবিমিশ্র সুখের বিবাহিত জীবন, যাকে সে শত ব্যস্ততার মধ্যেও রোজ সকালে এক গুচ্ছ ফুল পাঠাতে ভোলেনি, যার সঙ্গে 'ভোরবেলাকার গাছতলায় দারজিলিং চায়ের বাষ্পে-মেশা নানা ঋতুর গন্ধস্মৃতি'-বিজড়িত কত 'সোনার রঙে রঙিন দিন' সে কাটিয়েছে—সে ম'রে গেলেই যেন সে বাঁচে, তারপর সরলাকে বিয়ে ক'রে নিশ্চিন্ত হ'তে পারে। নীরজা মরলো, মুক্তি দিলো এদের, কিন্তু তার মৃত্যুতেও তার স্রষ্টা তাকে করুণা করেননি, সে-দৃশ্যটি এঁকেছেন বীভৎসরসে পিঙ্গল রঙে ছুপিয়ে—শেষ মুহূর্তেও সে উদার হ'তে

পারলে না, পারলে না ত্যাগ করতে, সরলার হাত চেপে ধ'রে বললে—'জায়গা হবে না তোর রাক্ষসী, জায়গা হবে না। আমি থাকব, থাকব থাকব।' তারপর :

> হঠাৎ ঢিলে শেমিজ-পরা পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণমূর্তি বিছানা ছেড়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। অদ্ভুত গলায় বললে, "পালা পালা পালা এখনই, নইলে দিনে দিনে শেল বিঁধব তোর বুকে, শুকিয়ে ফেলব তোর রক্ত।" বলেই পড়ে গেল মেঝের উপর।

এই অন্তিম দৃশ্যটিতে ট্র্যাজিডির মহিমা লাগতে পারতো, কিন্তু তা লাগেনি কারণ নীরজার 'পরে লেখকের অনুকম্পা নেই। নীরজার এই স্বাধিকার-উন্মত্তা প্রেতিনী-মূর্তি আমাদের মনে ভয়মিশ্রিত ঘৃণার সঞ্চার করে, তার জন্য ভালো ক'রে দুঃখবোধ করবার অবসর হয় না। অন্যপক্ষে আদিত্য-সরলার প্রতিও আমাদের মন প্রসন্ন হ'তে পারে না—ফলে একটা বিবর্ণ ধূসর নীরস বেদনা-বোধই হয় 'মালঞ্চ' প'ড়ে ওঠবার পুরস্কার। কিন্তু যে-গল্প যথার্থ ট্র্যাজিক তার কাছে আমাদের পাওনা শুধু যে অনেক বেশি তা নয়, তার জাতই আলাদা। 'Jude the Obscure'-এর শেষ দৃশ্য মনে করা যাক। জুড মরেছে, সেই সময়েই অক্সফোর্ডের বিদ্যালয়ে এক ধনীনন্দনকে অনরারি ডিগ্রিদানের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হচ্ছে—গম্ভীর ল্যাটিন বাক্যগুলির অস্পষ্ট আওয়াজ এসে লাগছে মুমূর্ষুর কানে—এদিকে পাশের ঘরে তার স্ত্রী ডাক্তারের সঙ্গে চালাচ্ছে নবতম প্রণয়লীলা। পড়তে-পড়তে আমাদের বুক ভেঙে যায়, যে-দুঃখ আমার নয় তবু আমার, যে-দুঃখ কারোরই নয় অথচ বিশ্বের—সেই দুঃখের তীব্র আঘাতে মন বিশুদ্ধ হয়, পৃথিবীকে নতুন ক'রে চিনতে শিখি, আর এমন-একটি অভিজ্ঞতা অর্জন করি যার ছাপ মন থেকে সহজে মুছে যায় না। এ-ধরনের অভিজ্ঞতা থেকে 'মালঞ্চ' হয়তো আমাদের বঞ্চিত করতো না, যদি নীরজার প্রতি রবীন্দ্রনাথের সে-অনুকম্পার কিছু অংশও থাকতো, যে-অনুকম্পা নিয়ে হার্ডি তাঁর জুডকে সৃষ্টি করেছেন। নীরজাকে রবীন্দ্রনাথ ভালোবাসেননি, তাই তার মধ্যে যা সত্য সেটা অপ্রকাশিত রইলো।

বলা বাহুল্য আমার আপত্তি নৈতিক কিংবা সামাজিক নয়, আমার আপত্তি সাহিত্যিক। অর্থাৎ আদিত্য-সরলার প্রেমের মনস্তত্ত্ব ঠিক যেন বিশ্বাসযোগ্য হ'য়ে ওঠেনি। আবার বলি—গল্পের সংকীর্ণ পরিসরই তার কারণ, অন্তত প্রধান কারণ। এ-ধরনের বিষয় স্বভাবতই বিস্তৃত অনুলিপির অপেক্ষা রাখে, ছোটো জায়গায় ঠাসতে গেলে কিছু অসঙ্গতি দেখা দেবেই। আদিত্যের নিষ্ঠুরতা আমাদের যে অবিশ্বাস্য বোধ হয় তার কারণ সেটা নিতান্তই আকস্মিক, তার অতীত ইতিহাসের সঙ্গে তার কোনো পারম্পর্য নেই, ব্যাপারটা হ'য়ে

উঠেছে অ-মানুষিক, মনে হয় রবীন্দ্রনাথ জোর ক'রে এটা ঘটিয়ে দিচ্ছেন। স্রষ্টার যে-সত্যদৃষ্টির আশ্রয়ে একটি গল্প আমরা আগাগোড়া মন্ত্রমুগ্ধের মতো প'ড়ে যাই এখানে যেন তারই অভাব, মনে হয় এখানে রবীন্দ্রনাথ যেন তাঁর নিজের প্রকৃতিরই বিরুদ্ধাচরণ করেছেন, তাঁর মন যা চায়নি, তাঁর কলম তা-ই লিখেছে।

'দুই বোনে' সঙ্গতিরক্ষার শাসন অনেকটা বেশি হ'লেও আকস্মিকতা থেকে 'দুই বোন'-ও মুক্ত নয়। দুটি গল্পেরই রূপকল্প কেমন ঢিলেঢোলা খাপছাড়া গোছের (বস্তুত এ-লক্ষণ 'শেষের কবিতা' থেকেই আরম্ভ হয়েছে), কিছু-কিছু অসংলগ্নতাকে রবীন্দ্রনাথ অনায়াসে জায়গা দিয়েছেন, কোনো-কোনো অংশে আছে মেলোড্রামার আভাস (এটি আরো স্পষ্ট হয়েছে 'চার অধ্যায়ে')। শ্যালিকার সঙ্গে শশাঙ্কের ভালোবাসা জ'মে উঠছে বড়ো বেশি সহজে—যেন কারুরই বিবেকবুদ্ধির কোনো পিছু-টান নেই—অথচ সেটা শশাঙ্কর শুধু নয়, ঊর্মিরও থাকতে বাধ্য, কারণ, হাজার হোক, শর্মিলা তারই আপন বোন, তার উপর সাংঘাতিক পীড়িত। এ-অবস্থায় শুধু যে বাইরের জগতের সঙ্গে সংঘাত অনিবার্য তা নয়, নিজেরই অন্তর গভীর দ্বন্দ্বে বিক্ষত হ'তে থাকে এবং সেই দ্বন্দ্বই গল্পলেখকের প্রধান উপাদান। 'দুই বোনে' এই দ্বন্দ্ব যথাযথরূপে চিত্রিত হ'লে গল্পের আন্তরিক রস আরো গাঢ় হ'তে পারতো। কিন্তু তা হয়নি ; শশাঙ্কনিজের আচরণের সমর্থন খুঁজে পেয়েছে অতি সহজেই :

> অবশেষে একদিন শশাঙ্ক বাগানে সূর্যামুখী কী-রকম ফুটেছে দেখতে দেখতে হঠাৎ ঊর্মির হাত চেপে ধরে বললে, "তুমি নিশ্চয় জান, তোমাকে আমি ভালোবাসি। আর তোমার দিদি, তিনি তো দেবী। তাঁকে যত ভক্তি করি জীবনে আর কাউকে তেমন করিনে। তিনি পৃথিবীর মানুষ নন, তিনি আমাদের অনেক উপরে।"

স্ত্রীকে দেবীর আসনে বসিয়ে ভক্তি-ভরে দূরে সরিয়ে রাখা, আর সেই সঙ্গে অন্য নারীর ভালোবাসায় মগ্ন হওয়া, এ-ব্যবস্থা অত্যন্তই সুবিধাজনক তাতে সন্দেহ কী। যদি এ-ব্যবস্থা চলতো তাহ'লে পৃথিবীর অনেক লোকই শ্যাম এবং কুল একসঙ্গে রক্ষা করতে পারতো, এত দুঃখ পেতে হ'তো না, দিতে হ'তো না। কিন্তু কার্যত দেখা যায় শ্যাম কিম্বা কুল কোনো-এক পক্ষকে ছাড়তেই হয়, দু'নৌকোয় পা রেখে চলা যায় না। দু'দিক বজায় রেখে চলবার এই যে ইচ্ছা, কেকটাকে খাবো, আবার পাবোও, এই যে মনোভাব—এটা মানসিক দুর্বলতারই পরিচয়, প্রকৃতপক্ষে এটাই সেন্টিমেণ্টাল। এই ভাবালুতায় অমিত রায় অপরাধী যখন সে যতিশঙ্করের কাছে তার মিলনতত্ত্বের ব্যাখ্যা করছে—কেতকী তার ঘড়ায় তোলা ব্যবহারের জল, আর লাবণ্য তার মনের সাঁতার

কাটবার দিঘি, এই ধরনের সব কথা। যতিশঙ্কর চমৎকার সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলো যখন সে বলেছিলো, 'কিন্তু অমিত-দা, দুটোর মধ্যে একটাকেই কি বেছে নিতে হয় না?' কিন্তু অমিতর আশ্চর্য ভাষাপ্রপাতের মুখে বেচারার প্রতিবাদ টেঁকেনি। তবে এ-কথা সত্য যে বাস্তব জীবনে দুটোর মধ্যে একটাকেই বেছে নিতে হয়, তা ছাড়া উপায় নেই। শশাঙ্কর এই দু'দিক বজায় রেখে চলবার ইচ্ছাটা ভাবালুতা মাত্র; স্ত্রীর প্রতি তার এত তো ভক্তি, অথচ উর্মিকে নিয়ে সে যখন মোটরে স্টীমার ভ্রাম্যমাণ, সেই একই সময়ে শর্মিলা যে কঠিন রোগে শয্যাশায়ী সে-বিষয়ে সে কিংবা উর্মি কারোরই মনে বিশেষ উদ্বেগ আছে ব'লে মনে হয় না। দিন-রাতের জন্য দু'জন নর্স রেখে দিয়েই ওরা যেন নিশ্চিন্ত। প্রেমের আত্ম-বিস্মৃতি স্বীকার ক'রে নিয়েও এটা কি একটু অস্বাভাবিক নয়? এ-রকম অবস্থায় যে-কঠিন আত্ম-বিরোধে মানুষ উদ্ভ্রান্ত হ'য়ে পড়ে, তার যথেষ্ট আভাস কি এখানে আছে? বরং শশাঙ্কের ভাবালুতাকে রবীন্দ্রনাথ এতটা প্রশ্রয় দিয়েছেন যে শর্মিলাকে প্রায় সত্যি-সত্যি দেবী বানিয়ে তুলেছিলেন। তার অবস্থা যখন খারাপ সে স্বামীকে ডেকে বললে, '.....উর্মিকে দিয়ে গেলুম তোমার হাতে। সে আমার আপন বোন। তার মধ্যে আমাকেই পাবে, আরও অনেক বেশি পাবে যা আমার মধ্যে পাওনি। না, চুপ করো, কিছু ব'লো না। মরবার কালেই আমার সৌভাগ্য পূর্ণ হল তোমাকে সুখী করতে পারলুম।' অর্থাৎ—আমি ম'রে গেলে উর্মিকে বিয়ে কোরো। সুখী হও।' অন্য-কোনো লেখকের নয়, রবীন্দ্রনাথের কোনো নায়িকা যখন এইরকম কথা বলে তখন কী বলবো ভেবে পাইনে। বিমূঢ় হ'তে হয়।

যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ শেষ বাঁচিয়ে দিয়েছেন। শর্মিলা সেরে উঠলো, উর্মি গেলো পালিয়ে। শশাঙ্ক তার নষ্ট ব্যবসার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা না-ক'রে আবার চাকরি নিয়ে চললো নেপালে। মনে করা যেতে পারে সেখানে গিয়ে সে স্ত্রীকে নিয়ে নতুন করে সংসার পেতেছে, এবং ভালোই আছে—অন্তত আপাতদৃষ্টিতে।

তবে এ-কথা সত্য যে 'মালঞ্চে'র মতো অবিশ্বাস্য 'দুই বোন' কোনোখানেই নয়। আদিত্য-সরলার প্রণয়োদ্গম একেবারেই অপ্রত্যাশিত, জাদুকর যেন আমাদের চোখের সামনে আমের চারা পুঁতে মন্ত্র প'ড়ে সেটিকে বড়ো ক'রে তুলে আম সুদ্ধু ফলিয়ে দিলেন। কিন্তু শশাঙ্ক-উর্মিলার ভালোবাসার ক্ষেত্র রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই প্রস্তুত করছেন সেটা লক্ষ্য করতে হবে। শর্মিলা মায়ের জাতের মেয়ে, আর উর্মিলা প্রিয়ার জাতের। (এ-দুই জাতকে একেবারে পৃথক ক'রে নেয়া অবশ্য যায় না, তবে কোনো-কোনো মেয়ের মধ্যে কোনো-

একটা দিকের প্রাধান্য থাকে সে-কথা ঠিক।) স্ত্রীর অতিলালনে আর লম্বা মাইনের সরকারি চাকুরির অতি-আরামে শশাঙ্কের পৌরুষ অনেকখানি চাপা প'ড়ে গেছে। ধ'রে নেয়া যেতে পারে যে তার স্ত্রী যদিও অত ভালো—কিংবা অত ভালো বলেই—তার অন্তরের প্রেমের আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ মেটেনি, তা যে মেটেনি তা সে জানেও না। বেশ কাটছিলো দিন, হঠাৎ তার প্রতি কর্তৃপক্ষের কোনো-একটা অবিচারের প্রতিবাদে সে চাকরি দিলে ছেড়ে। ছাড়লে শর্মিলারই প্ররোচনায়, তার নিজের মধ্যে অত তেজ ছিল না। তারপর কলকাতায় এসে ব্যবসা ধরলে, প্রাণ দিয়ে লাগলো নিজের ভাগ্য গ'ড়ে তোলার কাজে, এবং অল্পকালের মধ্যে লাভ করলে অসামান্য সফলতা। মনু-ভোলা, গো-বেচারা গোছের চাকুরে শশাঙ্ক ব্যবসায়ে নামবার পর কেমন শক্ত সমর্থ সম্পূর্ণ পুরুষমানুষ হ'য়ে উঠলো, এই পরিবর্তনটি অল্প পরিসরের মধ্যে আশ্চর্য নৈপুণ্যের সহিত রবীন্দ্রনাথ ফুটিয়েছেন; আমার বিবেচনায় এইটুকুই 'দুই বোনে'র শ্রেষ্ঠ অংশ। শশাঙ্কর যেন জন্মান্তর হ'লো, ভাগ্যের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষা করতে গিয়ে তার সুপ্ত পৌরুষ উঠলো জেগে—শর্মিলা নিজেই অবাক হ'য়ে গেলো, তার খুব ভালোও হয়তো লাগলো না, কিন্তু কিছু বললে না, পাছে কাজের ক্ষতি হয়।

এদিকে উর্মিকে নিষ্ঠুর ভাগ্য বেঁধে দিয়েছে নীরদের সঙ্গে, যে আস্ত একটি প্রিগ্‌। প্রথম থেকেই বোঝা যায় যে নীরদকে সে ভালোবাসে না, বাসতে পারে না। তার মনে তখন পর্যন্ত 'ভালোবাসা পরিণত হয়নি, কিন্তু ভালোবাসার ইচ্ছেটাই......মৃদুমন্দ বসন্তের হাওয়ার মতো মনের মধ্যে ঘুরে' বেড়াচ্ছে। সে প্রস্তুত, উপযুক্ত পাত্র কেউ এসে পড়লেই হয়। হাস্যে পরিহাসে, খেলাধূলায়, গল্পে গুজবে ভগ্নীপতির সঙ্গে তার নানা জায়গায় মেলে। শশাঙ্ককে সে মনে-মনে পছন্দই করে, শশাঙ্কও শ্যালিকার অনুরাগী। সে-অনুরাগ এতদিন ছিলো অনেকটা প্রচলিত প্রথার আচ্ছাদনে ঢাকা, কিন্তু তার নব-জাগ্রত পৌরুষ সে-আচ্ছাদন ছিঁড়ে ফেলতে পারে সুযোগ পেলেই। সে-সুযোগ যখন এলো শর্মিলার পীড়ার রূপ নিয়ে তখন দুর্ঘটনা ঘটতে দেরি হ'লো না। প্রেমের উন্মাদনার জন্য উর্মির মনে তো ব্যাকুলতা ছিলোই, এক হিসেবে শশাঙ্কের মনেও ছিলো। এতদিন সে তা জানতো না, চাকুরির সুখশয্যা থেকে জীবনসংগ্রামের দুরন্ত ক্ষেত্রে ছিটকে প'ড়ে যে-শক্তি তার জেগেছে, সেই শক্তিই এ-বিষয়ে তাকে সচেতন করেছে।

শশাঙ্ক-উর্মির প্রণয়বন্ধনে, তাই, যথার্থ অনিবার্যতা আছে। খটকা লাগে এর পরে, তাদের আন্তরিক দ্বন্দ্বের অভাব দেখে, তাদের প্রেমের অত্যন্ত সহজ

গতি দেখে—সে-কথা পূর্বেই বলেছি। নীরদ ইওরোপে গিয়ে শ্বেতাঙ্গিনী বিয়ে ক'রে ঊর্মিকে যে-মুক্তি দিলে, এটাও একটু আকস্মিক হ'য়ে গেছে, তবে নীরদের চরিত্রবিকাশের—কিংবা উদ্‌ঘাটনের—দিক থেকে এইরকম কোনো পরিণতি দরকার ছিলো। এদিকে প্রেমের উন্মাদনায় শশাঙ্কর কাজে ঘটতে লাগলো অবহেলা—অর্থাৎ যে-পৌরুষের জোরে সে তার ভাগ্যকে গ'ড়ে তুলেছিলো, সে-জোর তাকে ছেড়ে যেতে লাগলো। বিছানায় শুয়ে-শুয়ে শর্মিলার শুধু এই চিন্তা, পাছে স্বামীর কাজের ক্ষতি হয়। প্রথমে বোনকে ডেকে তিরস্কার করলে, পরে যখন দেখলে যে ঊর্মিকে ব্যাঘাত করতে না-দিলে কাজ একেবারেই বন্ধ হবার আশঙ্কা, তখন অজস্র প্রশ্রয় দিতে লাগলো। 'যার জন্যে কাজ খোয়াতে ওর ভাবনা নেই তাকে সুদ্ধ খোয়ান ওর সইবে না,' এ-কথা শর্মি আপন মনে উপলব্ধি করলে। যে-আনন্দের জোয়ার ঊর্মি তার স্বামীর মনে এনেছে তা লক্ষ্য ক'রে সে ভাবলে, 'আর সবই করেছি, কেবল খুশি করতে পারিনি। ভেবেছিলুম ঊর্মিমালার মধ্যে নিজেকেই দেখতে পাব, কিন্তু ও তো আমি নয়, ও সম্পূর্ণ আর-এক মেয়ে। আমার জায়গা ও নেয় নি, ওর জায়গা আমি নিতে পারব না। আমি চলে গেলে ক্ষতি হবে কিন্তু ও চলে গেলে সব শূন্য হবে।'

এ-কথা মানতেই হয় যে তিন জনের মধ্যে শর্মিলাই সবচেয়ে সম্পূর্ণ মানুষ। তার চরিত্রে এমন একটি দৃঢ়তা, বুদ্ধিতে এমন একটি নির্মলতা আছে যাকে শ্রদ্ধা না-করা অসম্ভব। যদিও সে মায়ের জাতের মেয়ে—কিংবা সেইজন্যেই—স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসায় একটি বিরল মহত্ত্ব আছে। পাছে স্বামীর কাজের ক্ষতি হয়, এ-জন্য স্বামীর ভ্রান্তিকেও সে প্রশ্রয় দিচ্ছে—যখন সবই যেতে বসেছে তখন অনেকটা লোকশান সহ্য ক'রে খানিকটা ধ'রে রাখবার চেষ্টায় তার একান্ত শুভব্রতী স্থির সুবুদ্ধিরই পরিচয়। আশ্চর্য তার ধৈর্য, অভিমানভরে একবারও বললে না—যেতে যখন বসেছে, সবই যাক, আমি এর মধ্যে নেই, রোগশয্যায় শুয়ে-শুয়ে নিঃশব্দে সহ্য করলে আপন অন্তরের নিদারুণ যন্ত্রণা। যদিও বলবো যে কোনো মানুষেরই অন্যায় সহ্য করা উচিত নয়, তবু শর্মিলার স্নেহ, ধৈর্য ও ক্ষমাকে অসম্মান করবার শক্তিও আমার নেই। এ-রকম মেয়ে যদি কেউ থাকেন তিনি নিশ্চয়ই মহৎ, এবং আমাদের সমাজে শর্মিলা হয়তো একেবারেই অসম্ভব নয়। অবশ্য মৃত্যুশয্যায় শুয়ে স্বামীকে তার প্রণয়িণীকে বিবাহ করতে বলা, তার উপর ভালো হ'য়ে উঠে সেই অনুরোধেরই পুনরাবৃত্তি করা—আমাদের বিশ শতকের মন এ-জিনিস কিছুতেই মেনে নিতে পারে না, আপত্তি জানাতেই হয়। শর্মিলা সেরে উঠে যখন

ঊর্মিকে বললে, 'তুই যেতে পারবি নে।……হিন্দু সমাজে বোন-সতিনের ঘর কি কোনো মেয়ে কোনোদিন করে নি'—এবং লোকনিন্দার বাইরে থাকবার জন্যে স্বামীকে নেপালে চাকরি নিতে তাগিদ দিলে, তখন আমাদের মনে এমন একটি আঘাত লাগে যার জের কাটিয়ে ওঠা সহজ হয় না। তবু স্বীকার করি শর্মিলা চরিত্রের জীবন্ত উজ্জ্বলতা।

শর্মিলার এত চেষ্টাও সফল হ'লো না, শশাঙ্ক পারলে না কাজে মন দিতে, প্রেমের ঘোরে ব্যবসায়ে দেউলে হ'তে হ'লো। নিজের হাতে যা গ'ড়ে তুলেছিলো, নিজের হাতেই তা ভাঙলো। আসলে মানুষটা খুব দুর্বল প্রকৃতির, তার পৌরুষ ক্ষণিক তেজ বিকীরণ ক'রেই ফুরিয়ে গেলো, ঊর্মিকে পাবার আকাঙ্ক্ষা তার জীবনে শক্তি আনলো না, আনলো আবিলতা। 'মদ একবার খেলে তার পরিতাপ ঢাকতে আবার খেতে হয়।' শশাঙ্ককে রবীন্দ্রনাথ দুর্বল ক'রেই দেখেছেন ও এঁকেছেন, তার প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ আছে এমন মনে করা ভুল হবে। আমার তো মনে হয় শশাঙ্ককে তিনি অনেকখানিই ঠাট্টা করেছেন—সে-ঠাট্টার মুখ অবশ্য খুবই সূক্ষ্ম। নীরদকে করেছেন পরিচ্ছন্ন উপহাস, আর শশাঙ্ককে পরিহাসের প্রান্তিক প্রচ্ছন্নতায় বসিয়ে রেখেছেন। নিচের উদ্ধৃতিটুকু ধরা যাক :

> শশাঙ্ককে স্পষ্ট করে কেউ কিছু বলেনি বটে কিন্তু চারিদিক থেকেই সে একটা অবাক্ত সমর্থন পাচ্ছে। শশাঙ্ক একরকম ঠিক করে নিয়েছে, শর্মিলার মনে বিশেষ কোনো ব্যথা নেই, ওদের দুজনকে একত্র মিলিয়ে খুশি দেখেই সে খুশি। সাধারণ মেয়ের পক্ষে এটা সম্ভব হতে পারত না কিন্তু শর্মিলা যে অসাধারণ। শশাঙ্কর চাকরির আমলে একজন আর্টিস্ট রঙিন পেন্সিল দিয়ে শর্মিলার একটা ছবি এঁকেছিল। এতদিন সেটা ছিল পোর্টফোলিওর মধ্যে। সেইটেকে বের করে বিলিতি দোকানে খুব দামি ফ্যাশানে বাঁধিয়ে নিয়ে আপিসঘরে যেখানে বসে ঠিক তার সুমুখে দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখলে। সামনের ফুলদানিতে রোজ মালী ফুল দিয়ে যায়।

এখানে আছে সেই জাতের সূক্ষ্ম প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ, ইংরেজিতে যাকে বলে আয়রনি। একদিকে শ্যালিকার সঙ্গে ভালোবাসা, অন্যদিকে স্ত্রীর ছবি ঘটা ক'রে বাঁধিয়ে ফুল দিয়ে পুজো করা, মনে-মনে অনায়াসে ধ'রে নেয়া যে তাদের মিলিত হওয়ার সুখেই স্ত্রীও সুখী, কেননা সে 'অসাধারণ'—এ যদি হাস্যকর না হয় তবে হাস্যকর কী? শশাঙ্ক নিজে অবশ্য জানে না যে সে হাস্যকর, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা জানেন, এবং এখানেই 'দুই বোনের' সার্থকতা। আদিত্য কি সরলা সম্বন্ধে ঠাট্টার আভাসমাত্র যদি থাকতো তাহ'লেও 'মালঞ্চ' অমন দুঃসহ হৃদয়হীন হ'তো না। এমনিতেও 'মালঞ্চে' হাস্যরসের এতটুকু স্পর্শও কোনোখানে লাগেনি, সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের গল্পের মধ্যে 'মালঞ্চ' একটি

উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। 'দুই বোন' রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক হাস্যরসে ক্ষণে-ক্ষণে উজ্জ্বল, সেই কারণেও অনেক বেশি উপভোগ্য। অমন মধুর নামটি সত্ত্বেও 'মালঞ্চ' বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের সব চাইতে নিরানন্দ গল্প, কিন্তু 'দুই বোনে' আনন্দের উপকরণ প্রচুর।

পরিশেষে বলতে হয় যে খুঁত ধরার কাজটি মোটেও শক্ত নয় এবং আমার পক্ষে একেবারেই অপ্রিয়। এ-সব বইয়ের অলোচনাপ্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে এদের লেখকের বয়স গেছে সত্তর পেরিয়ে, এবং ঐ বয়সে এমন আশ্চর্য ভাষাব্যবহার যে সম্ভব, শুদ্ধু সেইটুকু দেখেই আমাদের বিস্ময় সীমা ছাড়িয়ে যায়। ঊর্মিমালার বর্ণনায় যখন পড়ি: 'গান ভালো গাইতে জানে না কিন্তু সেতার বাজায়। সেই সংগীত দেখবার না শোনবার কে জানে'—কিংবা 'মালঞ্চে' যখন হঠাৎ এমন একটি লাইন এসে চমক লাগায়—'ঘন গন্ধ ভারি হয়ে জমে উঠেছে, গন্ধের কুয়াশা যেন'—তখন আমাদের অভিভূত মন বার-বার ব'লে ওঠে, 'তুমি ধন্য, সেই সঙ্গে আমরাও ধন্য।' দুটি বইতেই আছে নতুন শব্দসৃষ্টি, ভাষাব্যবহারে অপূর্ব কৌশল—'শেষের কবিতা'র রেশ বাজছে শেষ পর্যন্ত, 'চার অধ্যায়,' 'তিন সঙ্গী'তেও ভাষা নিয়ে তাঁর অবিরাম পরীক্ষা, নবীন—কিংবা প্রবীণ—ভাষাব্যবসায়ীর সবগুলি বই-ই বার-বার পাঠ্য। ভাষার সৌন্দর্য খুব বড়ো জিনিস, কিন্তু শুধু তা-ই দিয়েই একটি গল্প গ'ড়ে ওঠে না, গল্পের বিচার গল্প হিসেবেই। সেদিক থেকে নানা কথা উঠবেই। এ-দুটি গল্পে যদি রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে বাইরে'র অনতিপরেই হাত দিতেন, তবে হয়তো পরিপূর্ণ সুসঙ্গত আকারে তাদের পেতুম, কিন্তু এ-কথাও অবান্তর। তিনি যা করেছেন তা-ই দেখতে হবে, যা করেননি সে-কথা ব'লে কী লাভ। আর বার্ধক্যের রচনা ব'লে রবীন্দ্রনাথের কোনো বইকে 'খাতির ক'রে' কথা বলা আমার মতে তাঁর স্মৃতির প্রতি সবচেয়ে বড়ো অপমান, সাহিত্যের উচ্চতম আদর্শ ছাড়া আর-কোনো আদর্শে তাঁর বিচার হ'তে পারে না, আর আমাদের সাহিত্যে সে-আদর্শ তিনিই স্থাপন করেছেন। তাঁর দীপ্তিতেই তাঁকে আমরা দেখবো।

বুদ্ধদেব বসু

* রবীন্দ্র-রচনাবলী: ১১শ ও ১২শ খণ্ড

সমালোচনা

আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ। রানী চন্দ। বিশ্বভারতী, দুই টাকা।

রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনে যাঁরা সব সময় তাঁর কাছাকাছি থাকতেন এবং তাঁর অন্তিম পীড়ায় যে-ক'জনের শুশ্রূষা তিনি গ্রহণ করেছিলেন শ্রীমতী রানী চন্দ তাঁদের অন্যতম। রোগপরিচর্যা ও অন্য নানা কাজের ফাঁকে-ফাঁকে তিনি কবির কিছু-কিছু কথোপকথন লিপিবদ্ধ ক'রে রাখছিলেন, তারই সংগ্রহ এই এই বইটি। আলাপগুলি তারিখসংবলিত; প্রথম তারিখ ৭ জুলাই, ১৯৩৪, শেষ তারিখ ১২ জুলাই ১৯৪১; অর্থাৎ আলাপ-আলোচনাগুলি সাত বছরে ছড়ানো। লেখিকার নিজের একটি ভূমিকা আছে, তাছাড়া আছে কবি-বাণীর ফাঁকে-ফাঁকে দু'চার লাইনের মন্তব্য, তাতে আলোচনার প্রসঙ্গটা পাঠকের মনে পরিষ্কার হয়।

বইখানা নিঃসন্দেহে মূল্যবান, এবং এটি প্রণয়ণ করেছেন ব'লে শ্রীমতী চন্দর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি ও ভালোবাসাই যে বইখানাকে মূল্যবান করেছে তা নয়, রবীন্দ্র-জীবনের শেষ অধ্যায় সম্বন্ধে নানা তথ্য এখানে রইলো। সমালোচকের কাজে লাগবে, সাধারণ পাঠক আনন্দ পাবেন। ছোটোখাটো ঘরোয়া কথা থেকে সাহিত্য, চিত্রকলা, গান, মেয়েদের সমস্যা ইত্যাদি নানা বিষয় অবলম্বন ক'রেই কবির আলাপের স্রোত এই পৃষ্ঠাগুলির মধ্যে প্রবাহিত—কোনো-কোনো অংশ ছোটো প্রবন্ধের চেহারা নিয়েছে, তার দু'একটির পাঠান্তর কবির স্বাক্ষর বহন ক'রে তাঁর জীবদ্দশায় সাময়িক পত্রে প্রকাশিতও হয়েছে। ফাঁকে-ফাঁকে ছড়িয়ে আছে কবির আত্মকথা, ছেলেবেলার স্মৃতি, সাহিত্যশিল্পসাধনার নেপথ্যকাহিনী--বলা বাহুল্য, এ-সব কথা বাঙালি পাঠক সাগ্রহে পড়বে এবং বার-বার পড়বে। আমার তো মনে হয় এ-বই রবীন্দ্রানুরাগীর নিত্য সঙ্গী হবে—কারণ এর মস্ত সুবিধে এই যে আগাগোড়া পড়বার কোনো দায় নেই—যে-কোনো সময়ে, যে-কোনো পাতায় খুললেই পড়বার মতো—এবং ভাববার মতো—কিছু কথা পাওয়া যাবে।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য বইখানির একটি 'নিবেদন' লিখেছেন যা থেকে মনে হয় যে এই কথোপকথনগুলির প্রামাণ্যতা সম্বন্ধে বিশ্বভারতী কোনো দায়িত্ব নিচ্ছেন না। কিন্তু এ-গুলি যে প্রামাণ্য তা অনায়াসেই ধ'রে নেয়া যায়। ছাপার ঠাণ্ডা অক্ষর থেকে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর কানে এসে বাজে।

তবে এটা সম্ভব যে অনুলিপিতে কোথাও কোনো প্রমাদ হয়তো ছিলো—ছাপাবার তাড়াহুড়োয় তার সংশোধন করা হয়নি। এমন কোনো-কোনো শব্দ লেখিকা রবীন্দ্রনাথের মুখে বসিয়েছেন যা তাঁর মুখ দিয়ে বেরুনো স্বাভাবিক নয়। এ ছাড়া কোনো-কোনো বাক্য অনুলিপির কিংবা মুদ্রণের দোষে অস্পষ্ট কিংবা রীতিমতো অর্থবর্জিত হ'য়ে গেছে। এ-রকম হবার তিনটি কারণ হ'তে পারে—অশুদ্ধ অনুলিপি, মুদ্রাকরপ্রমাদ ও মুখের কথার অবৈকল্য রাখবার চেষ্টা। এ কথা ঠিক যে রবীন্দ্রনাথও হয়তো কখনো ঢিলেঢোলাভাবে কথা বলতেন, কিন্তু তাই ব'লে সে-কথাটি অবিকল সেই ভাবেই ছাপার অক্ষরে তোলবার পক্ষপাতী তিনি নিশ্চয়ই ছিলেন না; একটা শব্দ বসালে কি বাদ দিলে যদি বক্তব্য স্পষ্ট ও বাক্যটি ব্যাকরণসঙ্গত হয়, সেটুকু কলম ছোঁয়াবার অধিকার এ-ধরনের বইয়ের লেখকের কি সম্পাদকের নিশ্চয়ই আছে—বরং তা না-করাই রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির প্রতি অবিচার। আমাদের পাঁচজনের মুখের কথা অবশ্য প্রায়ই ব্যাকরণ মেনে চলে না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মুখের কথায় শুধু যে সাহিত্যের রস ছিলো তা নয়, সাহিত্যের রূপ থেকেও তা ভ্রষ্ট হ'তো না, এবং সেই রূপ ও রস যথার্থভাবে পরিবেষণ করা উত্তরপুরুষের প্রতি আমাদের কর্তব্য। উপরন্তু এ-বইতে কবির অনেক দামি কথা স্থান পেয়েছে ব'লে তাঁর বক্তব্য পরিচ্ছন্নভাবে প্রকাশিত হওয়া দ্বিগুণ দরকার। পরবর্তী সংস্করণে এ-সব ত্রুটি থেকে বইটিকে মুক্ত দেখবো এই আশা রইলো।

বুদ্ধদেব বসু

কয়েকটি নায়ক, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

কবিতা ভবন, দাম চার আনা।

'কয়েকটি নায়ক' এক পয়সায় একটি গ্রন্থমালার আধুনিকতম পুস্তিকা। গ্রন্থকার দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ও একজন আধুনিকতম কবি। গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত দশটি কবিতার প্রত্যেকটিতেই রচয়িতার আধুনিকতার পরিচয় প্রত্যক্ষ। কবিতা ক'টি গদ্য ছন্দে লেখা। অন্তরের সহজ ও স্বয়ম্ভূ সৌন্দর্য-পিপাসার সঙ্গে জগতের বীভৎসতা ও অবিচারের সংঘাত প্রত্যেকটি রচনাতেই ফুটেছে। আসলে এ-সংঘাতই এই পুস্তিকার উপজীব্য। সে-দিক থেকে এ-বই বামমুখী সাহিত্য-রসিকদের খুশি করবে।

আমার মতে অবশ্য ও-বিচার অপেক্ষাকৃত গৌণ। কবিতাগুলিতে সত্যকার রসসৃষ্টির পরিচয় আছে। কয়েকটি কবিতা আমার খুব ভালো লেগেছে। যেমন 'প্রেমিক'; 'পদাবলী,' কম্পোজিটার', 'আর একটি নিউরটিক'।

দূরে অন্ধকারে পাঁচটা বাজ্‌লো
সে-শব্দ ঘন শ্যাওলায় পা ফেলার মতো কোমল
আর এক শুভ্র শিশুর উৎসর্গ
মহাকালের চোরাবালিতে। (পদাবলী—মিলন)

তবুও অস্ফুট জ্যোৎস্নায় বিশাল প্রান্তর
সেই বিরাট ছায়াপুরুষকে ডাক্‌ল আজ। (জনৈক নিউরটিক—প্রথম অধ্যায়)

পাহাড়ের শুদ্ধ ঐশ্বর্যে
সূর্যের অদ্ভুত জ্যোতিতে
পাইনের অতল মর্মরতায়
আশ্চর্য বিকাশ তোমার। (জনৈক নিউরটিক—শেষ অধ্যায়)

দেবীপ্রসাদের উপমা ও বর্ণনায় ছবি ফোটে। এটাই বোধ হয় প্রকৃত কবির সবচেয়ে বড় পরিচয়।

এ-বইয়ের 'আর একটি নিউরটিক' ও 'আমন্ত্রণ' পড়ে মনে হয় পদ্যেও দেবীপ্রসাদবাবুর হাত ভালো খুলবে।

দেবীপ্রসাদের প্রথম এ-কবিতার বইটি অতি ক্ষীণকায়। এবারে একখানা বড় বই বেরুলে আমরা এ-কবির আরো বিশদ পরিচয় পেয়ে খুশি হবো।

অজিত দত্ত

আগামী সেদিন নয় দূরে, সুধীরচন্দ্র কর।

শান্তিনিকেতন থেকে লেখক কর্তৃক প্রকাশিত। দাম আট আনা।

শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র কর বহুকাল শান্তিনিকেতনবাসী, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধির জীবনদর্শনে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত, এবং নিভৃত কাব্যসাধক। এতদিন তাঁর রচনা শুধু সাময়িক পত্রেই প্রকাশিত হতো, সম্প্রতি তিনি পর-পর তিনটি বই

প্রকাশ করেছেন। প্রথমে 'এক পয়সায় একটি' সিরিজের 'ওপারেতে কালো রং,' তারপর রবীন্দ্র স্মরণে 'চিত্রভানু', এবং তার অনতিপরেই 'আগামী সেদিন নয় দূরে'। তিনটি বই-ই আয়তনে ক্ষুদ্র, কিন্তু তিনটি একত্র ক'রে পড়লে তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধারণা হয়।

প্রথমেই চোখে পড়ে যে সুধীরবাবু অত্যন্ত মৃদুস্বভাব কবি। একটি শান্ত নম্রতা তাঁর রচনায় পরিব্যাপ্ত। ছন্দে-মিলে তাঁর সহজ দখল, সে-দখল অতি সহজ ব'লেই বোধ হয় মাঝে-মাঝে তাঁর রচনা তরল হ'য়ে পড়ে, কোনো-কোনো চমকানো মিল, যা witty হওয়া উচিত, হ'য়ে পড়ে ছেলেমানুষি। তবু 'ওপারেতে কালো রং'-এ বর্ষার ছড়াগুলি উপভোগ্য, এবং 'চিত্রভানু'র গভীর বিচ্ছেদবেদনাজড়িত রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের দু'একটি ছোটো-ছোটো ছবি মর্মস্পর্শী। জীবন সম্বন্ধে একটি অত্যন্ত সহজ ও মানুষী বেদনাবোধ তাঁর আছে। অনেকদূর পর্যন্ত তিনি দ্যাখেননি, কিন্তু কাছাকাছি যেটুকু দেখেছেন সেটুকুর 'পরে আছে তাঁর আন্তরিক অনুকম্পা।

'আগামী সেদিন নয় দূরে'-তে অনেকটা গভীরতর সুর বেজেছে। মনুষ্য-সমাজে ছোটো বড়োর ভেদ, এবং সেই বিষাক্ত মূল থেকে অন্যায়, অবিচার, অত্যাচারের সর্বব্যাপী অরাজকতা—যার চরম পরিণতি যুদ্ধের বীভৎসতায়—এই চিন্তায় তাঁর মন পীড়িত। বর্তমান সমাজব্যবস্থার দুঃসহতা তিনি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন—অথচ সে-রকম তীব্রতা কি জ্বালা যেন নেই, তাঁর স্বাভাবিক মৃদুতা ধরা পড়েছে পদে-পদে। কোনো-কোনো কবিতার অংশ অনেকটা পদ্যে গাঁথা নীতিকথার মতো হ'য়ে গেছে, কিংবা কোথাও আধুনিক সমাজ-সংক্রান্ত কতগুলি তথ্য তিনি সরলভাবে সাজিয়ে গেছেন মাত্র। সার্থক তিনি সেখানেই যেখানে তাঁর মর্মপীড়া কবিত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, যেখানে হতাশা আর বিক্ষোভ পেরিয়ে তিনি দেখতে পেয়েছেন নতুন আশার আলো :

> বহু মৃত্যু ঘুরে
> দুর্বলও সবল হবে, আগামী সেদিন নয় দূরে।

সুধীরবাবুর হাতে নানা ছন্দ খেলে, আলোচ্য বইটিতে গদ্যকবিতাও কয়েকটি আছে। নন্দলাল বসু, জু পিঁয়ো ও রানী চন্দ-র আঁকা কয়েকটি ছবিতে বইখানা সমৃদ্ধ। জু পিঁয়োর আঁকা মহাত্মা গান্ধির ছবিটি চোখে পড়বার মতো। আট আনা দাম আজকালকার দিনে শস্তাই বলতে হয়।

সুধীরবাবুর লেখা আরো কবিতার বইয়ের প্রত্যাশায় রইলাম।

বুদ্ধদেব বসু

সম্পাদকীয়

ফাল্গুনী রায়

'কবিতা'র গত সংখ্যায় আমরা তরুণ কবি ফাল্গুনী রায়ের মৃত্যুর উল্লেখ করেছিলাম। সেই প্রসঙ্গে তাঁর একটি বন্ধুর কাছ থেকে যে-চিঠি আমরা পেয়েছি এখানে তার খানিকটা উদ্ধৃত করছি :

> ফাল্গুনী……মনে প্রাণে কবি ছিল।……তার কবিতা আসত অন্তরের সহজ অনুভূতির তাগিদে।……সে ছিল অত্যন্ত খামখেয়ালী। তার কবিতা লেখা চলত কখনও ঠোঙার ভাঙা অংশে, কখনও ক্যানেস্তারার পেছনে কখনও দেওয়ালে। কাজেই তার সমস্ত কবিতা সম্পূর্ণ আকারে কোনো খাতায় বা কাগজে লেখা হত না। আমরা তার কবিতা শুনতাম মুখে। সে আবৃত্তি করে শোনাত। চালচলনও তার ছিল অদ্ভুত। সাধারণ মানুষ যাকে এক কথায় বলবে 'পাগল'। চেহারা ছিল তার সওয়া ছ'ফুট লম্বা। গায়ে দিত ঠাকুর্দার আমলের হাঁটু অবধি লম্বা কোট, গলায় জড়াতো রেশমি রুমাল, পায়ে বিদ্যাসাগরি চটি আর সারা মুখে মাখত পাউডার। চুলও তার ছিল লম্বা ঢেউখেলানো। এমনি চেহারা আর পোষাকে সে সর্বত্র টালা থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত সুপরিচিত ছিল। সবাই তাকে ঠাট্টা করত, টিটকিরি দিত, পাগল ব'লে খেপাত, কিন্তু কারও নিন্দাস্তুতি সে গায়ে মাখত না। কখনও রাগত না।……সে আমাদের বলত, দেখ বর্তমান যুগ ছদ্মবেশের যুগ, বাইরের সাজ পোষাকের ঘটায় এ যুগের মানুষ ভোলে, তাকে সম্মান করে, শ্রদ্ধা করে, ভেতরে তার কিছু থাকুক আর নাই থাকুক। এ আমাকে প্রবল প্রহার করেছে। তাই আমিও চাই না এ যুগকে। আমি এ যুগকে করে যাব প্রচণ্ড ব্যঙ্গ।

এই 'ছদ্মবেশের যুগ' সকল কবিকেই 'প্রবল প্রহার' করে তাতে সন্দেহ নেই, এবং অল্প বয়সে এই যুগ থেকে অভিমানভরে মুখ ফেরানোও স্বাভাবিক। সে-অভিমান যদি কখনো-কখনো (যেমন ফাল্গুনী রায়ের ক্ষেত্রে) অত্যন্ত উচ্চস্বরে আত্ম-প্রকাশ করে তাতেও অবাক হবার কিছু নেই। পরিণত বয়সে পৌঁছলে ফাল্গুনী এ-অভিমান নিশ্চয়ই কাটিয়ে উঠতেন, এবং তাঁর রচনা ও জীবন 'প্রচণ্ড ব্যঙ্গে'র স্তর পার হ'য়ে আরো গভীর কোনো সুরে বেজে উঠতো। দুঃখের বিষয় সে অবস্থা আসন্ন হবার পূর্বেই মৃত্যু তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো। মাত্র তেইশ বছর তিনি বেঁচে ছিলেন, এবং এই অল্প সময়ে যে-সব কবিতা তিনি লিখেছিলেন তাতে কবিত্বশক্তির প্রতিশ্রুতি স্পষ্ট। তাঁর অকালবিয়োগ বাংলা সাহিত্যের পক্ষে দুঃখের, কিন্তু আরো দুঃখের হবে যদি তাঁর রচনাগুলি অযত্নে হারিয়ে যায়। তাঁর কাব্যের একটি সংকলন প্রকাশ করতে তাঁর বন্ধুদের অনুরোধ করি।

"The Call of the Himalayas"

প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এই নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। এতে আছে ২৫টি কাঠ-খোদাই ছবি (Wood engraving), এবং চিত্রের পরিচিতি স্বরূপ সংক্ষিপ্ত মুখবন্ধ। শিল্পী যখন শান্তিনিকেতনে ছাত্র, তখন কোনো এক গ্রীষ্মাবকাশে তিনি সদলে বদ্রিনাথ ভ্রমণ করেন। এই বইখানা সেই ভ্রমণেরই সাক্ষ্য ও আলেখ্য। ছবিগুলি ধারাবাহিকভাবে সাজানো, শান্তিনিনেকেতনে শুরু হ'য়ে পাহাড়ের দৃশ্যাবলী পেরিয়ে আবার ফিরে এসেছে আশ্রমে। কাঠখোদাই শিল্পে রমেন্দ্রবাবুর দক্ষতা দেশবিশ্রুত, তাঁর এই বইখানা চিত্রানুরাগীর লোভনীয় সম্পদ। সব ছবিই সুন্দর, মুখবন্ধটুকু সুখপাঠ্য, ছাপা কাগজ বাঁধাই এ-দুর্দিনেও অনিন্দ্য। আমরা যতদূর জানি, কাঠখোদাইয়ের বই আমাদের দেশে এই প্রথম। কাঠখোদাইয়ের ব্যবহার আমাদের দেশে এখনো সীমাবদ্ধ, অথচ আভরণিক শিল্পহিসেবে এর সার্থকতা অতি ব্যাপক। সাহিত্যগ্রন্থ চিত্রণের পক্ষে এর বিশেষ উপযোগিতা বিদেশে প্রমাণিত হ'য়ে গেছে, আশা করি রমেন্দ্রবাবু রএই বইখানা এ-বিষয়ে আমাদের দেশেও লেখক ও প্রকাশকদের চোখ খুলে দেবে।

চীনের স্বাধীনতা সংগ্রাম

'চীন রাষ্ট্র ও স্বাধীনতা সংগ্রামের পাঁচ বৎসর'—এই নামের একখানা বই সম্প্রতি আমাদের হাতে এসেছে। গেলো পাঁচ বছর ধ'রে দুর্ধর্ষ জাপানের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রামের ভিতর দিয়ে চীন জাতি যে-ভাবে নবজীবনের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে তার আশ্চর্য ইতিহাসের কিছু-কিছু অংশ এই বইয়ে পাওয়া যাবে। যাঁরা মনুষ্যধর্মে বিশ্বাসী তাঁদের সকলের কাছেই চীন আজ শ্রদ্ধেয়, তাছাড়া বর্তমান সংকটে ভারতের ভাগ্য চীনের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত ব'লে ঐ বিশাল প্রতিবেশী সম্বন্ধে আমাদের কারুরই উদাসীন থাকবার উপায় নেই। আধুনিক চীন সম্বন্ধে অনেক জানবার মতো কথা এ-বইয়ে আছে। অনেক ছবিও আছে, তার মধ্যে মহাত্মা গান্ধির সঙ্গে চিয়াং-কাই শেক-এর ছবিটি উল্লেখযোগ্য।

গ্রাহক নম্বর

'কবিতা'র গ্রাহকগণ যে-কোনো প্রসঙ্গে চিঠি লেখবার সময় দয়া ক'রে গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করবেন।

কবিতা

অষ্টম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা চৈত্র, ১৩৪৯ ক্রমিক সংখ্যা ৩৬

পত্রগুচ্ছ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত ও বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত]

১২

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, প্রায় এক মাস ধ'রে ঘুরেছি। এবারে বেরিয়েছিলুম পশ্চিম ভারতের অভিমুখে। গিয়েছি লাহোর পর্য্যন্ত। এই কারণে চিঠিপত্র অনেককাল বন্ধ। শান্তিনিকেতনে যখন আপনাদের ভাবে ও কাজে বেষ্টিত হ'য়ে থাকি, তখন সমগ্র ভারতের বর্তমান ঐতিহাসিক রূপটা প্রত্যক্ষ দেখতে পাইনে। এবারে মূর্তিটা দেখা গেল। তুমি যে মহাদেশে আছ সেখানে মানুষের চিত্ত-সমুদ্রে সুরাসুরের মন্থন চলচে, আবর্তিত হয়ে উঠচে বিষ এবং অমৃত প্রকাণ্ড পরিমাণে; সেখানে চিন্তা বলো, কর্ম্ম বলো, কল্পনার লীলা বলো সমস্তের মধ্যেই একটা বিরাট বেগের উৎক্ষেপ বিক্ষেপ নিরন্তর চলেচে, প্রত্যেক মানুষের জীবনে সেখানে সমস্ত মানুষের উদ্বেল জীবনের আঘাত-প্রতিঘাত কেবলি কাজ করচে। সেখানে মানুষের সম্মিলিত শক্তি ব্যক্তিগত শক্তিকে অহরহ রাখচে জাগিয়ে। ভারতবর্ষের দিগন্ত আবদ্ধ হয়ে রয়েছে সঙ্কীর্ণতার প্রাচীরে, সেই বেড়ার মধ্যে যা হচ্চে তাই হচ্চে, তার বাইরের দিকে বেরোবার কোনো গতি নেই। যেখানে জীবনের ভূমিকা এত ছোটো সেখানে মানুষের কোনো চেষ্টা চিরন্তনের ক্ষেত্রে কোনো বৃহৎ রূপ প্রকাশ করবে কিসের জোরে। ইতিহাসের যে পটে আমাদের ছবি উঠচে, সে ছিন্ন পট, তার চিত্রের রেখা ক্ষীণ, বর্ণ অনুজ্জ্বল, তাতে প্রবল মনুষ্যত্বের স্পষ্টতা ব্যক্ত হবার পরিপ্রেক্ষণিকা পাওয়া যায় না। তাই আমাদের পলিটিক্স, সাহিত্য, কলাবিদ্যা সব কিছুরই মাপকাঠি ছোটো। এই নিয়ে মহাজাতির

পরিচয় গড়ে তোলা অসম্ভব। এই পরিচয়ের অভাবে আমাদের আত্মসম্মান-বোধের আদর্শ নীচে নেমে যায়।

সর্ব্বত্রই দেখা গেল White Paper নিয়ে আলোচনা চলচে। ছেলেবেলায় কাঙালী-বিদায়ের যে দৃশ্য দেখেছি তাই মনে পড়ে গেল। ধনীর প্রাসাদ অভ্রভেদী, তার সদর ফটক বন্ধ। বাহিরের আঙিনায় জীর্ণ চীর পরা ভিক্ষুকের ভীড়। কেউ পায় চার পয়সা, কেউ দু আনা, কেউ চার আনা। তকমা-পরা দ্বারীদের সঙ্গে তাদের যে-দাবীর সম্বন্ধ তা কেবল কণ্ঠের জোরে। এইজন্যে তার স্বরের চর্চ্চাটাই প্রবল হয়ে উঠেছে। সব চেয়ে যেটা লজ্জা, সে এই ভিক্ষুকদের নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছেঁড়ি নিয়ে। যে ব্যক্তি দান করচে, সুদূর উর্দ্ধে দোতলার বারান্দায় তাদের আত্মীয় কুটম্বের মজলিশ। যত কম দিয়ে যত বেশি দেওয়ার ভড়ং করা যেতে পারে স্বভাবতই তাদের সেই দিকে দৃষ্টি। রাজদ্বারীদের এক হাতে সিকি দুয়ানির থলি, আরেক হাতে লাঠি, সেটা পড়চে যারা চোখ রাঙায় তাদের মাথার পরে।

দেখতে দেখতে হিন্দু-মুসলমানের ভেদ অসহ্য হয়ে উঠ্‌ল, এর মধ্যে ভাবীকালের যে সূচনা দেখা যাচ্চে তা রক্তপঙ্কিল। লক্ষ্ণৌয়ে একজন মুসলমান ভদ্রলোক আক্ষেপ ক'রে বলছিলেন, কী করা যায়। আমি বললুম, রাষ্ট্রীয় বক্তৃতামঞ্চে নয়, কাজের ভিতর দিয়ে মিলতে হবে। আজকাল পল্লীগঠনের যে উদ্যোগ আরম্ভ হয়েছে সেই উপলক্ষ্যে উভয় সম্প্রদায়ের সমবেত চেষ্টার ঐক্যবন্ধন সৃষ্ট হতে পারে। তিনি বললেন———এই কাজে মুসলমানদের স্বতন্ত্র হয়ে চেষ্টা করতে মন্ত্রণা দিচ্চে। পাছে গান্ধিজির অনুষ্ঠানে পল্লীবাসী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আপনি মিলন ঘটে সেই সম্ভাবনাটাকে দূর করবার এই উপক্রম। বর্ত্তমান ভারতের রাষ্ট্রনীতিতে হিন্দুর সঙ্গে পৃথক হওয়াই মুসলমানের স্বার্থরক্ষার প্রধান উপায়। এতকাল ধর্ম্মে যে দুই সম্প্রদায়কে পৃথক করেছিল আজ অর্থেও তাদের পৃথক করে দিল—মিল্‌ব কোন শুভ-বুদ্ধিতে আপীল করে? না মিললে ভারতে স্বায়ত্তশাসন হবে ফুটো কলসিতে

জল ভরা। ইংরেজ মানব ইতিহাসে হেয়তম যে পাপ করেছে সে হচ্চে চীনের মতো অত বড়ো দেশের কণ্ঠে জোর করে আফিম ঠেসে দিয়ে। নিজের উদরপূরণের জন্যে এত বড়ো নরহিংসা সভ্যবর্ব্বরতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। অবশেষে নিজের স্বার্থকে চিরস্থায়ী করবার উদ্দেশে ইংরেজ আজ হিন্দুমুসলমানের ভিতরকার প্রভেদকে প্রশস্ত ক'রে দিলে এও উক্ত প্রকার বিষপ্রয়োগেরই অনুরূপ। কোনো এক সময়ে য়ুরোপে যখন প্রলয়কাণ্ড ঘটবে তখন ইংরেজের শিথিল মুষ্টি থেকে ভারতবর্ষ খসে পড়বে। কিন্তু ভারতবর্ষের মতো এত বড়ো দেশে দুই প্রতিবেশী জাতির মজ্জায় মজ্জায় এই যে বিষ বীজ সে রোপণ করে দিয়ে গেল কবে আমরা তাকে উৎপাটিত করতে পারব? একটা জাতির ভাবী ইতিহাসকে এমনতর কলুষিত করে দিলে; সভ্য য়ুরোপের সঙ্গে সম্পর্কের এই নিদারুণ পরিশিষ্ট ভারতবর্ষকে সুচিরকাল বহন করতে হবে। আজ———এসেছেন সেই সর্ব্বনেশে সভ্যতার দূত হয়ে আমাদের মৃত্যুশেল নিয়ে। আমরা নিরস্ত্র আমরা নিঃসহায়, বিনাশের সঙ্গে লড়ব কী ক'রে? পঞ্জাবে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে বিচ্ছেদের ছবি দেখে এলুম তা অত্যন্ত দুশ্চিন্তাজনক এবং লজ্জাকররূপে অসত্য। বাংলার অবস্থা তো জানোই—এখানে উভয়পক্ষের বিকৃত সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে প্রায়ই যে সব বীভৎস অত্যাচার ঘটচে তাতে কেবল অসহ্য দুঃখ পাচ্চি তা নয়, আমাদের মাথা হেঁট করে দিলে।

ভালো করে ভেবে দেখলে বুঝতে পারি একটা কোনো আকস্মিক অভাবনীয় উপপ্লব না ঘটলে এই নাগপাশবন্ধন আমরা কাটিয়ে উঠতে পারব না। ভারতবর্ষ যে ইংরেজের একান্ত লোভের সামগ্রী; তার বিষয়সম্পত্তির সামিল; এ'কে না হলে তার অন্নবস্ত্রের কম্‌তি ঘটবে, রাষ্ট্রীয় প্রতাপের প্রথম শ্রেণী থেকে তাকে নিচে নাম্‌তেই হবে। এত বড়ো ত্যাগস্বীকার করতে তাকে যে বলব সে কিসের দোহাই দিয়ে? সভ্যতার দোহাই? কিন্তু একটা কথা স্বীকার করতেই হবে যে, মানুষের যে-সভ্যতার রূপ আমাদের সামনে বর্তমান সে-সভ্যতা মানুষখাদক। তার একদল victim

চাইই যারা তার খাদ্য, যারা তার বাহন। তার ঐশ্বর্য্য তার আরাম, এমন কি তার কালচার উপরে মাথা তোলে নিম্নতলস্থ মানুষের পিঠের উপর চড়ে। এই নিয়েই য়ুরোপে শ্রেণীগত বিপ্লবের লক্ষণ প্রবল হয়ে উঠেছে। লোভ প্রবৃত্তিটা সর্ব্বব্যাপী হতে পারে কিন্তু লোভের ক্ষেত্র এবং সেই ক্ষেত্রের অধিকারীকে স্বল্পপরিমিত হতেই হবে। যে কোনো কারণ বশতই হোক যার জোর আছে সে সেই ক্ষেত্রকে নিজে অধিকার করে অন্যের উপর প্রভুত্ব করে। এমন অবস্থায় জোরের সঙ্গে জোরের সমানে সমানে লড়াই চলে, কিন্তু সেখানে ডিপ্লমাসির চাল চেলে নানা আকারের রফানিষ্পত্তি হতে থাকে। কিন্তু যেখানে এক পক্ষের জোর আছে অন্য পক্ষের জোর নেই সেখানে নির্ব্বল পক্ষ আপনার প্রাণ দিয়ে অপরকে পোষণ করার কাজে লাগে। যতক্ষণ লোভ রিপু এই বর্ত্তমান সভ্যতার ও স্বাজাত্যের অন্তর্নিহিত শক্তি রূপে কাজ করে ততক্ষণ এর থেকে বলহীনের নিষ্কৃতি নেই; কেননা, যে দুর্ব্বল এই সভ্যতা তারই প্যারাসাইট্। অতএব প্রবলের হাত থেকে যখন দানপত্র আসবে তখন তা অত্যন্তই white paper হয়ে আস্‌বে, তাতে রক্তের লেশ থাক্‌বে না; সেই পাতে যে উচ্ছিষ্ট আমাদের ভোগে পড়বে সেটা হবে কাঁটাচচ্চড়ি, তাতে মাছের গন্ধ থাকবে মাত্র খাদ্যবস্তু অতি অল্পই থাকবে। লোভী মনিবের পাত থেকে সেই মোটা মাছের ভাগ নিয়ে কাড়াকাড়ি করব কিসের জোরে? কেবলমাত্র পেট ভরার চেয়ে বেশি জোগান তার যদি না থাকে তবে সেটাকে তার ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দেবে না; তার যে সভ্যতা প্রাচুর্য্য-অভিমানী তারও দাবী তো মেটাতে হবে। কী দিয়ে? যে দুর্ব্বল তারই ক্ষুধার অন্ন নিয়ে। এই ক্ষুধা ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত কত বড়ো চির দুর্ভিক্ষের আসন পেতে আছে তা কি জানো না? এর অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেক অনটনও যখন ওদের ভাগ্যে দৈবাৎ ঘটে তখন ওরা কী রকম ব্যাকুল হয়ে ওঠে তাও তো আমরা দেখেছি।

এই পেটুক সভ্যতা-সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান হবে কী করে? অধিকাংশ মানুষকে স্বল্পসংখ্যক মানুষের উদ্দেশে নিজেকে কি চিরকালই উৎসর্গ করতে হবে? শুধু তাদের প্রাণরক্ষার জন্যে নয়, তাদের মানরক্ষার জন্যে, তাদের

অতিরিক্ত তহবিলকে স্ফীত রাখবার জন্যে! এই যদি অপরিহার্য্য হয় তবে লর্ড চার্চ্চহিলের জবাব দেব কী? এই সমস্যা তো সবলের সামনে নেই। তাদের সমস্যা বলের সঙ্গে বলের প্রতিযোগিতা নিয়ে। এই প্রতিযোগিতা আজকাল সাংঘাতিক হয়ে উঠেচে। সম্প্রতি এর প্রকাণ্ড আঘাতে ওদের দেহগ্রন্থি শিথিল হয়ে আছে, আরো আঘাতের আশঙ্কা চারদিকেই উদ্যত। এমন অবস্থায় যারা বুদ্ধিমান তারা দুর্ব্বলের সহায়তাকেও উপক্ষো করে না। বিগত যুদ্ধে সেই সহায়তা পেয়ে লর্ড চর্চ্চহিল্‌ও কৃতজ্ঞের বদান্যতায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন। আর কখনো যে সেই সহায়তার প্রয়োজন হবে না তা বলা যায় না। কিন্তু কৃতজ্ঞতার স্মৃতি স্বল্পস্থায়ী, তার উপরে ভর দিয়ে আমাদের আবেদনের ভিত্তি পাকা করবার ব্যর্থ চেষ্টা দুর্ব্বলের পক্ষে বিড়ম্বনা।

যখন সামনে এত বড়ো দুর্ভেদ্য নিরুপায়তা দেখি তখনি বুঝতে পারি যে এই দুর্ব্বলের প্রতি নির্ম্মম সভ্যতার ভিত্তি বদল না হলে ধনীর ভোজের টেবিল থেকে উপেক্ষায় নিক্ষিপ্ত রুটির টুকরো নিয়ে আমরা বাঁচব না। সভ্যতার বণিকবৃত্তি যতদিন না ঘুচবে ততদিন ভারতবর্ষকে ইংরেজ মহাজনের পণ্যদ্রব্য হয়ে থাকতেই হবে, কোনোমতেই তার অন্যথা হতে পারবে না। এক পক্ষে লোভ যে রাষ্ট্রব্যবস্থার সারথি সেখানে অপর পক্ষে দুর্ব্বলকে বল্গাবদ্ধ বাহনদশা যাপন করতেই হবে। অবস্থাবিশেষে কখনো দানা বেশি জুটবে কখনো কম। অসহিষ্ণু হয়ে যে জীব হ্রেষাধ্বনি করবে পা-ছোঁড়াছুঁড়ি করবে তার স্পর্দ্ধা টিঁকবে না।

সভ্যতার এই ভিত্তিবদলের প্রয়াস দেখেছিলুল রাশিয়ায় গিয়ে। মনে হয়েছিল নরমাংসজীবী রাষ্ট্রতন্ত্রের রুচির পরিবর্ত্তন যদি এরা ঘটাতে পারে তবেই আমরা বাঁচব নইলে চোখ রাঙানীর ভান করে অথবা দয়ার দোহাই পেড়ে দুর্ব্বল কখনোই মুক্তি লাভ করবে না। নানা ত্রুটি সত্ত্বেও মানবের নবযুগের রূপ ঐ তপোভূমিতে দেখে আমি আনন্দিত ও আশান্বিত হয়েছিলুম। মানুষের ইতিহাসে আর কোথাও আনন্দ ও আশার স্থায়ী কারণ দেখিনি। জানি প্রকাণ্ড একটা বিপ্লবের উপরে রাশিয়া এই নবযুগের প্রতিষ্ঠা করেছে

কিন্তু এই বিপ্লব মানুষের সব চেয়ে নিষ্ঠুর ও প্রবল রিপুর বিরুদ্ধে বিপ্লব—এ বিপ্লব অনেকদিনের পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান। আর আজ য়ুরোপের যে সভ্যতার পিঞ্জরে বাঁধা হয়ে আছি আমরা, ঐশ্বর্য্যভোগের বিষবাষ্প তার তলায় তলায় জমে উঠেছে। সে কি নিরাপদ প্রতাপের কোনো মন্ত্রের সন্ধান খুঁজে পেয়েছে তার লোহার ক্যাশবাক্সের মধ্যে? অনেক বড়ো বড়ো জাত লুপ্ত হয়েছে, অনেক উদ্দামগতি ইতিহাস হঠাৎ পথের মাঝখানে মুখ থুবড়ে পড়ে স্তব্ধ হয়েছে, আর আমরাই যে white paper-এর ক্ষুদ কুঁড়ো খুঁটে খুঁটে খেয়ে চিরকাল টিঁকে থাকব এমন আশা করি নে—মরণদশার অনেক লক্ষণ তো দেখতে পাই। কিন্তু সর্ব্বমানবের তরফে তাকিয়ে যখন ভাবি তখন এ মনে আপনি আসে যে, নব্য রাশিয়া মানবসভ্যতার পাঁজর থেকে একটা বড়ো মৃত্যুশেল তোলবার সাধনা করচে যেটাকে বলে লোভ। এ প্রার্থনা মনে জাগে যে, তাদের এই সাধনা সফল হোক। দুর্দ্ধর্ষপ্রতাপ জরাসন্ধের কারাগার থেকে শ্রীকৃষ্ণ যেমন বহুকালের বহু বন্দীকে মুক্তি দিয়েছিলেন তেমনি ধনমদমত্ত সভ্যতার বিরাট কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ অসংখ্য বন্দী যেন একদা মুক্তি পায়।

ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ঘুরে অবশেষে ফিরে এলাম আপন কুলায়ের কোণে। ভারতে দেখলুম আলোহীন, মাহাত্ম্যহীন ধূলিনত জীবনের রঙ্গভূমি, ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে দেখলুম আমাদের য়ুরোপের প্রভু সেই আমাদের ভাবীকালের পথরোধ করে দাঁড়িয়ে। অল্প কিছু সম্বল নিয়ে অভুক্ত প্রাণের ছোটোখাটো প্রয়োজন, জীর্ণ আসবাব, উপস্থিত মুহূর্ত্তের ক্ষুদ্র দাবীর উপর বহুকোটি মানুষ প্রতিদিনের মাথা গোঁজবার পাতার কুঁড়ে বাঁধচে, তাতে বৃষ্টির জল রৌদ্রের তাপ নিবারণ হয় না। ধনী পথিক কটাক্ষে চেয়ে চলে যায় আর ভাবে এই এদের যথেষ্ট, কেননা ওরা আমাদের থেকে অনেক তফাৎ—আমরাও ভাবি এই আমাদের বিধিলিপি। বুঝতে পারি ওরা যে-গ্রহের আমরা সে গ্রহের নই। যখন একথাটা সম্পূর্ণ বুঝি তখন সমুদ্রের ওপারের খ্যাতিপ্রতিপত্তির জন্যে আমার আকাঙ্ক্ষা একেবারেই চলে

যায়। এও মন বলে ওদের ভাষা, ওদের প্রকাশের পদ্ধতি, ওদের ভালো-মন্দর বোধ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণা আমার পক্ষে অসম্ভব। অতএব তার মধ্যে অনধিকার প্রবেশের চেষ্টায় শুধু ব্যর্থতা নয়, অমর্য্যাদাও আছে। যেখানে আমার আপন অধিকার নিঃসংশয় সেইখানে ওদের থেকে দূরে থাকাই ভালো।—সম্প্রতি আমার তর্জ্জমাগুলো পড়ে কথাটা মনে আরো সুস্পষ্ট হোলো। এ তো আমার লেখা নয়। নিজের এ পরিচয় কেনই বা দিতে যাওয়া—এ তো নিজেকে ব্যঙ্গ করা। যতো পারো কবিতাগুলো ছেঁটে ছুঁটে বাদ দিতে দিয়ো—একবার গলদ করেছি বলেই তার সংশোধনের অধিকার আমার নেই একথা মানতে পারিনে।

আপন পরিচয়ের জন্যে তাগিদই বা কীসের? যখন ভাবি অজন্তার গুহা-চিত্রগুলির কথা, তখন নামের মায়াবন্ধন থেকে মুক্তির আস্বাদ মনের মধ্যে উপলব্ধি করি। ওরা কা'রা, একদিন অন্ধকারে বসে যারা দিনের পর দিন বিচিত্র সৃষ্টির আনন্দকে গুহাপ্রাচীরে চিত্রিত করেছিল? তারা তো এই সৃষ্টির সাফল্যেই আপন প্রয়াসের মূল্য হাতে হাতেই পেয়েছিল। তাদের যে-আত্মা সত্য সেই পেয়েছে আনন্দ, তাদের যে নাম মায়া খ্যাতির মজুরী তার জন্যে ওরা দাবী করেনি। অনাগত কালের সম্মুখে ঐ নামটাকে চাঁদার ঝুলির মতো পেতে রাখতে চাই কেন? এই দানের লোভের মতো এত বড়ো বিড়ম্বনা আর কী হতে পারে? আজ সকালে আকাশে আতপ্ত বসন্তের আভাস এসেছে, আমার সামনে ঘাসের মধ্যেকার অনামা ফুল-গুলোর উপর লাল ডানাওয়ালা ছোটো ছোটো প্রজাপতি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়াচ্চে; এই সদ্য মুহূর্ত্তের প্রাণনের আনন্দে আমার মনটা ফাল্গুনের তরুণ আলোকে ঐ কৃষ্ণচূড়া গাছের হিল্লোলিত পাতার মতো ঝলমল করচে। জীবনের অঞ্জলি ভরে এই তো পাচ্ছি যা পাওয়ার জিনিষ, এর চেয়ে আরো লোভ কেন? যখন কিছু লিখেছি সেও তো আপনার মধ্যে এই রকম পাতার হিল্লোল, হাওয়ার চাঞ্চল্য, রৌদ্রের ঝলক, প্রকাশের হর্ষবেদনা। সে তো বিনা নামের অতিথি, গর্ ঠিকানার পথিক। তাকে নামের ঠেলাগাড়িতে চাপিয়ে

হাটে হাটে ফিরিয়ে বেড়াবার কী দরকার! নামটা মায়া বলেই যত ঈর্ষা, বিদ্বেষ, বিবাদ বিরোধ। একদিন আমার লক্ষ্যের অতীত অজানা লোকালয়ের রাজপথে লক্ষ লক্ষ নামে নামে ঠেলাঠেলি হতে থাকবে, তারি মাঝখানে আমারো বেদনাহীন চেতনাহীন শব্দমাত্রসার নামটা চলবার জায়গা পেতে পারবে এই কল্পনার মরীচিকা নিয়ে আজ আমার মনে কোনো উৎসাহ হচ্চে না। জীবযাত্রার সমস্ত উদ্যোগ থেকে বিদায় নেবার সময় আমার এল, আজ আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান ঠেকে বিশ্বসত্তার স্পর্শে আমার চৈতন্যের তন্ত্রীতে এই যে ঝঙ্কার উঠচে—আমার পক্ষে এই তো চরম। তারো পরে একটা নাম থাকবে তাতে কী আসে যায়!

চার অধ্যায় অনুবাদের কপি পাঠিয়ো না, হয়তো পথেই মারা যাবে। তোমার তর্জমা পুনঃসংস্কার করবার মতো মেজাজ আমার নেই—ঐখানেই ছাপিয়ে দিয়ো। যদি ছাপানো দরকার না বোধ করো তাহলে ছাপিয়ো না।

দোল পূর্ণিমা আসচে, বসন্ত উৎসবের আয়োজন করচি। এইই আমার কাজ। ইতি—৭।৩।৩৫

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এ চিঠি পাবে কিনা সন্দেহ। নাইবা পেলে, আমি লেখবার দরকার বোধ করেছিলুম লিখেচি। বাস্।

১৩

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

ভারতের পুরাকালীন ঐতিহাসিক ভগ্নশেষের যে বিবরণ তোমার চিঠিতে লিখেছ পড়ে ভালো লাগল। এই মনে হোলো যে, মানুষ যে একদিন বেঁচে ছিল, তার সহজ জীবনযাত্রার প্রতিদিনের সঙ্গে আপনার চারিদিককে

নানারকম করে মানিয়ে নিয়ে তাতে আপন নানারকম স্বাক্ষর দিয়েছিল এইটে যখন দূর কালের ভিতর দিয়ে অনুভব করা যায় তখন আনন্দ হয়। আমাদের চলতি কালকেই অতীত কালের মধ্যে নতুন করে আবিষ্কার করি, বেঁচে থাকার মূল্য অন্য যুগের কাছ থেকে যাচাই করে নিই। তখনকার একখানা ভাঙা কলসের মধ্যে জীবনযাত্রার সঙ্গে সেকালের ভালবাসার স্বাদ পাই। চীনে কবিদের বাণীতে মানবজীবনের এই প্রতিদিনের পথচলা রাস্তায় প্রত্যক্ষ পদবিক্ষেপ যেমন সহজভাবে দেখতে পাওয়া যায় এমন আর কোনো দেশের কবিতায় দেখিনি। কোনো একটা বড়ো উপদ্রবে মনের দর্পণ যখন বেঁকে চুরে গেছে তখন তাতে সংসারের যে প্রতিবিম্ব ত্যাড়াবাঁকা হয়ে পড়ে তাতে চিরকালের মানুষের সহজ ছবি পাই নে, সব কিছুর সঙ্গে একটা ব্যঙ্গ মিশে থাকে—সেটা হয়তো সেই সময়কার ঐতিহাসিক মেজাজের একটা তীব্র পরিচয় দেয় কিন্তু সেটা সব সময়কার নয়। যথার্থ সব সময়কার বলে কিছু আছে কিনা সন্দেহ করতে পার। আমার মনে হয় আছে—জগৎসংসার থেকে দীর্ঘকাল ধরে মানুষ যে রসকে আগ্রহের সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছে, বলেছে হাঁ, তাকে সে স্থায়িত্ব দেবার জন্যে এমন একটা রূপ দিতে চেয়েছে যাকে বলা যায় সুসম্পূর্ণ, পর্ফেক্ট্। ইস্ফাহানে যে মসজিদ দেখেছিলেম তাতে মানুষের যে যত্ন প্রকাশ পেয়েছে সে বীর্যবান যত্ন। সুবৃহৎ সুসম্পূর্ণতার জন্যে বিপুল অধ্যবসায়। আমি মুসলমান না হতে পারি * * * কিন্তু সেই স্থাপত্যের পরে একটি ওঁ মন্ত্র ধ্বনিত হয়েছে, মানুষ বলেছে হাঁ, স্বীকার করে নিলুম। আমার অমুসলমান মনও তাকে স্বীকার করে। কিন্তু যা অস্বাস্থ্য, যা বিকার, যা মুদ্রাদোষ তা সাইকলজির বিষয়, তা কবিতার নয়। মানুষের বড়ো সাধনা সমস্ত জীবনকে শিল্পরূপ দিতে চেয়েছে, মর্ত্যকে বানাতে চেয়েছে স্বর্গের কল্পমূর্তিতে। সাহিত্য এবং চিত্রকলা প্রথম থেকেই এই কাজে তাকে সাহায্য করতে চেয়েছে। আধুনিকতা অনেক সময়ে এই ইচ্ছাকে ছেলেমানুষি বলে অবজ্ঞা করে। কিন্তু মানুষের মধ্যে চিরকালের ছেলেমানুষ আছে। সে অনাবশ্যককে লীলাচ্ছলে বানায়। ছন্দে বন্ধে

বাঁকা ভাষায় খামকা মানুষ যে কবিতা লেখে যার মধ্যে অপ্রাকৃত এবং অসংগতও অসংকোচে স্থান পায় সেই খেলাকে কী বলবে? এই খেলাকে খুশির খেলা করতে চায় তার মধ্যে সুন্দরের রস দিয়ে, তাকে কারুশিল্পে মনোলোভন করে। এই হোলো যাকে বলে লিরিক। এপিক হোলো আশ্চর্য্যকে নিয়ে খেলা করা। আর নাট্য হোলো কাল্পনিক ঘটনাবলীকে এমন করে গেঁথে তোলা যাতে সে আমাদের মনে যাথার্থিকের আবির্ভাব আনে। একেও খেলা বলচি এইজন্যে যে, বাস্তবের মধ্যে ঘটনাগুলির সুসংবদ্ধ বাছাই থাকে না, তাতে বহু অবান্তরের মিশোল। সংহত সুসঙ্গত ঘটনাগ্রন্থনে যে নিবিড় যাথার্থ্যের রূপ জেগে ওঠে বাস্তবে তা নেই। নাটকে এই যে বাছাই করা গাঁথুনির কাজ এও শিল্পীর কাজ। এই শিল্পজাত যাথার্থ্যের অনুভূতি যে নিছক সুন্দর হবেই তা নয়, তার বিশ্বাসযোগ্যতা স্বতই আমাদের বিস্ময়ের আনন্দ দেয় কিন্তু তাই যথেষ্ট নয়। যথার্থ বড়ো নাটক আর যাই হোক সবটা নিয়ে কখনো অকিঞ্চিৎকর হতে পারে না—তার নিবিড়তা তার বৃহৎ সত্যদৃষ্টি তাকে তুচ্ছতা থেকে উদ্ধার করে। আমি যে চীনে কবিতার কথা বলছিলেম তা সামান্য কিন্তু তুচ্ছ নয়, তার যাথার্থ্য নিরাভরণ সহজরূপেই প্রকাশ পেয়েছে। আধুনিক কবিদের অনেককে দেখি তারা স্পর্দ্ধার সঙ্গে তুচ্ছকে নিয়ে যেন বাহাদুরির চেষ্টা করে—সামান্যকে সহজ আনন্দের স্পর্শমণির ছোঁয়া দিয়ে অসামান্য করে তোলবার প্রয়োজন স্বীকার করে না। তারা অলঙ্কারকে অবজ্ঞা করে কিন্তু এই অবজ্ঞাই তাদের অলঙ্কারদম্ভ। সহজ জীবনকে সহজ চোখে দেখবার মতো সুন্দর কিছুই নেই, কিন্তু তাকে নিয়ে গায়ে পড়া ওস্তাদীতে মন বিমুখ করে। মহেন্দো-জারোর ভগ্নশেষের থেকে সব অবান্তর বাদ পড়ে গেছে, তার ইঙ্গিতগুলির মধ্যে কেবল এই সহজ কথাটুকু পাই যে, মানুষ সেদিনও বেঁচে ছিল। প্রাণের কাছে প্রাণের বাণী আশ্চর্য্য। নানাবিধ সঙ্কল্প নানাবিধ প্রয়াস দিনের থেকে বাদ দিয়ে যখন আমি জানলায় বসে চেয়ে দেখি, বাইরের আমের গাছে বোল ধরেছে, শীতশেষের রৌদ্রে ঝিলমিল করচে সোনাঝুরির পাতা,

গাছের ছায়ায় নাচচে শালিখ, বিনা কাজে বেলা বয়ে যাচ্চে, তখন বুঝি, এই আমার চীনভাষার কবিতা, এই আমার মহেন্দোজারোর হাজার বছর ডিঙিয়ে যাওয়া সহজ জীবনের এমন একটি স্পষ্ট আভাস যা নূতন যুগের জীবনলীলার সঙ্গে অনায়াসে মিতালি করতে পারে। ২১।২।৩৮

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, তোমার "চেতন স্যাকরা" আগেই পড়েছিলুম। পড়ে রীতিমতো ভালো লেগেছিল। কিছুদিন থেকে তোমাকে লিখব লিখব করছি সময় পেয়ে উঠি নি। তোমার এই লেখাটি আধুনিক কাব্যের একটি সেরা নিদর্শনরূপে দেখা দিয়েছে। কবিতা রচনায় যথেচ্ছ শৈথিল্যের দ্বারা যাকে সহজ দেখায় সে আবর্জ্জনা, কিন্তু যথার্থ যা সহজ তাই দুঃসাধ্য—তোমার এই লেখায় সেই দুরূহ সহজ অনায়াসের প্রতীতি নিয়ে দেখা দিয়েছে। তোমার এই কবিতায় আধুনিকের স্বরূপ আমি দেখতে পেলুম। নিজের চিরাভ্যস্ত রচনাধারার সঙ্গে তুলনা করে সেটা আমার পক্ষে বোঝা সহজ। পাহাড়ে আছি তাই একটা পার্বত্য তুলনা মাথায় আসচে। দূরে পাহাড়ের শিখরের নীলিমার ভিতর থেকে দেখা যাচ্চে নির্ঝরের যাত্রা—সে স্বচ্ছ, সে নির্মল, সূক্ষ্ম আলোয় ছায়ায় রচিত তার উত্তরীয়। তার কলধ্বনিও লাগে ভালো, দৃষ্টির উপরেও তার প্রভাব আছে। সেই ঝরনা যখন নেমে এল নিম্নভূমিতে যেন সব কিছুর সঙ্গে মিলিয়ে সে বিচিত্র, কত ভাঙাচোরা কত খসে পড়া জিনিষকে সে টেনে নিয়ে চলেছে, কত আওয়াজ মিলেচে তার কলস্বরে যার সঙ্গে তার সঙ্গতি নেই, কোথাও ফেনা উঠচে ফেনিয়ে, কোথাও বালি কোথাও কাদা ঘুলিয়ে উঠচে তার আবর্ত্তে—এই সমস্ত কিছুকে আত্মসাৎ করে,

অতিক্রম করে তার ধারা, তার চলমান রূপ, কিছুই তাকে সম্পূর্ণ প্রতিরোধ করচে না, তার সমগ্রতাকে রক্ষা করচে, তার সঙ্গে অনায়াসে মিশিয়ে দিচ্চে তুচ্ছতা, সেই তুচ্ছতাকে উপহাস করবার উপলক্ষ্য দেবার জন্যেই। মনে মনে ভেবে দেখলুম সৃষ্টির এই সর্বগ্রাসী লীলা আমার দ্বারা সম্ভবপর নয়, আমি এখানে নামতে পারিনি। কিন্তু তুমি যে ভূতলচারিণী স্রোতস্বিনীর পরিচয় দিয়েছো, তার সঙ্গে আমার দূরবিহারী নির্ঝরের কোথাও না কোথাও মিল আছে, মিল নেই পাঁকে বোজা ডোবার সঙ্গে। এরা কিন্তু ডোবাকেই আধুনিক বলে। যদি তাকে আধুনিক বলতে হয় তাহলে শ্রাবণ মাসের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে, বর্ষার জল কলকল করে বয়ে যাক, পাঁক গুলে নিয়ে, চিংড়ি-মাছের বাসাগুলোয় বিপ্লব ঘটিয়ে, তীরে তীরে এঁটো বাসন মাজার ঝঙ্কার তুলে, উছলে প'ড়ে গোয়ালঘরের গোবর গাদা লেহন করে, পরস্পরের পিঠে মাথা রাখা ঘোলা জলে নিমগ্ন মোষগুলোকে পঙ্কশয্যার আরাম দিয়ে। এ সমস্তর সঙ্গেই মিল করে ব্যস্ত হয়ে থাকবে শ্রাবণের আকাশ, মেঘের ডাক, আর রিমঝিম বৃষ্টি। * * * ইতি বিজয়া। ১৩৪৬

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আধুনিক "পরিস্থিতি" সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে সময় পেলে পরে বলব।

১৯৪৩

সমর সেন

১

রাস্তায় রক্তের দাগে
মৃতেরা স্মরণ মাগে।
শীতের সন্ধ্যায় কুয়াসায়
ট্যাকসই সংসার ধীরে লুপ্তপ্রায়
শবলোভী শকুনেরা স্তব্ধতায় উড়ে যায়।

বাজারে দারুণ ভিড়, দুর্ভিক্ষের নিদারুণ ছাপ
অনেকের মুখে।
ভারতের হৃৎপিণ্ডে হানা দেয় বিদেশী বণিক
পূর্ব সীমান্তে ক্রমশ জমে পীত সৈনিক।

২

জীবনধারার ছাপ চেতনাকে গড়ে,
চেতনার ছাপ জীবনধারাকে নয়।

আমি সাধারণ মধ্যবিত্ত, চালচুলো বজায়ের চেষ্টা তাই আছে।
কিছু গুণ হয়ত একদা ছিল, এখন ঘুণের পালা।
এ বাঁজা বছরে এক একটি দিন শেষ হয় সন্ধ্যার আড্ডায়,
বাড়ী ফিরে গম-বাজরার রুটি, কিছু পরচর্চা,
ঘুমের আগে ইতস্তত চিন্তা, অস্বস্তি ;
বাইরের রাত্রি হয়ত নিটোল নিবিড়,
আধো ঘুমে আধো স্বপ্নে আমার রাত্রি কাটে,
অধিকাংশই উৎকণ্ঠার স্বপ্ন।

৩

তোমার বিষাণ বজ্রে বাজে!
নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত দুর্ভিক্ষের ধূপে,
লোলজিহ্বা, করালবদন!
পদপ্রান্তে নিরুদ্দেশ ধান আর গম,
আর পুঞ্জীভূত পুরুষের প্রাণহীন দেহ,
ছিন্ন শিশুর রক্তজবা!
ঘূর্ণীঝড়ে, বন্যায়, বিস্ফোরকে জয়বাদ্য বাজে।

তোমার দুর্দান্ত আমলে
নরহন্তা বিদেশী রাজ, রক্তজোঁক স্বদেশী বণিক, সর্পিল পঞ্চম বাহিনী
জীবন সঙ্কীর্ণ করে ; সহরে, বন্দরে, গ্রামে
প্রাচীন সভ্যতা ধোঁকে ঘেয়ো কুকুরের মতো।
যাত্রা তোমার কবে শুরু, কোথায় শেষ !
মধ্যনেত্র খরসূর্যের তলে
অন্তহীন বালুতে
কুব্জপৃষ্ঠ, ন্যুব্জদেহ সারি সারি উট
আদিগন্ত চলে।

৪

অন্ধ বধির খঞ্জের দলে ভিড়ি,
যেখানে অন্তরঙ্গ বন্ধুরা আমার—
পেশাদার নেতা, কৃষভক্ত সৌখীন কবি, চিন্তিত কেরানী,
কিম্বা স্বাধিকারপ্রমত্ত স্বামী,
বোমারু আকাশের তলে মূষিক-বিবরে
ঈগল আকাশের নিচে মূষিক পৃথিবীতে
দ্বিখণ্ডিত-সত্তা জীবনের উদ্বিগ্ন ক্লান্তিতে
হাশিশ খোঁজে দ্বিধান্বিত নানা ভ্রান্তিতে।

৫

মধ্যদিনে গান বন্ধ করে পাখি।
কারখানায় সংঘবদ্ধ জমে অনেকের ভিড়,
হাতে বিপ্লবের রাখী !
পোড়ামাটিতে অস্ত্র হাতে প্রহরী জাগে ক্ষুধিত কিষাণ।
ভয়াবহ রণক্ষেত্রে লালসৈন্য ঢালে প্রাণের আবীর
সহসা মধ্য দিনে বাজে কালের বিষাণ।

অগ্রচারী জনতা নই,
তোমার বিশ্বরূপে তাই দেখি ধ্বংসের প্রতীক !
অজ্ঞের দম্ভ চূর্ণ কর, ইতিহাসপতি,
বিপ্লবী চেতনার সেতুতে
সঙ্কীর্ণ কর এ দুস্তর ব্যবধান,
তোমার অখণ্ড সত্তায় দাও অধিকার
এ প্রার্থনা আমার।

সীমান্তের অরণ্যে রাক্ষসের মুখে শুনি রামনাম,
পিছনে তার প্রচ্ছন্ন কামান !
নদীতে ডেকেছে বান, পাখীরা গায় না গান,
একে একে লুপ্ত দেশ নারকীয় অন্ধকারে,
তবুও আলোর চুম্বকস্তম্ভ এদিকে ওদিকে বাড়ে,
ভুলে, ভ্রান্তিতে, উৎকণ্ঠায়, নতুন জীবনের ছাপ
আমাদের চেতনায় পড়ে।

চাঁদ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

মুক্তির নিশ্চিন্ত শব্দ একটানা ধ্বনিল আকাশে,
বাহিরে আসিতে তবু ভয়—
মনে হলো নগ্ন চাঁদ ছিন্নভিন্ন প'ড়ে আছে ঘাসে
গলিত দলিত রক্তময়।
বাহিরে দাঁড়ানু এসে : ঝলিতেছে সেই চেনা চাঁদ;
ঝরিতেছে শীতল ময়ূখ ;
এ তো নয় সেই জ্যোৎস্না, রজনীর অলজ্জ আহ্লাদ—
অগ্নিজিহ্বা খরশরমুখ।

মৃত্যুর দূতিকা এ যে, ত্রাসগ্রাস, ধ্বংসের ধাবিকা,
উগ্রম্পশ্য আজি তার হাসি ;
এ মরীচি ভ্রমজাল, এ যে মরীচিকা—
হিংসাহীন, আসলে মাংসাশী।

এত দিন প্রেম ছিল, সাথে ছিল প্রমোদকল্লোল,
গতক্লম কোমল বিরহ ;
দুলেছিল এত দিন বাহুবন্ধে আনন্দ-হিন্দোল,
বিশ্ব ছিল বিস্ময়-আবহ।

কেননা সে চাঁদ ছিল—সমুৎফুল্ল সমুদ্র-চন্দ্রিকা,
আদিগন্ত ছিল অনাবৃতি :
আজি তার বাঁকা ঠোঁটে সকৌতুকে আঁকা বিভীষিকা,
দুই চোখে বিস্তৃত বিকৃতি।

অরণ্যচন্দ্রিকা আজ। নির্বাসন, নির্বাণ-প্রাপন—
আজি মোরা অন্ধকার ঘরে ;
কৃষ্ণবর্ণ শেষ তিথি করিতেছি একান্তে যাপন
নবতন প্রভাতের তরে।

ধরণীর গলগ্রহ, মৃত গ্রহ, জর্জরিত জরা—
কক্ষচ্যুত, হবে বরবাদ ;
নতুন মৃত্তিকালেপে গড়া হবে যবে বসুন্ধরা,
নতুন উদয় হবে চাঁদ।

তত দিন চাঁদ নাই, অশ্রু নাই, নাই কোনো হাসি,
নাই কোনো প্রেম কিম্বা ক্ষমা;
আছে শুধু অভ্রলেহী লোলজিহ্বা ক্ষুধা সর্বগ্রাসী,
উদ্দাম উদ্ভ্রান্ত পরিক্রমা।

মনোভব

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

শর-সন্ধান হয়নি বিফল, জানি জানি মনসিজ,
অনঙ্গ তব ভঙ্গিমা আছে জানা,
ফুলবনে রাখি নিজেরে গোপন, ফুলধনু লও হাতে
ভ্রমর-কৃষ্ণ রেখা ভ্রুভঙ্গে টানা।
কুঞ্চিত তব শুভ্র ললাট, বঙ্কিম হাসি ঠোঁটে
ভাঙা হৃদয়ের বেদনায় রাঙা হাসি,
আজি বুঝি মোরে মনে পড়ে গেল, এতদিন পরে হায়
মনোমুকুরের ছায়া প'ল সেথা আসি।
হে ফুলধন্বা, ধন্য তোমার তীক্ষ্ণ সায়কখানি,
সুতীক্ষ্ণ তব দৃষ্টিরে বলিহারি,
মনোভব, তুমি অনুভব যত মনের গোপন কথা,
কন্দর্পের দর্প বাড়াল নারী।

প্রথম যেদিন হেরিনু তাহারে, ছায়াপটে ছবিসম
কুয়াসায় ঢাকা দূর নভোনীলিমায়,
অবগুণ্ঠিতা উষার লজ্জা, হেরিনু তাহার মুখে
উদয়ভানুর প্রথম রশ্মি ভায়।
তনুদেহখানি লাবণ্য ভরা, ঢলঢল দু'টি আঁখি,
উরস উষসী কামনার দুটি ফুলে,
গুরু উরুভারে অলসগমন, জঘনে মেখলা দোলে
নীবি-বন্ধন ক্ষণে ক্ষণে যায় খুলে।
চারু চরণের মঞ্জীর ধ্বনি অন্তরে দেয় দোলা
অবাক হইয়া চাহিনু মুখের পানে,
কস্তুরী মৃগ আপন গন্ধে উতলা হইল বুঝি
অতনুর দাহ তন্বীরে কাছে টানে।

কুসুম-শয়ন হইতে বুঝি বা হঠাৎ উঠিলে জাগি,
আশ্লেষে টানি রতিরে ধরিলে বুকে,
চুম্বনে তার স্বপন ভাঙিল, ফুলধনু দিল হাতে
জয়-উল্লাস ফুটিল কি তব মুখে ?

কখন না জানি গোপনে তোমার ফুলশর বুকে বিঁধে
রভস-আবেশে ব্যাকুল করিলে মোরে,
না জানি কখন উতলা অধীর রোমাঞ্চ এল দেহে
অধরে অধর বাঁধিলাম বাহুডোরে।
বাহু-ডোরে বাঁধি বাঁধা পড়িলাম চিরজীবনের ঋণে,
ক্ষীণ-যৌবনে জীবন বঞ্চনার,
দেহ-ভোগবতী রতিবাসনার, তরঙ্গ-সমাকুল,
স্বর্গ মর্ত্ত্য হয়ে গেল একাকার।
জয় হ'ল তব হে বিজয়ী বীর, কার হ'ল পরাজয়
রতিবিলাসের মোহে যেও নাক ভুলে,
চির-যৌবন-ভুঞ্জনে যদি হলে এত নিষ্ঠুর,
ফুলশর তূণে রেখে দাও তবে তুলে।

সামুদ্রিক

অমিয় চক্রবর্তী

বালিতে রং-ছুট পল্লীসমুদ্রতটে
আসি জনালয় সহর হতে বিরলে।
মনশূন্যতায় বার করে রংরেজিনী
কত রং কত রং
বিভ্রম নেশার রচনা নিঃস্ব বালির পটে।

কার্পেটবুনোনি দেখেছি বিবর্ণ মরুর ইরানে
রঙের ক্ষিধেয় রং তৈরি ; কিছু স্মারণিক ;
সঞ্চিত বর্ণানেকান্। নীলের নীলা,
স্বপ্নের নীল ; কখনো-দেখা ঘাস, গাঢ়তর
আশ্চর্য সবুজ প্রাণ শ্যামলিত ;
রক্ত তো জানা, তারি লাল ; অগ্নির অগ্নিবরণ।
রঙীন হাওয়ার উড়োনি মেঘে মেঘে।
রেখার কাহিনী
জাগে আদিম অনুপ্রাসে
আঙুলের তলায়
ঘুরন্ত, স্থির ;
মনোনয়ন ডোবে ছন্দে মদির।

সহরের রঙবেরঙের উদাসীন বাহুল্যে
শাদা কথার পরিচ্ছদ প'রে বেড়াই—
এখানে এই আমার পালানোর ম্যাজিক কার্পেট বোনা
এবং তাতে চ'ড়েই কাব্যিক আনাগোনা ॥

অর্কেষ্ট্রা

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

(১)

বেদনাবিস্ময়ে আমি চেয়ে দেখি উদাত্ত আঁধার
ভ্রমরের মতো কালো কম্পিত চোখের দীঘি তার।
এক পাশে বহু দিন সুগন্ধের আত্মসমর্পণে
ছায়া ফেলে পাখা মেলে উড়ে যায় মনের দর্পণে।
আমি ভাবি, শুধু ভাবি, কালো চোখ তার।

(২)

চাঁদকে তুমি জ্বালিয়েছো
স্বপ্নে আগুন লাগিয়েছো
অনেক রাতে অনেক দিনে
অনেক খুসির আকর্ষণে
আমায় তুমি ভাবিয়েছো।

(৩)

এক ফালি চাঁদে কী হবে আজ্‌কে বল না!
অনেক দেখেছি, চিনেছি ও-বাঁকা ছলনা।
একা নিরিবিলি খেয়ালের ছায়াপথে
ঘোরা শেষ করে এসেছি তোমাকে নিতে।
দূরে দেখো ঐ নীলার আকাশ, মমতায়
আরো নীল হোলো। নেমে এসো এই জনতায়।

(৪)

তনুতে তনু আঁখিতে আঁখি মনে পঞ্চশর
বাদল দিনের মেঘের হাটে হ'লে জাতিস্মর।
কাট্‌ছে বেলা হলুদ্‌ আভায় নীলের চন্দ্রাতপ
জীবন বনের ক্লান্ত পাখার তীব্র মনান্তর।

(৫)

দিন হোলো নিঃশেষ
রাত হোলো নিঃঝুম,
মন হোলো উন্মন
প্রেম আর, আর ঘুম।

একটা রাত

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

শূন্য পথে শুধু 'এ আর পি'র বাঁশী,
মেঘের মত গুরুগুরু শব্দ, বিহ্বল আকাশ।
—তাজমহলের উপর হীরের চাঁদ জ্বলছে
পূর্ণিমায় তাজমহল মনে পড়ে?

একদিন জ্বলন্ত জ্যোৎস্নায় পথ চলতে চলতে
হাতের মুঠোয় তোমার হাত ধরেছিলাম,
তোমার হাত কেঁপেছিল থরথর করে।
ব্যাফ্‌ল-ওয়ালের পাশে বালতি, স্টিরাপ্‌ পম্প,
হাতের মুঠোয় ছোট কুড়ুল,
পুরু দেয়াল থরথর করে কাঁপে।

শূন্যপথে 'এ আর পি'র বাঁশী।
বহু দূরে, পুরীর সমুদ্র তীরে,
বলিষ্ঠ নুলিয়ার গান।

ঘরে, বিদ্যুতের মত হঠাৎ আলোর ঝলকানি,
বজ্রের মত শব্দ,
বিহ্বল আকাশে রাতজাগা কাক;
(একদিন হাতের মুঠোয় তোমার হাত ধরেছিলাম)
পথে 'এ আর পি' হাততালি দিয়ে ওঠে,—
মনে হয় অন্ধকারে কার যেন অদৃশ্য হাসি।
(তাজমহলের উপর স্ফটিকের চাঁদ মনে পড়ে?)

পুরু দেয়ালের পাশে
হিমের মত ভয়
হামাগুড়ি দেয়।

বিরাট পাহাড়ের মুখোমুখী যেন।
অচেনা গুহায় অন্ধকার
আর
ভয়ঙ্কর স্তব্ধতা।

প্রাচীন পারসীক হইতে

১

প্রমথনাথ বিশী

দৃষ্টি তব কেন সখী রঞ্জিলো আমায়!
ভাবিছ এ স্তুতিবাদ, প্রগল্‌ভ প্রলাপ?
দেখো, দেখো, চেয়ে দেখো চোখের সুরায়
মত্ত হ'য়ে গন্ধরাজ হ'য়েছে গোলাপ!

তোমার সৌন্দর্য্য-কশা মোর মনোরথ
উদ্দাম করেছে কোন্ নিরুদ্দেশ পানে।
দেখো, দেখো, চেয়ে দেখো বিলুপ্ত জগৎ,
স্বর্ণচূড় স্বর্গপুর দৃষ্টি মোর টানে।

সোনার কলস যুগ করিয়া নির্ভর
বাসনা সমুদ্রে ভাসি, পথ নাহি চিনি;
দেখো, দেখো, চেয়ে দেখো, সব স্বপ্নোত্তর
দুস্তর সিন্ধুতে জাগে কমলে কামিনী।

সব মিথ্যা? তবে কেন উঠিছে ঝলকি
জলন্ত চুম্বন তব তারকায় সখী?

২

তোমারে ভুলিব সখী করিয়াছি পণ।
এ জীবন হরধনু অন্তিম টঙ্কারে
ভাঙে যদি সে প্রয়াসে—ভাঙুক এখন।

বঙ্কিম অধরে তব ছোটে বারে বারে,
মদনের ধনুশ্চ্যুত যে হাসির তীর,
বিস্মৃতিতে পরাজয় করিব তাহারে।

তোমারে ভুলিব সখী, করিও নির্ভর।
চুম্বনে গোলাপ-ফোটা গ্রীবায় মদির
আর জেনো বহিবে না বসন্তের ঝড়।

আপন হাসির শর-শয্যায় সেদিন
বেদনায় উদ্‌যাপিবে; জলন্ত তৃষায়
প্রেমের চাতক সম বাজাইবে বীণ।

তোমারে ভুলিব, কিন্তু ভুলিয়া তোমায়
আর কি রাখিব মনে—তাই ভাবি হায়।

ভাঙা মন্দির

শচী রাউত রায়

ভাঙা মন্দিরের মুখশালা দেখেছ ?
কোনারকের সচিত্র শ্মশানে—

অশ্বত্থের করুণ ছায়ায় ভাঙা বিষ্ণুর মাংসপেশীতে
অনেক অনেক কিন্নরী, নটনটী আর যক্ষবধূর
পাষাণী মূর্ত্তির চাপা হাসিতে
এক বিরাট কল্পনার চূড়া মাথা তুলেছিল
নৈর্ব্যক্তিক স্বপ্নের ইন্দ্রজালে।

এই পাথুরে পার্ব্বতী এককালে জীবন্ত ছিল।
আর এই নাগকন্যারা হাজার হাজার সবুজ পরীর সঙ্গে
বেঁচেছিল কোন নিভৃত গ্রামের অন্তঃপুরে—
কোন নিরালা পুকুরের ঘাটে—নদীর ধারে,
তাদের মাটির কলসীর মত
তারা শিল্পীর মনে ভ'রে উঠেছিল
নিজেদের খণ্ড খণ্ড ইতিহাস নিয়ে !

তার পরে শিল্পী এলো চন্দ্রভাগায়
মাঝ দরিয়ায় মন্দির তোলার স্বপ্ন নিয়ে।
তার স্বপ্নের জীবন্ত শিষগুলি রূপ পেল
পরি হয়ে, কিন্নরী হয়ে—উর্ব্বশীর করুণ স্তনের
স্তবক হ'য়ে ফুটে উঠলো তারা কবিতার ঢেউয়ে
এই শ্বেত পাথরের বুকে।

লাল বাছুরের মত রক্তিম সূর্য যখন
আকাশ থেকে লাফ মারে তার মন্দিরের নির্দ্দিষ্ট সিংহাসনে
অসংখ্য হরিণ আর কৃষ্ণ-মৃগের চোখে চোখে,
ঝরে যখন তার লাল, নরম আলোর ইসারা,
আমি তখন খুঁজি সেই জ্যান্ত মানুষগুলিকে।

ওর আগে, অনেক অনেক ধূসর শতাব্দীর আগে
কোন মৌসুমীর চঞ্চল আভিজাত্যে—
নূতন ফুলের রাজধানীতে, শীর্ণ ঝাউবনের সবুজ ছাতার ছায়ায়
তারা একদা বেঁচেছিল
আমাদের মত।
তুমি জানো না ?

মৃত বন্দর

শচী রাউত রায়

পাহাড়ের পিলসুজের উপরে পাথরের এক দীপ,
তখনকার দিনের বাতিঘর।
আর দূরে উটের বাঁকা কুঁজের মত পাথরের বিবর্ণ স্তূপ।
এরই নীচে ধ্যান-মগ্ন জীর্ণ লোহার নোঙর অতল সমাধির ঘুমে।
অধুনা বিস্তীর্ণ এই বালুচরে—খণ্ড খণ্ড শস্যদ্বীপে
খেলা করতো সাগরের অসংখ্য সাদা ঢেউ
হালকা পাল তুলে ভেসে যেত লাখ লাখ বলাকা-তরী
এই বালুকাকীর্ণ জঙ্গলে ;
অনেক অনেক ধূসর শতাব্দীর যবনিকার আড়ালে আজ দেখা
যায় তাদের মাস্তল !

জাভা, বোর্নিও, সুমাত্রা এবং লবঙ্গ দ্বীপ,
কিংবা দারুচিনির শ্যামল অন্তরীপ থেকে
মশলা-বোঝাই অসংখ্য জাহাজের আনাগোনা
এই ট্রেনের লাইন ধরে, লোহার সেতু ডিঙিয়ে।

ছোট পায়ের মুখর নূপুর মৃত বন্দরের ঘাটে ঘাটে,
কচি কলাপাতার শাড়ীতে কাঁচা দেহের তনিমা
অবগুণ্ঠিতা।
চালের সরা, অর্ঘ্যের ডালা পড়ে যেত মাটিতে
ফিরে পাওয়া প্রিয়ের স্মৃতিতে অন্যমনস্কা।
কুমারী ননদের বক্র হাসি হজম করত কেউ।
ব্যর্থ অর্ঘ্য—কে এল?
সাধব * মেয়েরা ত্রস্তচকিতা।

পোকার লোভে ব্যস্ত চিল, নীল হ্রদের তীরে।
দূরে পাহাড়ের গৈরিক পথ দিয়ে গরুর গাড়ীর মন্থর যাওয়া আসা
ধানের ক্ষেতে তালপাতার টুপি মাথায় নগ্ন নিরন্ন চাষীরা,
মাছ-বোঝাই মালগাড়ী চলে যায় নিঃশব্দ গতির চমকে
চিল্কার বুকে নোংরা ছায়া ফেলে।

সে আর ফিরে আসে না।

মৃত বন্দর।

* সাধব—উড়িষ্যার প্রাচীন বণিক শ্রেণী।

কোকিল

বিমলচন্দ্র ঘোষ

পুরোনো ফাগুনে পুরোনো কোকিল যখন ডাকে
জানি না কা'কে—?
মনে পড়ে যায় দুপুর বেলায়
যেই ফাঁক পাই কাজের ঠেলায়
দক্ষিণ থেকে উষ্ণ উদাস বাতাস বয়
আকাশ ময়।
কবে যে কখন বয়স বেড়েছে
কত সঙ্গীরা সঙ্গ ছেড়েছে
নতুনেরা কত এসেছে
সকাল সন্ধ্যা দুই দিগন্ত রঙের প্লাবনে ভেসেছে।

আজো ফাল্গুনে বসন্ত আসে মূর্চ্ছনা কাঁপে পঞ্চমে
নানা অকারণ চিন্তায় মন থম্‌থমে!
সূর্য্যের পানে চেয়ে থাকে রাঙা পলাশবন
উদাস মন!
ক্লান্ত জীবনে পুরোনো কোকিল যখন ডাকে
জানিনা কা'কে?
মনে পড়ে যায় বড় অবেলায়
ব্যঙ্গের মত বসন্ত যায়
বনপথে শুনি চিরদিনকার কোকিল ডাকে
কাজের ফাঁকে!

ভাগ্য-লিখা

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

আজকে আমার প্রভাত
রূপ নিয়েছে তারি দেহের লাবণ্যে,
স্নিগ্ধ তারি হাসিতে।
তারি চোখের করুণ চাওয়া
সঙ্গীতে আজ উঠছে বেজে
বক্ষে আমার, আমার ব্যথার বাঁশিতে।
চাওয়া আমার,—আমার পাওয়া
ফুলের মতন উঠল ফুটে সকালে।
হয়তো ক্ষণিক আয়ু তার,
বিদায়-বেলার ইঙ্গিতে কখন
পড়বে ঝরে গভীর ব্যথায়
ধূলায় লুটে করবে হাহাকার।
সন্ধ্যা যখন আসবে নেমে
তখন জেলে
ব্যথার প্রদীপশিখা
নির্জ্জনে আমি দেখবো চেয়ে
ভাগ্যে আমার কাহার হাতে
কি যে আছে লিখা।

বৈকালী

বিষ্ণু দে

অধীর, তোমার মুখর দিন
ক্ষান্ত করো,
মূকবধির নীল আঁধারে
শান্ত করো! হে চঞ্চল!

ধূসর ধূধূ সহর ডাকে
হাজার ডাকে
ভিড়ের বাটে, টাকার হাটে
কাজের ডাকে,

প্রখর তাপে অণুরা কাঁপে
রৌদ্র দাহে
দুচোখ জলে, হৃদয় চলে
লূ-প্রবাহে, হে চঞ্চল!

এ অঙ্গার ছেড়ে হৃদয়
আঁধার হোক্,
লোকমতের সদসতের
হাজার লোক,

বেকারই ভালো, বাজার ছাড়ো,
আদিম রাতে
নিবাতনিষ্কম্প মন,
ঘুমের হাতে,

পাহাড়ঘেঁষা ঝিল্লীবনে
সঙ্গী নেই,
মনের জ্বলা বীরজনের
ভঙ্গী নেই,

বুনোঘাসের গন্ধে ভেজা
অচঞ্চল
গোপন নীলে জীবন খোলে
চিরায়ু দল, হে চঞ্চল!

ক্লিয়োপেট্রার প্রতি আণ্টনি

গোলাম কুদ্দুস

আর এক রাত্রি ছিল যখন এমনি অন্ধকার
নেমেছিল শীর্ণ স্রোত নাইলের বালুকাবেলায়।
এমনি বাসনামত্ত কম্পমান যৌবন সম্ভার
জ্বলেছিল সীজারের আলিঙ্গনে, বক্ষের চূড়ায়
পড়েছিল বক্ষ তার, দু'টি অঙ্গ সোনালী বন্ধনে
কেঁপেছিল আজিকার ঠিক মত উল্কার আবেগে।
এখনো অনেক রাত্রে, জানি সখি, রাণীর প্রাঙ্গণে
সিজারের ছায়া জাগে আমার স্পর্শের আলো লেগে!

তবু বহুদিন পরে প্রিয়তম বন্ধুর সাক্ষাৎ
আভাসে পেলাম আজ, ধন্যবাদ তোমাকে, সজনী!
তোমার নিশ্বাসে তার কামনার উচ্ছল প্রপাত
সীজারের ওষ্ঠহাসে করো তুমি চুম্বন যখনি।
তার দিগ্বিজয় নেশা রক্তে এসে লাগে অকস্মাৎ
ব্যাকুল তোমার বক্ষে শুনি যেই তার বক্ষধ্বনি!

স্বগত

নরেশ গুহ

এ পৃথিবীতে এলাম
কিসের অধিকার পেলাম?
চালে খড় নেই, পুকুরে পাঁক
আকাশে বাজে মশার ঝাঁক।
চায়ের বাটি তাও খালি,—
নির্দোষ নেশা করব যে পেশা
সে গুড়ে বালি।

আশ্বিন

নরেশ গুহ

শরতকালের চেনাদিন আর খুসীভরা ঝর্ঝরে কিরণে
মিলে মিশে গেল এক হারা কাল আর এই উজ্জ্বল প্রাকৃতিক হিরণে॥
নতুন পল্লব :
কালো আর নীলকণ্ঠী ছোপ দেওয়া দোয়েলের আপন মনের স্বর
স্নেহের সজীব মাধুর্য্যে
শুকনো মনকে তাজা আশ্বাসে করছে ভরপুর।
অনেক করুণ হাহাকার আর বাঁকানো মনের চাপা কান্না
গ্রামের আকাশ তলে মাথা ঝেঁকে বলছেই—
—থাক্ থাক্ সুর না—গান না—
তাই রাতকে কাল ডেকেছিলেম ঘুমের আগে—
জৌলুষ মাখানো লক্ষ তারার দিকে চেয়ে—
এবং ভুলতে পারছিলুম না যে একরকমের অবিশ্বাস্য আধখণ্ড চাঁদ
এই মরা দেশকে আগাগোড়া ছিল ছেয়ে,—
তারপর হঠাৎ এই সকালবেলা যখন ফুরিয়ে যাচ্ছে রামধনুর মতো
নির্লজ্জ অভিজাত কাশফুলেরা প্রণামের ছাঁদে মাথা করছে নত
কার যেন পুজো হচ্ছে কোথায় আজকেরই দুর্লভ শরতকালের ভোরে
কুঞ্চিত উপোসী মন নিয়ে ছোটোলোকের মতো
আমি পড়ে রইলেম দোরে।

কার্সিয়াং

জগন্নাথ বিশ্বাস

কুয়াসায় মেঘে ঢাকা কার্সিয়াং-এ
থামলো গাড়ী,
তন্বী আলোয় এলো আপেল রং-এ
পাহাড়ী মেয়ে।

ধূমায়িত পাইনের বনে
সরল ঋজুতা বুঝি এনেছিল হাওয়া,
পাহাড়ের মৃদু ফুল
ফুস্‌ফুসে গেল স্বাদ পাওয়া।
ঝর্নার দেখেছি যে উচ্ছল হাসি
রক্ত ঠোঁটে
ফোটে সেথা রেখায়িত ফুর্ত্তিধারা
জজ্বা-তুষারে হোলো সূর্য্যোদয়।

বিরাট পাহাড়ের স্মৃতি ভেদ ক'রে
ছেড়ে গেল কার্সিয়াং।

শকুনি

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

শবাচারী ছায়া তব পক্ষ মাঝে বাঁধিয়াছে বাসা।
ক্ষুরধার আকাশের সুনীল ইস্পাতে তব শাণিত দুরাশা
একে একে গুণি লয়, ভরি লয় ক্ষুধার থলিতে
বিক্ষিপ্ত শবের গন্ধ। মাঠে মাঠে অলিতে গলিতে,
শকুনি, এ অক্ষক্রীড়া কবে হবে শেষ।
হৃত-দেহ-রাজ্য এই পুতিপঙ্কে ঢাকা—
মৃগরক্তে তীক্ষ্ণ বক্র নখ-চঞ্চু মাখা—
নির্ব্বোধ পাণ্ডবসেনা এখনও নিঃশেষ
করে নাই তোমার ও জটিল লালসা।
তাই বুঝি পৃথিবীর নিরীহ প্রাকারে
বিষাক্ত পক্ষের ছায়া শবলুব্ধ নামে বারে বারে,
হিংস্র দুঃস্বপনে ভরে রাত্রি তন্দ্রালসা।
আর কত দিন! জানি চঞ্চুর নিষ্ঠুর লীলা ক্রমে
লয় পাবে, ভবিষ্যের বসন্ত-আশ্রমে ॥

যোদ্ধা

সুধীরকুমার চৌধুরী

সে ত কেবল চায়নি পেতে, এসেছিল যুদ্ধে যেতে।
বলেছিল, শত্রু কে সে, কাছে কিম্বা দূরের দেশে,
দেখব কে যে হারে-জেতে পেলে তারে এই নিমেষে।

বর্ম্ম পরে, চর্ম্ম আঁটে, মন বসে না রাজ্যপাটে।
শত্রু কে সে নেই তা জানা, জানে না কেউ তার ঠিকানা,
দিগ্বিদিকে মাঠে-বাটে তবু দিয়ে বেড়ায় হানা।

তুমি ছিলে পথের পাশে, ভাল ক'রে দেখল না সে!
হাতে তোমার সোনার থালা, সাজানো তায় বরণমালা,
তাই শুধু তার চক্ষে ভাসে, বুকে জ্বলে বিষের জ্বালা।

আছ তুমি, এইটুকুরে মনে রাখে গানের সুরে!
রুদ্রতালে সে গান বাজে তার অসি-ঝঞ্ঝনার মাঝে,
বাজতে থাকে ঘোড়ার খুরে একই তালে সকাল সাঁঝে!

তোমার ভালবাসার টানে যায় চ'লে সে দূরের পানে।
তুমি যদি পিছন থেকে "যাও কোথা গো," শুধাও ডেকে,
সে-কথা সে নেয় না কানে, এমন ক্ষ্যাপা দেখেছে কে?

ভয়ে মরে, যদিই পাছে ডেকে তুমি বসাও কাছে।
যদি বল, "চাও যে ধনে, দুটি আঁখির উদ্দীপনে
দিতে পারি সাধ্যে আছে," বাঁধো পাছে সেই বাঁধনে।

সহজ যা তা যায় সে ছেড়ে, চায় শুধু কোন্ দুরূহেরে।
দুর্গমে তাই তাহার গতি, মনের সুখে মানে ক্ষতি,
সব-ছাড়া যে-গ্রহের ফেরে তারই পায়ে জানায় নতি।

চায় সে বরণ-মাল্যটিরে বিজয় মালার মূল্যে কি রে ?
এইটুকু তার সুখের লাগি' দিন কাটে কি যুদ্ধ মাগি',
তোমার পানে চায় না ফিরে, তোমার তবু অনুরাগী ?

কবে সে কোন্ গহন-রাতে উত্তরিবে খড়্গ হাতে,
যেখানে তার সকল জ্বালা কাল-বাসুকির বিষে ঢালা,
নিভিয়ে জ্বালা রক্তপাতে শেষ হবে তার খোঁজার পালা।

অতল সে কোন্ আঁধার-তলে ঝিলিক্ দিয়ে মাণিক ঝলে।
বাসুকি তার ফণার 'পরে সেই মণিটি আছে ধ'রে,
এই ধরণীর চোখের জলে গড়া যা যুগ-যুগান্তরে।

যুদ্ধে মাতে তোমায় ভেবে, তোমার ঘরে প্রদীপ নেভে।
রিক্ত করি' সোনার থালা ছিঁড়তে বস বরণ-মালা,
চোখে আসে ক্লান্তি নেবে।—তোমারে দোষ দিইনে বালা!

সুখ ছিল না অমনি পেয়ে, তাই সে আসে রক্তে নেয়ে।
নয়ত কেন সর্ব্বনাশা পরাণে তার এই দুরাশা,
নামবে সে সেই পাতাল বেয়ে কাল-বাসুকির যেথায় বাসা।

আনবে জিতে মাণিকটিরে পরিয়ে দিতে তোমার শিরে।
হায় গো, মণি তোমায় দিতে ফিরবে যে সে শূন্যভিতে,
রক্ত ধুয়ে অশ্রুনীরে হারবে সেদিন যুদ্ধে জিতে।

তখন থেকে রইবে বেঁচে নিজের সাথে যুদ্ধ যেচে।
জানে কোথায় বুকের মাঝে সবার বেশী আঘাত বাজে,
হানবে সেথায় বেছে বেছে জানবে হেরে হারবে না যে!

অতি-চেতন

বীণা বন্দ্যোপাধ্যায়

শুনেছি আমারে ভালবাস তুমি
শুনেছি অনেকবার,
দেখেছি আমার তুচ্ছ খেয়ালগুলি
চুমেছ হাজারবার,
বলেছি আমিও বুঝি বা ভুলে
'ভালবাসি তোমা,' আর
দ্বিধা-কম্পিত ভীরু মন তব, তখনি উছলি' মোরে
চুমেছে হাজার বার!
আজ একবার ভেবে দেখ' ভাল ক'রে,
এ প্রেম তোমার কোথায় পাওনা হোল
অচেতন মন খুঁজিছে কারে ?
ছদ্মবেশী কি কঙ্কাল এই প্রেম
অঙ্গে অঙ্গে জড়ানো অলঙ্কার,
জীবনের নীল ফুল দিয়ে ভরা সাজি
প্রেতেরা পাওনাদার।

আমারে কি চাও, অথবা আমার দেহ!
রেখো নাক' মনে কোনো দ্বিধা সন্দেহ।
আমার দেহের ইতিহাস শোনো তবে—
'আমার সুনীল রহস্যময় আঁখি',
হায়রে ভ্রান্ত, হায় বিভ্রমকারী।
এ আঁখির কোণে জরার কৃষ্ণ রেখা
দেখা দেবে অচিরেই,
সে দিনের কথা মনে মনে ভেবে

চৈত্র, ১৩৪৯

আমার রূপেরে ভালবাস যদি প্রিয়,
তাতে আপত্তি নেই।

মৃত্যুর সাথে শেষ তবু হবে দেহ,
প্রেম যে আগেই যাবে,
যে আবেগে আজ ভরেছি আমার প্রাণ
পূর্ণতা লভি সেও তো বিদায় মাগে।
এ অধীর তৃষা তোমার আমার নহে,
অন্ধ, অন্ধ আবেগ বৃথাই দহে।
কেন এই জালা, মনে এই জিজ্ঞাসা
এই তো সর্বনাশা।
অন্ধতা আরো অন্ধ হোক, হে ভগবান,
ঘনতম মোহ জড়াক চোখ
ক্ষণেকের তরে না দিক পরিত্রাণ।
'এ দেহেরে চাও, কিম্বা আত্মা মোর'
এ-সব কথায় ভেঙো না নেশার ঘোর,
অন্ধ তৃষ্ণা অন্ধ আবেগ মোর,
তাদের তৃপ্তি হোক।

জননী প্রকৃতি জীবন-প্রদীপে নবীন শিখা
কেবলি জালতে চায়
সেই তো আমার নয়নে পরালো মোহের কাজল লিখা।
জননী! তোমারে এড়ানো দায়,
রঙেতে ভুলালে, আবেশে গলালে হায়
আমাদের কত জীবনের ধূলিকণা,
রঙ লেগে যেন হ'লো সে সোনা।

চৈত্র, ১৩৪৯

রঙ তো দেখি না, অন্ধ মত্ততায়
দুটি প্রাণী ভেসে কোথায় চলেছি হায়!
জননী, ক্ষমিও ক্ষমিও মোরে,
চাতুরী তোমার ফেলেছি ধরে।
কেন এই জালা, কেন এই জিজ্ঞাসা
এই তো সর্বনাশা।
হাল ছেড়ে, প্রিয়, স্রোতে নাও খুলে দাও।
জননী, আমার বুদ্ধিরে নাও কেড়ে
আবেগের ঝড়ে মারো অতি-চেতনেরে,
প্রেমের মুখোস না-হয় ফেলেছি ধ'রে,
মোহটারে ছাড়া এখনো দায়,
এ-চেতন মন তবু তো দেহের কাছে
ধরা দিলো নিরুপায়।

জননী, তোমারি জয়!
কখন ভুলায়ে কেড়ে নিলে সংশয়।
দেহ নয় আর, আত্মাও নয়,
আঁখিজল অকারণ,
এ শুধু জননী তোমারি জয়
প্রিয়ের হরেছি মন।
আমি পরাজিত, তবু আনন্দ ফোটে
গান হ'য়ে মোর ভীরু কম্পিত ঠোঁটে
তুমি যা নিয়েছ দিলে তার ঢের বেশি,
আমি বিজয়িনী, এই বারতাই আকাশে বাতাসে রটে।
তবে আজ ফের, বল ভালোবাসো মোরে
বলো বলো বার বার,

চুম্বন তব অন্ধ আবেগে পড়ুক ঝ'রে
অধরে কপোলে তোমার প্রিয়তমার।

কোনো ভারতীয় ভৃত্যের প্রতি*

হর্বর্ট ডেভিস

ঈষৎ-কাঁপা লম্বা বাদামি হাতে
সে নিয়ে এলো রাশি-রাশি সুখাদ্য, ঢেলে দিলে ইন্দ্রদেবের সোমরস।
খেতে-খেতে জীবনমৃত্যু নিয়ে আমাদের ফাঁপা বকুনি জমে উঠলো,
থেকে-থেকে গায়ে লাগে ঠাণ্ডা ভারতীয় হাওয়ার প্রণয়স্পর্শ।

লম্বা শাদা হাত বাড়িয়ে গৃহকর্ত্রী ঘণ্টা বাজালেন।
আহা কী তন্বী মসৃণ অঙ্গুলিকা, দামি-পালিশ-করা চোখা নখের পঞ্চ ফণা।
লাল-রং-করা—নিষ্ঠুর আলোয় যেন বিষাক্ত।
যেন আস্ত একটা যুগের সর্বনাশের আয়না।

ঘণ্টার আওয়াজ ক্ষীণ হ'তে-হ'তে যেই মিলিয়ে গেলো, অমনি এলো সে,
কর্ত্রীর ইঙ্গিতে উপস্থিত ভৃত্য। সেলাম ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো চুপ ক'রে।
জীবন-মৃত্যু নিয়ে তখনো চলেছে আমাদের ফাঁকা বকুনি,
থেকে-থেকে গায়ে লাগছে ঠাণ্ডা ভারতীয় হাওয়ার প্রণয়স্পর্শ।

আলোর কঠিন উজ্জ্বলতার ওপারে রাত্রির অন্ধকারের অতলতা,
তারি মধ্যে মগ্ন তার চোখ;

* এই কবিতাটির লেখক একজন ইংরেজ যুবক, সম্প্রতি R. A. F.-এর কর্ম নিয়ে বাংলা-দেশে আছেন। বলা বাহুল্য, কবিতাটি মূল ইংরেজির তর্জমা।—সম্পাদক।

তার কালো চোখের আড়ালে তার ছায়াচ্ছন্ন মনকে যেন দেখতে পেলুম,
সেখানে কোন প্রশ্ন কে জানে।

ইন্দ্রদেবের সোমরসে আমাদের মন আবিল হ'য়ে উঠলো,
পাগলের মতো বকতে-বকতে টেবিল ছেড়ে আমরা উঠলুম।
আমাদের উন্মত্ত হাসি রাত-জাগা পাখির মৃদুতান ডুবিয়ে দিয়ে
শেয়ালের চীৎকারের সঙ্গে মিশে হো-হো শব্দে উড়ে চললো আকাশের দিকে।

এদিকে তার চোখ রাত্রির অন্ধকারে মগ্ন,
কত শতাব্দীর অচেতন ইতিহাসে যেন আনত,
কালো চোখের আড়ালে তার ছায়াচ্ছন্ন মন—সেখানে কোন স্বপ্ন? কোন প্রশ্ন?

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

সোনার হরিণ, রসময় দাশ। দেড় টাকা
সীমান্তের চিঠি, প্রজেশকুমার রায়। ছয় আনা
যাত্রী, কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য। পাঁচ সিকা
আকাশ ও অঙ্গন, গিরিশঙ্কর দাশ। ছয় আনা
প্রবাহ, অনিলেন্দু চক্রবর্ত্তী। দেড় টাকা
অশ্রু ও আকাশ, পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়। বারো আনা
টুকরো-টাক্‌রা, সুধীরচন্দ্র কর। চার আনা
অস্ত্রে দীক্ষা দেহ রণগুরু, সুধীরচন্দ্র কর। চার আনা

গেলো ছ'মাসের মধ্যে আমাদের হাতে অনেকগুলি কবিতার বই এসে জমেছে। তার মধ্যে কয়েকটির নাম উপরে দেয়া গেলো। প্রথম চারটি বইয়ের লেখক শ্রীহট্টবাসী। কথাটা উল্লেখ করলুম শুধু এইটে দেখাতে যে শ্রীহট্ট ক্রমেই বাংলা কাব্যচর্চার অন্যতম কেন্দ্ররূপে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে

তুলছে—শ্রীহট্টের কবিদের একটি উপবিভাগে যূথবদ্ধ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। এর মধ্যে রসময় দাশ ও কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য সোজাসুজি রবীন্দ্র-ঐতিহ্যে লিখে থাকেন, তবে তার স্বীকৃতি রসময় দাশে বেশি অকপট, ছন্দেও তাঁর দখল বেশি।

বাতাবির গন্ধ বহি' ধরণীতে এল চৈত্রমাস ;
বনের অঞ্চলখালি দোলাইছে চঞ্চল বাতাস।
ভুলিয়া কি গেছ আজ, সেদিন এমনি মধুমাসে
দু'জনে তুলেছি ফুল মিলনের প্রথম উচ্ছ্বাসে ?

রসময়বাবুর কবিতা এই ধরনের। তাঁর বইখানা ভালো লাগবার পথ প্রশস্ত হ'তো, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্তের জ্যাঁকালো ভূমিকাটি না-থাকলে। কৃষ্ণময়বাবুর রচনায়, যাকে আধুনিকতা বলা হয় তার কিছু camouflage আছে, না-থাকলেই ভালো হ'তো। যিনি যে-রকম লিখতে পারেন সে-রকমই লেখেন না কেন ? কাব্যের প্রাসাদে অনেক মহল।

'সীমান্তের চিঠি'র ছোটো-ছোটো কবিতাগুলি স্নিগ্ধ ও ঈষৎ আর্দ্র। এই স্নিগ্ধতা প্রজেশকুমার রায়ের স্বাভাবিক গুণ ব'লে মনে হয়। এক-একটি ছোটো লিরিক তাঁর হাতে বেশ উৎরোয়। কিন্তু তিনি বড়ো যত্নহীন লেখক। খোঁড়া ছন্দ, ভোঁতা মিল, পানসে ভাষা—নিজের লেখায় এ-সবই তিনি ক্ষমা করেন কেন ? কবিতা লিখতে ব'সে রীতিমতো পরিশ্রম করতে তিনি যদি রাজি হন তাহ'লে তাঁর রচনার উন্নতি হবে ব'লে আশা করা যায়। মোটের উপর 'সীমান্তের চিঠি' তাঁর পূর্বের বইয়ের চাইতে ভালো নয়—হওয়া উচিত ছিলো।

'আকাশ ও অঙ্গনে'র ভূমিকা (শ্রীযুক্ত অশোকবিজয় রাহা লিখিত) প'ড়ে জানা গেলো যে লেখক তরুণবয়স্ক। তাঁর রচনায় কবিত্বশক্তির প্রতিশ্রুতি দেখে খুশি হওয়া গেলো।

'অশ্রু ও আকাশ' ২৪টি সনেটের সমষ্টি। বৈশিষ্ট্য না-থাকলেও রচনাগুলি পরিচ্ছন্ন, ছন্দ মার্জিত, মিল ভালো, যদিও 'লোহু-লোনা আঁখিলোর' ধরনের শস্তা অনুপ্রাস মাঝে-মাঝে রসভঙ্গ করে। শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র কর তাঁর নতুন চটি বই দুটিতে নানারকম ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। তাঁর মিল সত্যেন দত্ত ধাঁচের, তাঁর পদ্যের চাল হালকা—হালকা কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য আশা করা যায়। একটি typical স্তবক উদ্ধৃত করি :

সারা আকাশেতে কালো মৃত্যুর হুমকি ;
মৃত্যুকে পাশাপাশি রেখে একই বিশ্বে,
কচি নিমপল্লবে নৃত্যের ধূম কী !
জীবনের জয় ঘোষে কে থেকে অদৃশ্যে।

'প্রবাহ' বইটিতে কিছু পাঠযোগ্য রচনা আছে, তবে সেগুলি অধুনানিন্দিত রোমান্টিক ধরনের। স্বধর্মের চর্চা করলে তিনি হয়তো ভালোই লিখতেন, কিন্তু পাছে লোকে ভাবে যে তিনি যথেষ্ট পরিমাণে আধুনিক নন সেই ভয়ে তিনি বইয়ের শেষের দিকে কতগুলি রচনা জুড়ে দিয়েছেন, যা থেকে একটু নমুনা উদ্ধৃত করছি :

দুর্গা, দুর্গা, দুর্গতিনাশিনী !
ল্যাট্রিন ও টুথ-ব্রাশ
কো-অপারেটিভের বিশুদ্ধ দুগ্ধ,
আর আর্ঘ্য-বেকারীর কেক-রুটি
তারপর চা ও চতুষ্কোন টেব্‌লে
রাজনীতি (ওরফে পরচর্চা !)

আশ্চর্য এই যে এই শেষ খণ্ডের তিনি নাম দিয়েছেন 'প্রগতি'। হায় প্রগতি !

মনে হয় আজকালকার অনেক তরুণ লেখক অনগ্রসরতার অপবাদ ছাড়া আর সব অপবাদই মেনে নিতে রাজি। 'আকাশ ও অঙ্গনে'র লেখকও তাঁর কল্পনাপ্রবণ কিশোর মনের স্বাভাবিক ভাববিলাসকে চাপা দিয়ে এই ধরনের সব লাইনের অবতারণা করেছেন :

ক্ষয়িত জীবনের প্রেতমূর্ত্তি মাঝে
এক জোড়া বীভৎস ক্ষুধার্ত্ত দৃষ্টি।
কালো বাদুড় আর ঝকমকে দাঁতের শ্রেণী।
বাদামী মাংসে লবণের স্বাদ।

এ-ছাড়া আরো কয়েকটি বই আমরা পেয়েছি, যেগুলি উল্লেখযোগ্য নয় কিন্তু যা থেকে দু'একটি উদ্ধৃতি দিলে লেখকদের আত্ম-দর্শনের সুযোগ হ'তে পারে।

হু সিয়ার, হুঁসিয়ার !
সন্ধ্যার দীপ জ্বালিবে যে ঘরে মরিবে সে এইবার।
বোমারু বিমান আসিতেছে ঐ নাহি নাহি নিস্তার।

আর একজন বলছেন :

আজ, হাতুড়ি-কাস্তে বেয়নেট মুখোমুখি ;
শুধু বুলেটের শুনে যাই প্রেমাবেদন,
পৃষ্ঠ-উঁচোনো সরীসৃপ ট্যাংক হাঁকে,
কাস্তে হ্লায় জাতির হৃদয় আশীষ—

এ-ধরনের রচনার জন্ম দিয়েই যাঁরা ক্ষান্ত হন না, সেগুলো বই ক'রে ছাপান, উপরন্তু সমালোচনার জন্যও পাঠিয়ে থাকেন এ-রকম ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশই যেন বেড়ে চলেছে। এখন বোধ হয় জিজ্ঞাসা করবার সময় হয়েছে : এ-সব হচ্ছে কী? আর কতকালই বা এ-রকম চলবে? ব্যাকরণ-বানানহীন ভাষায়, খোঁড়া পদ্যে, কিচিরমিচির গদ্যে এ-সব প্রলাপ যে আত্মপ্রকাশ করতে সাহস পাচ্ছে তার কারণ কী? তার কারণ দুটো হ'তে পারে। প্রথমত, আমাদের তরুণরা হয়তো মনে করেন যে এ-রকম লিখলেই আজকালকার বাজারে হাতে-হাতে বখশিষ মিলবে। দ্বিতীয়ত, এঁরা সকলেই হয়তো কোনো একরকম সামাজিক নব-বিধান চান এবং তাঁদের সেই ইচ্ছা থেকেই এ-সব লেখা বেরোয়। সম্ভবত উভয় কারণই মিলে মিশে এক হ'য়ে আছে। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার দুঃসহতার অনুভূতি ও নতুন সমাজ সংগঠনের কল্পনা আজকের দিনের তরুণ মনকে নাড়া দেবে সেটা স্বাভাবিক মাত্র, তবে সাহিত্যের নিরাপদ গণ্ডির মধ্যে এ নিয়ে অত্যন্ত জোর গলায় যাঁরা চ্যাঁচাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে এ-অনুভূতি কতটা সত্য তা জানি না। তবু তাঁদের খাতির ক'রে না-হয় এটুকু মেনে নেয়া গেলো যে মানবসমাজকে নতুন ক'রে গড়বার প্রয়োজন সত্যিই তাঁরা অনুভব করেন। কিন্তু সেই নতুন সমাজকে পাবার জন্য তাঁরা কী করছেন? লিখছেন। কী লিখছেন? উপন্যাস কি নাটক নয়, যাতে ক্ষয়িষ্ণু সমাজের যথাযথ ছবি দেখে লোকে শিহরিত হ'য়ে পরিবর্তনকে গ্রহণ করবার জন্য ব্যগ্র হয়, প্রবন্ধও নয় যা সংস্কারের জড়িমা দূর ক'রে বুদ্ধিকে উদ্দীপ্ত করতে পারে—কেননা উপন্যাস, নাটক কি প্রবন্ধ লিখতে অনেক খাটতে হয়, ভাবতে হয়, বুঝতে হয়—তাঁরা বানাচ্ছেন কবিতা নাম দিয়ে একরকম অস্থিহীন জেলি-জাতীয় পদার্থ—অর্থাৎ খবর-কাগজের প্যারাগ্রাফকে কিংবা অত্যন্ত তরল কোনো ভাবালু উচ্ছ্বাসকে ছোটো-বড়ো লাইনে সাজিয়ে সেগুলোকে কবিতা বলছেন, এবং কম কি বেশি ঢাকঢোল পিটিয়ে লোকসমক্ষে সেগুলো জাহির করছেন। পদ্যের লাইন মেলাতে হ'লেও কিছুটা ভাবনা ছিলো, গদ্যকবিতার হিড়িক উঠে এঁরা একেবারেই নিরঙ্কুশ হয়েছেন। এই ধরনের রচনাই সত্যকার এস্কেপিস্ট—

প্রেমের কবিতা কি প্রকৃতির কবিতা নয়—কারণ বাঞ্ছিত নবসমাজকে পাবার জন্য যা-কিছু কঠিন কাজের প্রয়োজন আছে তার এলাকা এড়িয়ে এ-সব লেখক অল্প একটু জোলো উচ্ছ্বাস ক'রেই তাঁদের দম ফুরিয়ে ফেলছেন। অথচ নতুন-কিছু করছেন এই দম্ভ থেকে এঁরা অনেকেই রচনারীতির কলাকৌশলের দিকটা সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করছেন, তার ফলে আমাদের সাহিত্যের আদর্শের অবনতি হবার আশঙ্কা আছে। অনেকদিন ধ'রে অনেক কিছু সহ্য করা গেছে, কিন্তু এখন বোধ হয় বলবার সময় হয়েছে—আর না।

বু. ব.

সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত

ঝর্ণা
বিদায়-গোধূলি } অনিলরঞ্জন বিশ্বাস।

১৬ পৃষ্ঠার কবিতার বই, চার আনা ক'রে দাম। 'বিদায়-গোধূলি' রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন, 'ঝর্ণা'তে নানা বিষয়ের ও ছন্দের রচনা আছে। বই দুটি সুখপাঠ্য।

কল্পনা, তরুণ রায় সংকলিত। দশ আনা

আধুনিক কবিতার একটি ক্ষুদ্র বিমিশ্র চয়নিকা। লেখকদের মধ্যে আছেন মোহিতলাল মজুমদার, কালিদাস রায়, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, অমিয় চক্রবর্তী, হুমায়ুন কবির, বুদ্ধদেব বসু, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ ইত্যাদি। কতগুলি কবিতা পূর্বপ্রকাশিত, কতগুলি নতুন।

সমালোচনা

বনলতা সেন, জীবনানন্দ দাশ। কবিতা ভবন, চার আনা। আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ সবচেয়ে নির্জন, সবচেয়ে স্বতন্ত্র। বাংলা কাব্যের প্রধান ঐতিহ্য থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন, এবং গেলো দশ বছরে যে-সব আন্দোলনের ভাঙা-গড়া আমাদের কাব্যজগতে চলেছে তাতেও কোনো অংশ তিনি গ্রহণ করেননি। তিনি শুধুই কবিতা লেখেন, গল্প কিংবা প্রবন্ধ লেখেন না; তিনি একে স্বভাব-লাজুক তায় মফঃস্বলবাসী—এইসব কারণে আমাদের সাহিত্যিক রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপ থেকে তিনি সম্প্রতি যেন খানিকটা দূরে স'রে গিয়েছেন। আধুনিক বাংলা কাব্যের অনেক আলোচনা আমার চোখে পড়েছে যাতে জীবনানন্দ দাশের

উল্লেখমাত্র নেই। অথচ তাঁকে বাদ দিয়ে ১৯৩০-পরবর্তী বাংলা কাব্যের কোনো সম্পূর্ণ আলোচনা হ'তেই পারে না; এই সময়কার তিনি একজন প্রধান কবিকর্মী, আমাদের পরিপূর্ণ অভিনিবেশ তাঁর প্রাপ্য।

কবিজীবনের একেবারে প্রথম অধ্যায়ে জীবনানন্দর রচনায় সত্যেন্দ্র দত্ত-নজরুল ইসলামের ঈষৎ প্রভাব দেখা গিয়েছিলো, কিন্তু বছর সাতেক আগে তাঁর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' যখন প্রকাশিত হ'লো তখনই আমরা নিঃসংশয়ে জানলুম তাঁর অনন্যতা। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে আমরা যে-কবিকে পেলুম তিনি সুদূর, নিঃসঙ্গ, স্বপ্নাবিষ্ট; তাঁর মনোলোক যেন একটি ধূসর কোমল পরিমণ্ডল যেখানে বাস্তব যাকে বলি তার আভাসমাত্র নেই, কিন্তু সত্য ব'লে যাকে অনুভব করি তার রঙিন ছায়া পড়েছে। সেই তাঁর নিজস্ব জগৎ—একান্তই তাঁর—দূর থেকে যাকে মনে হয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অলংকরণে অত্যন্ত বেশি আচ্ছন্ন, স্বপ্নের আত্ম-চালনায় অত্যন্ত বেশি মসৃণ—কিন্তু যার ভিতরে একবার প্রবেশ করলে সহজেই নিঃশ্বাস নেয়া যায়, সহজেই বিশ্বাস করা যায়। রূপকথার জগতের মতোই এ-কবির জগৎ আমাদের আত্মসাৎ ক'রে নেয়, সেখান থেকে বেরোবার পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। জীবনানন্দর কবিতার যেটি সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য ব'লে আমার মনে হয় সেটি—একটি সুর, আর-কিছু না। তার বর্ণনা কেমন ক'রে দেবো?

সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়?

তাঁর কবিতা নিয়ে বসলেই তাঁর এই লাইনটি আমার মনে পড়ে। একটি সুর—জলের মতো, হাওয়ার মতো ঘুরে-ঘুরে অনেক দূর থেকে কানে এসে লাগছে। মন বাধ্য হয় কান পেতে শুনতে, নিজের অজান্তেই আমরা পরিপূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করি। কবিত্ব কি এই সুর ছাড়া আর-কিছু?

জীবনানন্দর কবিতার সুর একবার কানে লাগলে তাকে যে ভোলা শক্ত তার প্রমাণ এই যে সাধারণ পাঠকসমাজে তাঁর খ্যাতি যে-অনুপাতে অল্প, সে-অনুপাতে তাঁর অনুকারকের সংখ্যা আশ্চর্যরকম বেশি। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে এমন একটি স্বাদ, এমন একটি সৌরভ আমরা পেয়েছিলাম যা তার আগে বাংলা সাহিত্যে আমাদের জানা ছিলো না। তা যেন অনেক দূরদেশের, তা যেন আকস্মিক, ঘরোয়া কথার সঙ্গে আকাশবিহারী কল্পনার সংমিশ্রণে তা পদে-পদে অপ্রত্যাশিত। ঠিক এইসব লক্ষণ 'বনলতা সেনে'-ও দেখতে পাচ্ছি। যদিও চার আনা দামের চটি বই, এবং এগারোটি মাত্র কবিতা এতে আছে, তবু এ আমাদের বিশেষভাবে আলোচ্য। এই এগারোটি কবিতাই জীবনানন্দীয়

প্রতিভায় দীপ্তিমান। 'বনলতা সেন' কিংবা 'হায়, চিল'-এর মতো নিখুঁত গীতিকবিতা রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যে অল্পই আছে। 'হাওয়ার রাত', 'নগ্ন নির্জন হাত' ও 'শিকার' এই তিনটি কবিতাই সুস্পষ্ট আশ্চর্য স্বপ্নের মতো আমাদের সমস্ত মন অধিকার করে—তার জন্য ভাবতে হয় না, চেষ্টা করতে হয় না, বরং তার সম্মোহন কাটিয়ে ওঠবার জন্যই চেষ্টা করতে হয়। ছোট্ট 'ঘাস' কবিতাটিতে যেন সমুদ্রের ঢেউ ছিটকে এসে পড়েছে—তার পিছনে দিগন্তব্যাপী অসীম জলরাশির যে-ইতিহাস তাকে সে ভোলেনি। 'বিড়াল' কবিতাটিতে আছে সেই রসের আভাস, ইংরেজিতে যাকে বলে গ্রোটেস্ক্। বিস্ময়করকে চরমে টেনে নিলে কী দাঁড়ায় এটি তারই একটি উদাহরণ। রুচিভেদে এ-কবিতা ভালো হয়তো কারো-কারো লাগবে না, কিন্তু একে উপেক্ষা করা অসম্ভব।

জীবনানন্দ সম্বন্ধে মূল কথা আমি যেটা বলতে চাই সেটা এই যে তিনিই বোধ হয় আমাদের একমাত্র কবি যিনি আজকের দিনেও কবিত্ব করতে ভয় পান না। তাঁর এই নির্লজ্জ উদ্দাম কবিত্বকে আমি অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করি। এটি আমাদের সাহিত্যের একটি মহামূল্য সম্পদ। তাঁর এই কবিত্বের বিশেষ একটি প্রকৃতি আছে, তার সঙ্গে প্রত্যেক পাঠককে প্রত্যক্ষ পরিচয় করতে আমন্ত্রণ করি। তাঁর সঙ্গে বন্ধুতা করা কঠিন নয়। পাঠকের কাছে তাঁর একটিমাত্র দাবি: সেটি এই যে তিনি চোখ খোলা রাখবেন। কেননা জীবনানন্দর জগৎ প্রায় সম্পূর্ণরূপে চোখে-দেখার জগৎ। রবীন্দ্রনাথ একবার জীবনানন্দর কবিতাকে 'চিত্ররূপময়' আখ্যা দিয়েছিলেন। এর চেয়ে ভালো বিশেষণ এই কবির রচনা সম্বন্ধে খুঁজে পাওয়া শক্ত হবে। তাঁর কাব্য বর্ণনাবহুল, তাঁর বর্ণনা চিত্রবহুল এবং তাঁর চিত্র বর্ণবহুল—এটুকু বললেই জীবনানন্দর কবিতার জাত চিনিয়ে দেয়া সম্ভব হ'তে পারে। তাঁর কবিতা খুব বেশি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য—বাঙালি কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি—তবে দুটিমাত্র ইন্দ্রিয়ের কাছে তাঁর দৌত্য, প্রথমে দৃষ্টি তার পরে স্পর্শ। তাঁর মন স্বভাবতই দৃশ্যবিলাসী ও স্পর্শপিপাসু। এই দুটি ইন্দ্রিয়কে অবলম্বন ক'রে তিনি তাঁর অপরূপ বর্ণনার জাল বুনে চলেন, সেই বর্ণনাকে পাঠকের মনে পৌঁছিয়ে দেবার বাহন তাঁর উপমা। উপমার এত ছড়াছড়ি আজকালকার কোনো কবিতেই নেই। তাঁর উপমা উজ্জ্বল, জটিল ও দূরগন্ধবহ। এক-একটি উপমাই এক-একটি ছোটো কবিতা হ'তে পারতো। তিনি যে-জাতের কবি তাতে উপমাবিলাসী না-হ'য়ে তাঁর উপায় নেই, অর্থাৎ উপমা তাঁর কাব্যের কারুকার্য মাত্র নয়, উপমাতেই তাঁর কাব্য। মনে পড়ে বহুকাল পূর্বে জীবনানন্দ

একবার কোনো-এক পত্রিকায় লিখেছিলেন, 'উপমাই কবিত্ব।' কথাটা তখন থেকেই আমার মনে বিঁধে আছে। উপমাই কবিত্ব—এ-কথা হয়তো সত্য নয়, কিন্তু উপমাতেই কবিত্ব, এ-কথা বললে কিছু অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও মেনে নেয়া অসম্ভব হয় না। অবশ্য উপমা কথাটাকে এখানে খুব বড়ো অর্থে গ্রহণ করতে হয়—ভাষায় কবির যেটা নিজস্ব ব্যঞ্জনা—কোনো অভিনব বিশেষণ, কিংবা কোনো পুরোনো বিশেষণের স্বকীয় ব্যবহার, এমনকি কোনো বিশেষ্যপদের রূপক প্রয়োগ—এ সমস্তই তো উপমা। এ-অর্থ স্বীকার ক'রে নিলে বলা যায় যে উপমা পরীক্ষা করলেই প্রত্যেক কবির বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে। জীবনানন্দ যখন বলেন—

বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন ?'
পাখীর নীড়ের মত চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

তখনই যেন বুঝতে পারি তাঁর মন কী-ভাবে কাজ করছে। নাটোরের বনলতা সেনের যে-চোখের সঙ্গে পাখির নীড়ের উপমা সেই নাটোর, বনলতা সেন এবং তার চোখ এ-সমস্তই যে কোনো সর্বদেশকালব্যাপী ভাবের উপমা মাত্র তা উপলব্ধি ক'রে আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। আবার যখন পড়ি

এক-একবার মনে হচ্ছিল আমার—আধো ঘুমের ভিতর হয়তো—
মাথার উপর মশারি নেই আমার,
স্বাতী তারার কোল ঘেঁষে নীল হাওয়ার সমুদ্রে শাদা বকের মত উড়ছে সে!

তখন কবির নিছক কল্পনাপ্রবণতাই আমাদের মুগ্ধ করে। কিন্তু এই মদির কল্পনা থেকে কখনো ফুটে ওঠে উজ্জ্বল ছবির মিছিল—'নগ্ন নির্জন হাত' সমস্ত কবিতাটিই তাই, শুধু শেষ ক'টি লাইন উদ্ধৃত করি :

পর্দায়, গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ,
রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ!
তোমার নগ্ন নির্জন হাত;
তোমার নগ্ন নির্জন হাত।

সমস্ত কবিতাটি একসঙ্গে না-পড়লে শেষ পংক্তিটির (কিংবা ছবিটির) আশ্চর্য আলোড়ন অনুভব করা যাবে না, কিন্তু 'রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদে' দৃষ্টি ও স্পর্শের যে-বিবাহ ঘটেছে তার আনন্দে আমাদের মন অনেকক্ষণ পর্যন্ত দোলায়িত হ'তে পারে। 'নগ্ন নির্জন হাত' চিত্রটি যেন still life, তবু ঐ হাতখানাই তাকে মানবিক ব্যাকুলতায় স্পন্দিত ক'রে তুলেছে। আবার কখনো দেখি এক-একটি চিত্ররূপ থেকেই আবেগের দুরন্ত বন্যা উৎসারিত :

হৃদয় ভরে গিয়েছে আমার বিস্তীর্ণ ফেল্টের সবুজ ঘাসের গন্ধে,
দিগন্ত-প্লাবিত বলীয়ান রৌদ্রের আঘ্রাণে,
মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জনের মত অন্ধকারের
চঞ্চল বিরাট সজীব রোমশ উচ্ছ্বাসে,
জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততায়!

পর-পর চারটি বিশেষণ—কিন্তু চারটিই সার্থক।

জীবনানন্দর সমগ্র রচনায় একটি বিষণ্ণ গাম্ভীর্য পরিব্যাপ্ত। তাঁর মধ্যে বৈচিত্র্য নেই, না বিষয়ের না আঙ্গিকের। তাঁর সমস্ত কবিতাই কোনো-না-কোনো অর্থে প্রকৃতির কবিতা; পয়ার ছাড়া অন্য-কোনো ছন্দও এ-পর্যন্ত তাঁকে ব্যবহার করতে দেখিনি। অবশ্য গদ্য-কবিতা তিনি অনেক লিখেছেন—এবং গদ্য-কবিতায় তাঁর কৃতিত্ব আমি অসামান্য মনে করি। পয়ারেও তাঁর স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট—কিন্তু সেটা অনুভব করবার, বিশ্লেষণ করবার নয়। কেননা সে-বৈশিষ্ট্যের নির্ভর টেকনিকের অভিনবত্ব নয়, তাঁর নির্জন বিষণ্ণ কবি-প্রাণেরই সেটা সংক্রামণ। আবার বলি, তিনি আমাদের নির্জনতম কবি। আধুনিক বাংলা কাব্যের নানা ঘাত-প্রতিঘাত যে তাঁকে স্পর্শমাত্র করেনি এটাকে নিন্দে করতে হ'লে বলা যায় যে তিনি অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক, প্রশংসা করতে হ'লে বলা যায় যে তিনি অত্যন্ত আত্মনিষ্ঠ, একান্তই চরিত্রবান। আমাদের সকলের মধ্যেই সেই যে একজন চিরকালের কবিকে মাঝে-মাঝে দেখতে পাই, যার দেশ নেই, কাল নেই, জাতি নেই, গোত্র নেই, মানুষের সমস্ত সুখ-দুঃখ, সভ্যতার সমস্ত উত্থান-পতন পার হ'য়ে যার সুর আজকের মতো কোনো-এক বসন্ত-প্রভাতে হঠাৎ আমাদের মনে এসে ঘা দেয়, আর মুহূর্তে উচ্চনিনাদী প্রকাণ্ড বর্তমান সমগ্র অতীত-ভবিষ্যতের মধ্যে বিলীন হ'য়ে যায়—সেই নামহারা ক্ষণস্থায়ীকে কিছু সময়ের জন্য যেন কাছে পেলুম 'বনলতা সেন' বইটিতে।

বুদ্ধদেব বসু

একসূত্রে। ফ্যাসিষ্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ কর্তৃক প্রকাশিত। দাম এক টাকা।

এ কবিতাগুলির সঙ্কলন করেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও গোলাম কুদ্দুস। কবিতা হিসেবে সার্থক রচনা 'একসূত্রে' তিন চারটি আছে, কিন্তু এ কবিতাগুলি বাদ দিলে, সঙ্কলন হিসেবে 'একসূত্রে' ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের সাহিত্যে রাজনৈতিক কবিতা বিশেষ নেই। এটা তাজ্জব ব্যাপার যে

১৯৩০-৩১-র আন্দোলন বাংলা সাহিত্যে প্রত্যক্ষ রেখাপাত করতে পারেনি, যদিচ উপরোক্ত আন্দোলনে মধ্যবিত্তেরাই নায়ক ছিলেন। ১৯৩০-থেকে '৩৫ পর্যন্ত প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য কোনো কাব্যগ্রন্থ পাঠ করলে বোঝা যায় না যে দেশে কোনোরকম আলোড়ন হয়েছিল। আমরা ভেবেছিলাম যে এই আন্দোলনের ভিত্তিতে ভারতের অসংখ্য মূক জনসাধারণ না থাকায় উজ্জীবনী শক্তির অভাব ছিল, এবং সেজন্য তৎসাময়িক সাহিত্য রূপান্তরিত হয়নি। কিন্তু 'একসূত্রে'র দুটি ভূমিকার পিছনে যে দৃষ্টিভঙ্গী আছে তাতে মনে হয় যে আধুনিক কবিরা জনগণের সঙ্গে লুপ্ত আত্মীয়তা ফিরিয়ে আনবার প্রয়াসের মহৎ মূল্য বোঝেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এ উপলব্ধি ভালো কাব্যে এখনো রূপান্তরিত হয়নি। যদি বোমা ও জাপানীর জায়গায় ফুল ও প্রেম বসিয়ে কবিতাগুলি পড়ি তাহলে মনে হবে যে ম্রিয়মাণ হৃতশক্তি সনাতনী ঐতিহ্য থেকে আমরা একটুও বিচ্যুত হইনি। সেটা আশার কথা নয়। আমাদের সত্তায় ফ্যাসিস্ট-বিরোধী আন্দোলন এখনো দানা বাঁধতে পারেনি, সেটা হ'তে কলনিতে সময় লাগে। ইংরেজের এই উপনিবেশ, যেখানে কর্তারা আমাদের সুখদুঃখ সম্বন্ধে পরম উদাসীন, যেখানে ধান, গম ইত্যাদি বাজার থেকে বেমালুম নদারৎ, যে দেশের নেতারা জলে পচছেন, সেখানে জনযুদ্ধ ব্যাপারটা মজ্জাগত হতে যে বিপ্লবী চেতনার দরকার, তার অনুপস্থিতি 'একসূত্রে' স্পষ্ট। এ-প্রসঙ্গে হিরণবাবুর বক্তৃতার কয়েকটি কথা উল্লেখযোগ্য। 'একসূত্রে'র অধিকাংশ কবিরাই "শূন্যমার্গী আন্তর্জাতিকতায়" আশ্রয় খুঁজেছেন। জাতীয় সঙ্কটের পটভূমিকায়, দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে, 'একসূত্রে' পড়ে নিতান্ত হতাশ হয়েছি। আশা করি সুভাষ ও গোলাম কুদ্দুস্ সমালোচকের বেয়াদবী মাপ করবেন। "We call it self-criticism."

Boatman Boy by Sachi Raut Roy. Translated by Harindranath Chattopadhyaya. Book-Forum, Calcutta.

শচী রাউত রয় উড়িষ্যার নতুন কবি, আলোচ্য গ্রন্থের নাম-কবিতাটি উড়িষ্যার জনগণের মুখে ধ্বনিত, তাদের বিপ্লবী চেতনা এ কবিতায় নাকি ভাষা পেয়েছে। শচী রাউত হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি এবং নাট্যকার বলে সম্বোধন করে ধন্যবাদ জানিয়েছেন, এবং অনুবাদক লিখেছেন শচী রাউত রয় কবিতায় এবং জীবনে সঙ্কীর্ণ শ্রেণীর গণ্ডী উৎরিয়ে গিয়েছেন। ১৯৩৮ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখে বাজী রাউৎ ঢেঙ্কানলে সশস্ত্র পুলিসের হাতে প্রাণ হারায়। বাজীর বয়স তখন বারো। এ নবীন

বিপ্লবী বালকের স্মৃতিতে আলোচ্য গ্রন্থটি লিখিত। 'বোটম্যান বয়'-এর সমালোচনা করাটা কঠিন ব্যাপার। কারণ এটা জানা কথা যে অনুবাদে মূল কবিতার অনেক সময় সর্বাঙ্গীণ রূপান্তর ঘটে। এ-ক্ষেত্রে অনুবাদ সফল হয়নি। অনর্থক বাগাড়ম্বরে এবং heroicsএ কবিতার অধিকাংশ পংক্তি ব্যর্থ, এবং কবি যে সব রূপচিত্রের সাহায্য নিয়েছেন সেগুলি মামুলী। বিপ্লবী চেতনার প্রকাশ উনিশ শতকী ভাববিলাসী ভাষায় মানায় না। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিষয়বস্তুর পরিবর্তন একেবারেই হয়নি, যে সুরে কবিতাটি আরম্ভ সেই সুরেই শেষ। এবং সুরটি (হয়ত অনুবাদের জন্য) তার স্বকীয় প্রাণশক্তি এবং ভাষা হারিয়ে পুনরাবৃত্তি এবং সস্তা নাটকীয়তায় বিরক্তিকর। তবে মাঝে মাঝে, অক্ষম অনুবাদ সত্ত্বেও, শচীরাউত রয়ের শক্তি আমরা উপলব্ধি করি, যেমন :

This is no funeral-flame, Comrade!
No funeral flame, but freedom's leaping flame
To cleave the country's darks of death and shame;
A sacrificial mystery
Of death turned life........flame beyond price!

কিম্বা

Lo, Death has made
Out of this young life's insignificance.
Each man's significance.

শেষের দিকের কবিতাগুলি ব্যক্তিগতভাবে আমার আরো ভালো লেগেছে। তাদের কয়েকটি ছত্রে আমরা নগ্ন ক্ষুধিত উড়িষ্যার কণ্ঠস্বর শুনতে পাই।

বিষয়বস্তুর নির্বাচনের জন্য শচীরাউত রয় আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

সমর সেন

চিঠিপত্র, ৩য় খণ্ড। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী, এক টাকা।

বাংলা সাহিত্যের কথা। নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী।
বিশ্বভারতী, ১৷০

'চিঠিপত্রে'র তৃতীয় খণ্ডে শ্রীযুক্তা প্রতিমা ঠাকুরকে লেখা ৬৭ খানা চিঠি আছে। এই চিঠিগুলি ভারি ঘরোয়া, ভারি হাসিখুশি হালকা মেজাজের, যেমন তরতরে ক'রে কলমের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলো তেমনি অনায়াসে এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলা যায়। নানারকম বর্ণনা, আক্ষেপ ও হাস্য পরিহাসের ভিতর দিয়ে পুত্রবধূর প্রতি যে একটি গভীর স্নেহ নিঃসরিত তার স্পর্শ আছে প্রতি পাতায়। রথীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিগুলিতে প্রায়ই একটি

কঠোর উপদেশের ভাব ধরা পড়ে, কিন্তু এখানে দু' একটি চিঠিতে ছাড়া উপদেশ প্রায় নেই-ই, প্রায় সমস্তটাই স্নিগ্ধ, সকৌতুক ও হাস্যোজ্জ্বল। অথচ পুত্রবধূর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনার জন্য রবীন্দ্রনাথ কতখানি ভাবতেন ও করতেন এ-বই প'ড়ে সে-বিষয়েও বেশ ধারণা হয়, আমরা জানতে পাই যে প্রতিমা দেবীর শিক্ষার আরম্ভ রবীন্দ্রনাথেরই তত্ত্বাবধানে হয়েছিলো এবং পুত্র-পুত্রবধূর স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগ ছিলো তাঁর জীবনের নিত্যসঙ্গী। কখনো বাইও-কেমিক ওষুধ বাৎলে দিচ্ছেন, কখনো হাওয়া-বদলের প্ল্যান ক'রে দিচ্ছেন, কখনো বা পাঠযোগ্য বইয়ের নির্দেশ লিখে পাঠাচ্ছেন। মিস বুর্ডেটের জন্য ক্রিসমাসের সময় ক্রিসমাস কার্ড, ক্রিসমাস কেক আর ক্রিসমাস নম্বর ছবির কাগজ-টাগজ যাতে আনিয়ে দেয়া হয় সে বিষয়েও উল্লেখ করতে ভোলেননি। মনে হয় সংসারী গৃহস্থ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ একেবারে আদর্শ ছিলেন, সাংসারিক ব্যাপারে যে-অন্যমনস্কতা কবিদের প্রতি আরোপ করা হয় তার কিছুমাত্র লক্ষণ তাঁর চরিত্রে দেখা যায় না। সকল দিকে সকল সময়ে তাঁর দৃষ্টি জাগ্রত, অতি তুচ্ছ জিনিসও তাঁর নজরের বাইরে নয়। অথচ সেই সঙ্গে এটাও অনুভব করি যে ভিতরে-ভিতরে কোথায় তাঁর একটা পরম নির্লিপ্ততা ছিলো, তিনি সব-কিছুতেই আছেন অথচ কিছুতেই জড়িয়ে যাচ্ছেন না, তাঁর মধ্যে যে একটি আশ্চর্য সুদূরতা আছে তা যেন নিকট আত্মীয়কেও অনুভব করতে হয়েছে। তাঁর স্নেহও মুক্ত, তার কোনো দাবি নেই।

'তোমাদের সংসারটিকে সুধাপাত্রের মত করে মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি একবার গৃহস্থধর্ম্মের অমৃতরস পান করে যাই এই আমার মনের লোভ এক একবার মনকে চেপে ধরে। কিন্তু লোভকে যেমন করে হোক ত্যাগ করতেই হবে।······তোমাদের সমস্যা তোমাদের, তোমাদের প্রকৃতি তোমাদের, তোমাদের পথ তোমাদের—তোমাদের সম্বন্ধে আমার স্নেহ এবং আমার শুভ আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছু আমার নয়। সেই স্নেহকেও নির্লিপ্ত হতে হবে—সে যাতে তোমাদের প্রতি লেশমাত্র ভার স্বরূপ না হয় আমাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতেই হবে।···তোমাদের কল্যাণ হোক।'

সংসারিক জীবনে এই একান্ত কর্তব্যপরায়ণতার সঙ্গে মৌল নিঃস্পৃহতার সংযোগ খুব একটি দুর্লভ জিনিস। কবির চরিত্রের এই দিকটি নিয়ে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনীকাররা নিশ্চয়ই আলোচনা করবেন।

এই খণ্ডের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চিঠি ৩৬ নম্বর, যাতে 'পুনশ্চ'র 'বাসা' কবিতার পূর্বাভাস পাওয়া যায়। এই চিঠির অংশ প্রতিমা দেবীর 'নির্বাণ'

বইটিতে আগেই উদ্ধৃত হয়েছিলো। বেশির ভাগ চিঠিই অপেক্ষাকৃত হাল আমলের লেখা—তাঁর ছবি আঁকার, এবং পাশ্চাত্ত্য দেশে তাঁর ছবির সম্বর্দ্ধনা-লাভের খণ্ড ইতিহাস এখানে ছড়িয়ে আছে। নাট্যাভিনয়ের সময়ে তিনি কী-রকম বিচলিত হতেন, এবং এক-একটি নাটককে সর্বাঙ্গসুন্দর ক'রে তুলতে কী যে অফুরন্ত পরিশ্রম তিনি করতেন সে-সব কথাও এখানে ছোটো-ছোটো ইঙ্গিতে ফুটে উঠেছে। তাঁর মনে জমিদারি প্রথা সম্বন্ধে একটি গভীর বেদনাবোধ ছিল, পূর্ব প্রকাশিত অন্য চিঠিতে তা দেখেছি। এখানেও একটি চিঠিতে আছে—'ধনী পরিবারের ব্যক্তিগত অমিতব্যয়িতার উপরে এবার আমার আন্তরিক বৈরাগ্য হয়েচে। ···নিজেদের ভরণপোষণের দায়িত্ব আমাদের গরীব চাষী প্রজাদের পরে যেন আর চাপাতে না হয়। এ-কথা আমার অনেকদিনের পুরানো কথা। বহুকাল থেকে আশা করেছিলুম আমাদের জমিদারী যেন আমাদের প্রজাদেরই জমিদারী হয়—আমরা যেন ট্রাস্টির মতো থাকি। অল্প কিছু খোরাক পোষাক দাবী করতে পারব কিন্তু সে ওদেরি অংশিদারের মতো। কিন্তু দিনে দিনে দেখলুম জমিদারীর রথ সে রাস্তায় গেল না···।···আমি যা বহুকাল ধ্যান করেছি রাশিয়ায় দেখলুম এরা তা কাজে খাঠিয়েছে। আমি পারিনি বলে দুঃখ হোল। কিন্তু হাল ছেড়ে দিলে লজ্জার বিষয় হবে। অল্প বয়সে জীবনের যা লক্ষ্য ছিল শ্রীনিকেতনে শান্তিনিকেতনে তা সম্পূর্ণ সিদ্ধ না হোক সাধনার পথ অনেকখানি প্রশস্ত করেছি। নিজের প্রজাদের সম্বন্ধেও আমার অনেককালের বেদনা রয়ে গেছে। মৃত্যুর আগে সেদিককার পথও কি খুলে যেতে পারব না?'

সেদিককার পথ খুলে যেতে তিনি পারেননি, কিন্তু তার অনুকূল আবহাওয়া তাঁর স্বজাতির মনের মধ্যে রচনা ক'রে দিয়ে গেছেন; ভাবিকালের সমাজ যে তাঁকে অগ্রগামী প্রধান পুরোহিত ব'লে গণ্য করবে তাতে সন্দেহ নেই।

১১নং চিঠির তলায় তারিখের জায়গায় আছে ১৯১৫—১৯১৮ ও ৬৬নং চিঠির তলায় আছে ১৯৩৯-১৯৪০। এ চিঠি দুটির তারিখ নির্দ্দিষ্ট জানা যায়নি, ঐ সময়ের মধ্যে লেখা, এ-কথাটাই বোধ হয় জানানো হয়েছে। কিন্তু ও-ভাবে লিখলে পাঠকের খটকা লাগা অসম্ভব নয়। বরং আনুমানিক একটা বছরের উল্লেখ ক'রে তার পরে জিজ্ঞাসাচিহ্ন দেয়া ভালো।

'বাংলা সাহিত্যের কথা' লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার ছয় নম্বর গ্রন্থ। অল্প দামে ও ছোটো আকারে আমাদের সাহিত্যের একটি সহজ সর্বজনভোগ্য ইতিহাস প্রকাশিত হওয়া যে নিতান্ত প্রয়োজন তা আমরা অনেকেই মনে-মনে

অনুভব করছিলাম। এ-বইটি আমাদের সেই মস্ত অভাবটা ভ'রে দিলে। বইখানা ভালো হয়েছে এ-কথা নিঃসংশয়ে বলতে পারি। পরিপাটি চেহারা, পরিষ্কার ছাপা, সরল অনাড়ম্বর সুখপাঠ্য ভাষা, উপকরণের বাহুল্য নেই, বিতর্ক নেই, অথচ প্রধান বিষয়গুলি সবই ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছে। এ-ধরনের বই যেমনটি হওয়া উচিত ঠিক তাই হয়েছে। এ-বই প'ড়ে অনভিজ্ঞ বাঙালি পাঠক তাঁর ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে মোটামুটি খবরগুলি পাবেন, হয়তো সেই সঙ্গে তাঁর আরো জানবার কৌতূহল জাগবে, এবং এ-বইয়ের পক্ষে এটুকুই যথেষ্ট। প্রথম পরিচ্ছেদগুলির অনেকখানিই রবীন্দ্রনাথের লেখা, তাতে সাহিত্য সম্বন্ধে মূলগত যে-ক'টি কথা তিনি সারা জীবন ধ'রে বলেছেন তাই বালভাষিত বাংলায় অপরূপ হ'য়ে প্রকাশ পেয়েছে। এই অংশগুলি উদ্ধৃতি-চিহ্নের মধ্যে না দিয়ে আলাদা টাইপে ছাপালে ভালো হ'তো।

নিত্যানন্দবাবুর ভাষাও হালকা ঝরঝরে, সমস্ত বইটি এমন যে স্কুলের ছেলে প'ড়েও অনায়াসে বুঝতে পারবে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও আধুনিক ও সংস্কৃত-মোহমুক্ত। বাংলাকে যে তিনি স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে স্বীকার করেছেন এবং সেই অনুসারেই তার বানান ও ব্যাকরণের সূত্র রচনা করেছেন, এতে আমি খুব খুশি হয়েছি, কারণ সংস্কৃতের অন্ধ অনুকরণে বাংলা ভাষার সম্পূর্ণ ভুল ব্যাকরণ রচনা আমাদের স্কুলপাঠ্য বইয়ে এখনো দেখা যায়। একটা কথা শুধু জিজ্ঞাস্য আছে—হাসপাতাল শব্দে চন্দ্রবিন্দু বাদ দিলেই কি ভালো হয় না?

অল্প পরিসরের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এখানে যেটুকু পাওয়া যাচ্ছে তা বেশ আঁটোসাঁটো ও সুসম্পূর্ণ। আমার শুধু দু' একটি আপত্তি আছে। প্রথমেই বলবো যে বৈষ্ণব কবিতা সম্বন্ধে আরো একটু বিস্তৃত আলোচনা হ'লে ভালো হতো, (বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা না-বাড়িয়েও তা করা যেতো।) কারণ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব কবিতাই সাহিত্য-হিসেবে সবচেয়ে মূল্যবান। বিদ্যাপতির যে উল্লেখ পর্যন্ত নেই এটা অত্যন্ত চোখে পড়ে, কারণ বিদ্যাপতি বাঙালি না হ'লেও বাঙালি কবি এ-কথা বোধ হয় মেনে নেয়া যায়। তাঁর ভাষা বাঙালির বোধ্য এবং তাঁর প্রভাব বাংলা সাহিতে গভীর। বস্তুত, লেখক যেন বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনা অর্ধমনস্ক-ভাবে করেছেন, তার কোনো কারণ ছিলো না, কারণ এ-বই সহজ ভাষায় লেখা হ'লেও সাবালকপাঠ্য, এখানে সব রকম প্রসঙ্গেরই অবতারণা করা যায়; কিন্তু কোনো-কোনো অংশে, যেমন বৈষ্ণব সাহিত্যের ক্ষেত্রে, লেখার সুর একটু juvenile হ'য়ে গেছে।

সমসাময়িক লেখকদের কাছে এসে, অন্য অনেক লেখকের মতোই, নিত্যানন্দ বাবুও যেন ফাঁপরে পড়েছেন। স্বীকার করি, সমসাময়িকদের সম্বন্ধে বলাই সবচেয়ে শক্ত, তাই ব'লে তাঁদের উল্লেখমাত্র না-ক'রে, কিংবা উল্লেখমাত্র ক'রে দায় সারাই কি ঐতিহাসিকের কর্তব্য? অথচ বেশির ভাগ ইতিহাস ধরনের বইয়ে সমসাময়িকদের প্রতি এ-রকম ব্যবহারই লক্ষ্য করেছি। অবশ্য আলোচ্য বইটিতে যেটুকু আছে তার বেশি আশাই করা যায় না, তবে তারই মধ্যে দু' একটি ত্রুটি যা চোখে পড়েছে তা বলা বাহুল্য হবে না। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবিদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাম থাকা কি উচিত ছিল না? প্রমথ চৌধুরীর পরে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ-লেখক বাংলাদেশে কি একাধিক নেই? এ-ছাড়া আমার সর্বপ্রধান আপত্তিটি সর্বশেষে জানাচ্ছি। 'মুসলমান লেখক' ও 'মহিলা লেখক' এই স্বতন্ত্র বিভাগ আমাদের সাহিত্যে আর কতকাল চলবে? এ-বিষয়ে অন্যত্র লিখেছিলুম, এ উপলক্ষ্যে আবার বলছি সাহিত্যে separate electorate অচল, joint electorate-ই স্বাভাবিক ও সত্য। যিনি বাংলা ভাষায় লেখেন তিনিই বাঙালি লেখক, তিনি হিন্দু, মুসলমান বা খ্রীষ্টান, মেয়ে বা পুরুষ, যা-ই হোন, তিনি বাঙালি লেখকই, এমনকি তিনি যদি জাত-বাঙালি নাও হন তবু তিনি তা-ই। এখানে জাতিভেদ ঢোকানো মানেই সাহিত্যের প্রকৃত স্বরূপকে বিকৃত করা। আমাদের সাহিত্যের সমস্ত ইতিহাসেই এই জাতিভেদ প্রথা মর্মান্তিকরূপে প্রকাশমান, নিত্যানন্দবাবুও এ-ফাঁদে পা দিয়েছেন। সমসাময়িকদের মধ্যে তিনি চারজন 'হিন্দু', পাঁচজন 'মহিলা' ও পাঁচজন 'মুসলমান' কবির নাম করেছেন। অথচ নিছক সংখ্যার অনুপাতে যদি হিসেব করা যায় তাহ'লে পাঁচজন 'মহিলা কবি' কি পাঁচজন 'মুসলমান কবি'র নাম করলে অন্তত কুড়ি জন 'হিন্দু কবি'র নাম করা উচিত। উৎকর্ষের আদর্শ 'হিন্দু'র পক্ষে একরকম, 'মহিলা' ও 'মুসলমান'দের পক্ষে আর-একরকম, এ তো হ'তে পারে না। একজন লেখক অনেকখানি ভালো লিখেও উল্লিখিত হবেন না যেহেতু তিনি হিন্দু, এবং হিন্দু-লেখক সংখ্যায় অনেক, অন্য একজন লেখক চলনসইরকম অল্প-কিছু লিখেও স্থান পাবেন যেহেতু তিনি এমন কোনো সমাজের, যেখানে লেখকের সংখ্যা অত্যল্প, এ-অবিচার আর কতকাল আমরা মেনে নেবো? এটা যে সকলের পক্ষেই অবিচার, এবং এর বিরুদ্ধে সকলেরই যে প্রতিবাদ করা উচিত, তার নিদর্শনস্বরূপ দাখিল করছি যে আলোচ্য গ্রন্থে নজরুল ইসলামের জায়গা হয়েছে 'মুসলমান কবি'দের পুরো-ভাগে, যেখানে তাঁর জায়গা হওয়া উচিত ছিলো মোহিতলাল মজুমদার ও

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের আগে। এতে নজরুল ইসলামকে যে কতখানি ছোটো করা হয়েছে তাও কি ব'লে দিতে হবে? নজরুল ইসলাম কেন 'মুসলমান কবি' হবেন—মধুস্থদন দত্ত কি 'খ্রীষ্টান কবি'?

কবিতা (১৩৪৩-৪৮) দিনেশ দাস। এক টাকা।
অকাল, নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য্য। এক টাকা।

দিনেশ দাসের প্রথম কাব্যগ্রন্থটি প'ড়ে আনন্দ হ'লো। এটা বুঝতে পারলুম যে তিনি সত্যিকার কবি। তাঁর কবিত্ব অনেকখানিই রূপ পেয়েছে প্রেমেন্দ্র মিত্র ও জীবনানন্দর কাব্য থেকে—সেটা দোষের কথা নয়, বরং এইটে লক্ষ্য ক'রেই ভালো লাগলো যে পূর্ববর্তী কবিদের আত্মসাৎ ক'রে নিয়ে তিনি আপন স্বকীয়তা প্রমাণ করতে পেরেছেন। কবিতাগুলি তিন খণ্ডে ভাগ করা—'মৌমাছি', 'সহর' ও 'কাস্তে'। এই উপনামগুলির মধ্যে যে-ব্যঞ্জনা আছে তা আজকের দিনে বুঝিয়ে বলতে হবে না। স্বপ্নের মদিরতা থেকে বাস্তবের রূঢ় পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে আস্তে-আস্তে তিনি জেগে উঠলেন—কবি তাঁর মনের এই ক্রমবিকাশের ইতিহাস আমাদের জানাতে চেয়েছেন। কাব্যের ক্ষেত্রে এ-ইতিহাসের নিজস্ব মূল্য কতটা আছে জানিনে, কিন্তু এই ইতিহাসকেই লেখক কবিতায় রূপান্তরিত করতে পেরেছেন, সেখানেই তাঁর সার্থকতা। প্রথম কবিতাতেই যখন পড়ি:

> যেন আজ বাহিরের সমস্ত পৃথিবী আর সমস্ত আকাশ
> আমার ঘরের মাঝে তুলে নিয়ে এল
> কোথাকার ছোট এক বুনো মৌমাছি!

তখনই তাঁর কবিপ্রাণ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হই। তারপর প্রথম বৃষ্টির ফোঁটার সঙ্গে-সঙ্গে যখন তাঁর উল্লসিত গান বেজে ওঠে:

> আমি যদি আজ একটি ছোট
> বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে জন্মাতাম!

তখন, কবিতাটিকে স্পষ্টই জীবনানন্দীয় জেনেও, লেখকের অনুভূতির সত্যতা আমরা অনুভব করতে পারি, প্রশংসা করতে বাধে না।

প্রথম অংশের চাইতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের কবিতাগুলি ভালো এ-কথা বলতে পারলে সুখী হতাম, কিন্তু সত্যি বলতে সমস্ত বইটি কবিত্বের একই পর্যায় বাঁধা, ১৩৪৩ থেকে ৪৮-এর মধ্যে কবিহিসেবে লেখকের উল্লেখযোগ্য পরিণতি হয়নি। এ নিয়ে আক্ষেপ করবো না; বরং 'ব্ল্যাকাউট' 'এরোপ্লেন'

'জাপান' 'কাস্তে' 'ক্লাইভ ষ্ট্রীট' ইত্যাদি আজকালকার গতানুগতিক বিষয় নিয়ে লিখতে গিয়েও তিনি যে কবিত্বব্রত থেকে বিচ্যুত হননি সেটাই সুখের কথা। 'কাস্তে' কবিতাটি নামমহাত্ম্যে বিখ্যাত হয়েছে, কিন্তু 'ইথিওপিয়া', 'ক্লাইভ, ষ্ট্রীট' 'গোলমাথানা', 'নতুন মানুষের গান' এই প্রত্যেকটি কবিতাই উল্লেখযোগ্য। আধুনিক জগতের নির্মম ঘটনাবলীকে তিনি কোনো থিওরির ছাঁচে ঢালাই ক'রে দেখেননি, সে-বিষয়ে তাঁর মনে একটি যথার্থ বেদনাবোধ আছে। এইজন্য তাঁর এ-ধরনের কবিতাগুলি প্রাণবান হ'তে পেরেছে।

তবে এ-কথা বলতে হয় যে দিনেশ দাসের রচনার কলাকৌশল এখনও শিথিল। তার ফলে তাঁর কোনো একটি কবিতাই খুব নিবিড় হ'য়ে উঠতে পারেনি; ছন্দোভঙ্গ, জোর-করা মিল, আড়ষ্ট বাক্যগঠন প্রভৃতি ছোটো-ছোটো ত্রুটিগুলো এক-একটি ভালো কবিতাকে হ'তে-হ'তে খুব ভালো হ'তে দেয় না। এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ 'ব্যাঙ্ক' কবিতাটি। ভাবের দিক থেকে কবিতাটি অসাধারণ কিন্তু লেখক তাকে নিটোল নিখুঁত হ'তে দেননি—যদি একটু অবহিত হতেন, যদি আরো একটু পরিশ্রম করতেন, তাহ'লে কী সুন্দর একটি কবিতাই আমরা পেতে পারতুম!

> বাইরে এখন বৈকালী ঝড়ে অজস্র সোনা ওড়ে
> সোনালী বিকেল স্বর্ণের সমারোহে।

এ দুটি পংক্তিতে একই ভাব প্রকাশ পেয়েছে, কবিতাটিকে একটুও এগিয়ে দেয়া হয়নি। এ-ধরনের পুনরুক্তি খুব ভালো কবিতার লক্ষণ নয়। এখানে দ্বিতীয় পংক্তিটি, সোনার ছড়াছড়ি নিয়েও, একেবারেই ব্যর্থ, ও কিছুই বলে না। ঠিক এইরকম—

> প্রতিদিনকার সূর্য গড়ায় তপ্ত চায়ের কাপ
> হাফ-কাপ চায়ে দিন হয় গুলজার।

চায়ের কাপের জন্য একটি পংক্তিই যথেষ্ট, অন্য লাইনটি অনর্থক, এবং সমগ্র কবিতার পক্ষে হানিকর। তৃতীয় স্তবকে চার লাইনের মধ্যে 'স্বর্ণমৃগ' 'সোনার হরিণ' 'স্বর্ণাভ স্রোত' ও 'সুবর্ণ ঝর্ণার' ঘেঁষাঘেঁষি দুঃসহ।

> কাউণ্টারের কেরাণীর আজ অবাধ্য অন্তর

কাউণ্টারে ঠেকে ছন্দ গেল ভেঙে। এই ত্রুটিগুলিকে এড়িয়ে যাওয়া কতই সহজ ছিলো, অথচ কতই সহজে লেখক একটি স্মরণীয় কবিতা লেখবার সুযোগ হারালেন!

বইয়ের শেষ কবিতাটিতে লেখক বলছেন :

কি লাভ লিখে পদ্য
সেই পুরোনো আথর গোনো চোদ্দ
যাকগে পচা পয়ার রচা যাকগে
হাতুড়ি পেটো বন্ধু তুমি যা হয় হবে ভাগ্যে।

পদ্য লিখো না—এই উপদেশও তিনি যখন এই মনোহর পদ্যেই দিয়েছেন, তখন আশা হয় যে তিনি নিজে নিশ্চয়ই এই বিনা লাভের ব্যবসায় অকালে লালবাতি জ্বালাবেন না। বস্তুত, এই ছোটো বইখানা পড়ে আমাদের মনের ভাব অনেকটা এক চামচে পরিজ খাবার পর অলিভর টুইস্ট-এর মতো হয়েছে; সেই বিখ্যাত বালকের মতো আমরাও বলছি : আরো চাই।

নৃপেন্দ্রবাবু তাঁর বইয়ের নামে 'অকাল' কথাটিকে কী অর্থে ব্যবহার করেছেন জানি না। মিলটন তাঁর 'Lycidas'-এ যেমন বলেছিলেন যে তাঁর কবিত্বের ডাল থেকে অকালে মঞ্জরী ছিঁড়তে যাচ্ছেন—এ কি সেইরকম? নাকি ব্যঞ্জনানিপুণ বাঙাল ভাষায় আমরা যাকে বলি আকাল, এখানে অকাল মানে তা-ই? দ্বিতীয় অনুমানই বোধ হয় সত্য, কারণ দেশে এমন আকাল আমাদের জীবনে আমরা কখনো দেখিনি। জীবনধারণের প্রত্যেক উপকরণের এমন নিদারুণ দুর্ভিক্ষ আমাদেরই জীবনে যে আসবে দু'বছর আগেও আমাদের পক্ষে তা কল্পনা করা সম্ভব ছিলো না। সে-হিসেবে নামটি সার্থক। বর্তমান সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে অসন্তোষ এবং নতুন সমাজের অস্পষ্ট স্বপ্ন—এই নিয়ে কবিতাগুলি রচিত। কয়েকটি কবিতা আমার ভালো লাগলো। তবে নৃপেন্দ্রবাবুর রচনা এখনও নীহারিকার স্তরে আছে, তার কোনো রূপ চোখে পড়ে না, ভিতরে-ভিতরে একটা ভাবের আবেগ কাজ করছে এটুকু মাত্র বোঝা গেলো।

বু. ব.

উলুখড়—বিমলচন্দ্র ঘোষ। 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালা। দাম চার আনা। কবিতা-ভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিয়ু, কলিকাতা।

'দক্ষিণায়নে'র কবি বিমল ঘোষ কাব্যসমাজে স্বপ্রতিষ্ঠ। ভারতীয় ভাবধারায় পুষ্ট, ঐতিহ্যস্নাত দার্শনিক মন আর পাকা কলম নিয়ে আধুনিক কবিদের আসরে তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আসন দখল করে নিয়েছেন। আলোচ্য বইখানি অবশ্য আয়তনে ছোট এবং কবিতাগুলির আকৃতিও তাই। এর সুর মৌলিক কিন্তু আলাদা, যদিও প্রথম কবিতাটিতেই তাঁর আসল ও নিজস্ব

বক্তব্যটি ধরা পড়েছে। বেঁচে থাকার গভীর মোহে পাঠক আর কবি উভয়েই জড়িয়ে আছেন। কবি কিন্তু এই অসামান্য তুচ্ছতা নিয়েই কাব্য রচনা করেন; কখনো বাঁচার সার্থকতা খুঁজে বেড়ান, কখনো বা প্রাণধারণের গ্লানিতে পীড়িত হ'য়ে ব্যঙ্গের খোঁচা দেন। 'উলুখড়ে' তারি নমুনা পেলাম। এর প্রেরণা জীবনের প্রীতি ও অসন্তোষ দুই-ই।

ছোট ছোট কবিতাগুলির মধ্যে ছন্দের আশ্চর্য্য কৌশল আছে। পড়তে বসে অপ্রত্যাশিত মিলে আর অনাড়ম্বর জৌলুসে মন খুসি হয়ে উঠে। তবে 'লঘুপদা সরস্বতী'র আরাধনায় যে স্বাভাবিক বিপত্তি আছে, কবিতাগুলিতেও সেই দোষ-গুণের ছোঁয়াচ লেগেছে। এদের মধ্যে উজ্জ্বলতা আছে আবার তারি আনুষঙ্গিক কিছুটা কৃত্রিমতা আছে, চিন্তার সততা আছে অথচ গভীর স্পর্শ না রেখে হাল্‌কা হাওয়ায় উড়ে যাওয়ার ঝোঁকও আছে। এর কারণ কবি-মানসের স্বরূপ হল গম্ভীর ও ভাবপ্রধান। এখানে তিনি নতুন বিষয় ও আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। অতএব পরীক্ষা হিসেবেই এ বইয়ের সার্থকতা।

বইখানিতে তিনটি ভাগ রয়েছে বিষয়-অনুসারে। তিন সংখ্যার কবিতা-গুচ্ছটি বাদ দিয়ে আমি বরঞ্চ প্রথম দুটি স্তবক বেশি পছন্দ করলুম। কতকগুলি 'এপিগ্রাম' ছন্দের নিপুণতায় এবং ভাষার প্রসাদে ঝক্‌ঝকে, চমৎকার উৎরেছে। উৎসর্গ-কবিতাটিও বেশ সুন্দর। 'উলুখড়ে' একটা সঙ্কেত পাওয়া গেল সেটা কবির ও কাব্যের উভয় পক্ষেই দরকারী। দার্শনিকতা ও সংস্কৃতির ভারগ্রস্ত মন এবারে দেশের প্রকৃত জীবন, কর্ম্ম ও সহজ মুক্তির সন্ধান পেয়েছে মনে হল। পরবর্ত্তী কবিতার বইয়ে সেই নির্দ্দেশের নির্ব্বাধ প্রকাশ স্পষ্টতর হয়ে উঠবে এই আশা করি।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বাংলা গদ্যের চার যুগ—শ্রীমনোমোহন ঘোষ, এম. এ. পি-এইচ.-ডি, অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। দাসগুপ্ত এণ্ড কোং, মূল্য তিন টাকা।

বাংলা গদ্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশ ও ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে অনেকদিন পরে একটি বই হাতে এল। ডঃ সুকুমার সেনের "বাংলা সাহিত্যে গদ্য" এতদিন পর্যন্ত এবিষয়ে একমাত্র বই ছিল। মনোমোহনবাবু বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশকে বিভিন্ন যুগের পর্য্যায়ে পরিষ্কার করে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রত্যেক বড় লেখকের রচনা-সৃষ্টির আগে তাঁর জন্যে যে জমি তৈরী হোতে থাকে সেই

পূর্বাচার্যদের আলোচনা তিনি বিস্তৃতভাবেই করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অধ্যায় পড়লেই একথা বিশেষ করে বোঝা যাবে। এই সব প্রতিভাবান শিল্পীরা কি করে নিজেদের তৈরী গদ্যের ভিতর দিয়ে পরবর্তী লেখকদের প্রভাবান্বিত করেছেন এই বিষয়েও লেখকের বিশ্লেষণ প্রাঞ্জল। সাহিত্যগুরুদের এই উষা আর গোধূলিকে তিনি স্পষ্ট দেখিয়েছেন। সাহিত্যিক গদ্যের আলোচনায় আমাদের আধুনিক চল্‌তি গদ্য কেমন করে তৈরী হোল তা তিনি দেবেন্দ্রনাথ, প্যারীচাঁদ মিত্র, বংকিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদির আলোচনায় ভালো করেই বুঝিয়েছেন (পৃ ১৩৪, ১৭০)। আর একদিকে সংস্কৃত-ঘেঁষা গৌড়ীয় রীতি কি ভাবে অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও তাঁদের শিষ্যদের আশ্রয় করে টি`কে আছে তার আলোচনাও উপভোগ্য। আমাদের সাহিত্যিক গদ্যের পুষ্টিতে ইংরেজ পাদ্রীদের দানও তিনি ভোলেননি। বইটিতে শুধু বিভিন্ন লেখকের ব্যক্তিগত দানই বিচার করা হয় নি, সমসাময়িক সংবাদপত্র ও স্কুলপাঠ্য রচনার মূল্যও স্বীকৃত। এমনকি পরিশিষ্ট (৪) এ নাটকীয় গদ্যের ধারাও দেখিয়েছেন। বইয়ের গোড়ার দিকে গ্রন্থপরিচয়, কালানুক্রমণী ও শেষের দিকে পরিশিষ্ট (৫) তিনটিই বিশেষ দরকারী। পরিশিষ্টে অনেক নতুন তথ্য আছে। তথ্যগত ভুল কমই চোখে পড়ল, শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর জন্ম সাল ১৮৬৮, ১৮৭১ নয়। অত্যাধুনিক লেখকদের গদ্যরীতির বিস্তৃত আলোচনা আশা করেছিলুম। হতাশ হয়েছি। লেখক যেভাবে আধুনিক লেখকদের নামগুলিকে এক পাতায় (পৃঃ ২৩১) সাজিয়ে গেছেন, অথচ কোনো আলোচনা করেননি তাতে বইটি পংগু হয়েছে। আশা করি ২য় সংস্করণে এঁদের যথাযথ বড় আলোচনা পাব। ছাপা, বাঁধাই সুন্দর।

জীবেন্দ্রকুমার গুহ

বিদেশিনী, বুদ্ধদেব বসু। কবিতা ভবন, কলকাতা। ফাল্গুন, ১৩৪৯। [২]+৩০ পৃ। আট আনা।

একটি মাত্র কবিতা; একটি বিদেশিনী মেয়েকে ঘিরে আধুনিক ভারতীয় জীবনের ছোট একটি লজ্জাকর নিষ্ঠুর কাহিনী, সহজ অবারিত মুক্ত পয়ার ছন্দে রচিত। মুক্তছন্দে (কিংবা গদ্যছন্দে) আধুনিক জীবনের কাহিনী রচনার পথ দেখিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ; বুদ্ধদেববাবু সেই পথই অনুসরণ করেছেন, এবং আশ্চর্য হ'তে হয় এই দেখে যে সে-পথের কঠিন বাঁকগুলো পর্যন্ত তিনি সার্থক আয়ত্ত করেছেন। সত্যি বল্‌তে কি, এই ছোট্ট কাহিনীটি পড়তে-

পড়তে বারবার রবীন্দ্রনাথের মুক্তছন্দের কবিতার আঙ্গিক ও প্রকাশভঙ্গির কথা মনে পড়ে। তেমনই সহজ মুক্তগতি, তেমনই বাক্‌ ও বর্ণনার ভঙ্গি। বুদ্ধদেববাবুর রবীন্দ্রনাথ পড়া সার্থক।

কিন্তু কাহিনীটি গুছোবার কলাকৌশল, তার অন্তর্নিহিত জীবনরসের স্থূল ও সূক্ষ্ম ইঙ্গিতগুলি কখনও স্পষ্ট বর্ণনায়, কখনও গভীর ব্যঞ্জনায় ফুটিয়ে তোলার কবিকর্মের কৃতিত্ব বুদ্ধদেববাবুর নিজের। যে-ভাবে বাঙালী চরিত্রের একদিককার নীচ হীন ছলাকলাময় নিষ্ঠুরতাকে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন, তা' অনেক বাঙালী পাঠকের ভাল হয়ত লাগবে না। কিন্তু কাহিনীটির বস্তু-পরিবেশে এই ব্যঙ্গ যে সার্থক, এই জীবনের পরিচয় যে সার্থক, তা' অস্বীকার করবার উপায় নেই। বিদেশিনী মেয়ে আনার ছবিটি অতি সুন্দর সহৃদয়তায় ফুটেছে, তার মন ও হৃদয়ের চেহারাটা আমরা স্পষ্ট যেন দেখতে পাই; বীমার দালাল সতীশ সেন জটিলতর, কিন্তু সে-ও সুস্পষ্ট। কাহিনীটির পরিণতি নিষ্ঠুর সন্দেহ নেই, কিন্তু স্বার্থবুদ্ধি অনুভূতিহীন মানুষকে বিশেষ অবস্থা ও পরিবেশের মধ্যে এই রকমই নিষ্ঠুর করে তোলে; রচয়িতার মনন-কল্পনা জীবনে এই পরিচয়কে প্রত্যক্ষ করেছে এবং তিনি তাকে সার্থকতায় ব্যক্ত করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি সবচেয়ে উপভোগ করেছি, যেখানে বিদেশিনী নারী সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ দৃষ্টি ও ধারণাকে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন; এ-ব্যঙ্গ অতি সূক্ষ্ম ও প্রচ্ছন্ন। কলা-কৌশলের দিক থেকে প্রশংসনীয় কাহিনীটির লঘু সহজ অবারিত গতি, বর্ণনার স্বচ্ছ পরিচ্ছন্নতা, ইতস্তত ছড়ানো দুই চারিটি পদে গভীর কাব্যময় দীপ্তি। সর্বশেষ পরিণতিটি নিষ্ঠুর হ'লেও সুন্দর; দু'টি সংক্ষিপ্ত নাটকীয় দৃশ্য যেন চোখের উপর দিয়ে ভেসে যায়।

সাধারণভাবে কবিতাটি আগাগোড়াই অমিল ছন্দে রচিত, কিন্তু জায়গায় জায়গায় চরণের শেষে অনায়াস মিল যেখানে এসে গেছে সেখানে মিল রেখে এবং দেখিয়েই দেওয়া হ'য়েছে, এবং তার ফল কিছু খারাপ হয়নি। কিন্তু কোথাও কোথাও মিল না থাক্‌লেই যেন ভাল হ'তো, যেমন,

পড়ে আছে ধ্বংসের বিরাট স্তূপ
বিস্মৃত কালের স্মৃতি বুকে নিয়ে চুপ।

এখানে মিল না থাক্‌লেও বোধ হয় কিছুই ক্ষতি হ'তো না; তাছাড়া মিলটা হ'য়েছে অত্যন্ত সস্তা ও স্থূল রকমের। অথবা

এগোয় না কাজ।
মহারাজ
লোকটি সহজ নন্‌।

এখানেও 'মহারাজ'-এর পর লাইন ভেঙে উপরের লাইনের সঙ্গে মিলটা না দেখালেই বোধ হয় ভাল হ'তো। একটানা পদটির শেষ পর্যন্ত চলে গেলে মিলের ধ্বনিটা প্রচ্ছন্ন থাকতো, অথচ মিল দেখানোর ফাঁদটা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যেতো। অবশ্যি, অনেক জায়গায় মিল যেখানে সহজেই এসেছে ও সহজেই দেখানোও যেতো, সেখানে লেখক ইচ্ছে করেই তা' করেননি, চরণের মধ্যেই তাকে প্রচ্ছন্ন রেখে দেওয়া হ'য়েছে। তা' ভালই হ'য়েছে বলে আমরা ধারণা। অন্যত্র

ধন্য হ'বে আমার এ নগণ্য জীবন
ভারতের তীর্থে করে নিবেদন।

আমার কানে বড় সস্তা মোটা পয়ারের মত ঠেকেছে। কিন্তু, এরকম দুর্বল চরণ কবিতাটিতে আর নেই। দু' একটা শব্দও যেন কানে ঠেকেছে,

বিশেষ অভ্যেস নেই ইংরেজিতে কথোপকথনে।

'কথোপকথন' শব্দটা যেন এখানে ঠিক বসেনি, 'বাক্যালাপে' হ'লে কেমন হ'তো, অথবা আর কিছু ?

ছোটখাট এই ধরনের দু' একটি ত্রুটি চোখে পড়েছে ; কিন্তু কাহিনীটি এত বেশী উপভোগ্য যে এগুলো সহজে ধরাই পড়ে না। সংস্কারমুক্ত পাঠক এই কাহিনী-কবিতাটি পড়ে খুসী হবেন, এ-আশা অন্যায় নয়।

নীহাররঞ্জন রায়

সম্পাদকীয়

প্রভু গুহঠাকুরতা

প্রভু গুহঠাকুরতার অকালমৃত্যুর সংবাদ বাংলাদেশের লেখক, সম্পাদক, প্রকাশক ও সাংবাদিক মহলে গভীর দুঃখের সৃষ্টি করবে। যে-দেশে সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের হিতকারী বন্ধুর একান্ত অভাব, সে-দেশে তিনি ছিলেন সেই দুর্লভ মানুষদের একজন যাঁরা সাহিত্যিকের স্বভাব-বান্ধব। যিনি নিজে সাহিত্যিকবৃত্তি অবলম্বন করেননি তাঁর মধ্যে সাহিত্য বিষয়ে এমন অক্লান্ত উৎসুকতা আমাদের দেশে বড়ো একটা দেখা যায় না। প্রভুবাবুর ক্ষেত্রে এই

উৎসুকতা শুধু মৌখিক চর্চাতেই শেষ হতো না ; লেখকদের—বিশেষ ক'রে জীবনসংগ্রামে বিক্ষত নবীন লেখকদের—প্রতি সত্যিকার সক্রিয় সহানুভূতি তাঁর বিবিধ আচরণে প্রকাশ পেয়েছে। একদিকে তিনি ছিলেন গুণগ্রাহী, অন্যদিকে অত্যন্ত বন্ধুবৎসল ও স্নেহশীল ; ব্যক্তিগত জীবনে আধুনিক লেখকদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই তাঁর অকৃত্রিম সৌহার্দ্য নানাদিক দিয়ে কতখানি ফলপ্রসূ হয়েছিলো তার আলোচনার স্থান এটা নয়।

ছাত্রজীবনে ঠাকুরতা মহাশয় আবেগপ্রবণ রবীন্দ্র-ভক্ত ও খদ্দরধারী নগ্নপদ গান্ধিশিষ্য ছিলেন। তারপর তিনি গেলেন আমেরিকায়, আমেরিকা থেকে ইওরোপে। হর্ভার্ড-এর এম. এ. ডিগ্রি অর্জন ক'রে লণ্ডন থেকে পি. এইচ. ডি. নিলেন, তাঁর প্রবন্ধের বিষয় ছিলো বাংলা নাটক। প্রবন্ধটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। ('The Bengali Drama,' Kegan Paul.) কালেজি পড়াশুনো শেষ ক'রে তিনি ইওরোপের নানা দেশে, এবং ফেরবার পথে চীনে ও জাপানে, ভ্রমণ করেন। দেশে ফিরে কিছুকাল লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা ও কিছুকাল দিল্লির হিন্দুস্থান টাইম্‌স্ পত্রিকার সহকারী সম্পাদকি ক'রে কলকাতায় আসেন ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপানশন বোর্ডের প্রচার-সচিব হ'য়ে এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত ঐ কর্মেই নিযুক্ত ছিলেন। প্রচারকর্তা হিসেবে তাঁর দক্ষতা ছিলো অসাধারণ ; বাংলা বিজ্ঞাপনের জগতে তিনি যুগান্তর এনেছিলেন বললেও অত্যুক্তি হয় না। কয়েক বছর পূর্বে তিনি দ্বিতীয়বার পৃথিবীভ্রমণ ক'রে আসেন, এবারে তাঁর সঙ্গিনী ছিলেন তাঁর স্ত্রী, নীলিমা দেবী, যিনি নানা পত্রিকায় ইংরেজি ও বাংলা প্রবন্ধ লিখে, এবং চিত্রকলার অনুশীলন ক'রে আমাদের গুণীসমাজে স্বনামে পরিচিত।

ঠাকুরতা মহাশয় প্রিয়দর্শন, প্রিয়ভাষী ও অত্যন্ত দিলখোলা হাসিখুশি মেজাজের মানুষ ছিলেন। তাঁর সংশ্রবে যিনিই এসেছেন তিনিই জানেন তাঁর উপস্থিতি কেমন একটি সানন্দ উদারতা বিকীরণ করতো। তাঁর মুখশ্রীতে, ব্যবহারে, কথাবার্তায়, তাঁর কাজে ও আনন্দে ছিলো উচ্ছল প্রাণশক্তির পরিচয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো মাত্র ৪২।

'কবিতা'র রবীন্দ্র-সংখ্যায় আমরা প্রভুবাবুর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার উল্লেখ করেছিলাম। বস্তুত, 'কবিতা'-সম্পাদক ব্যক্তিগতভাবে এই মানুষটির কাছে আবাল্য যে কতখানি ঋণী তার সম্পূর্ণ স্বীকৃতি 'কবিতা' পত্রিকায় কখনোই করা যাবে না। আমরা যখন অতি তরুণ বয়সে 'প্রগতি' বের করে-

ছিলাম তার পিছনে ছিলো তাঁরই উৎসাহ এবং সেই পত্রিকায় তিনি বিদেশি সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে যে-প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন সেগুলি পরে একত্রিত হ'য়ে 'এ ও তা' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। অন্যান্য কর্মে অত্যন্ত বেশি লিপ্ত হ'য়ে না-পড়লে বাংলা সাহিত্য তাঁর কাছ থেকে আরো-কিছু পেতে পারতো এবং বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে তাঁর মনে বরাবর যে-গভীর উৎসাহ ছিলো তাও আরো সফল হ'তে পারতো। কিন্তু জীবনে কতটুকু তিনি করেছেন বা করতে পারেননি সে-বিচার ঠাকুরতা মহাশয়ের ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। তাঁর ব্যক্তিত্বই ছিলো মূল্যবান, তাঁর জীবনই ছিলো সামাজিক সম্পদ। তাঁর সঙ্গে আমাদের বহুকালের ভালোবাসার পটভূমিকাতেই তাঁর মৃত্যুকে আমরা দেখছি —তা ছাড়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়—মনে হচ্ছে তাঁর জীবনের সঙ্গে-সঙ্গে আমাদেরই জীবনের এক অংশ শেষ হ'য়ে গেলো। পাঠকরা এই ব্যক্তিগত স্বর মার্জনা করবেন। কখনো ভাবিনি 'কবিতা'র পৃষ্ঠায় প্রভু গুহঠাকুরতার মৃত্যুর উল্লেখ করতে হবে। তাও করতে হ'লো।

স্বীকৃতি

চিত্রা ও **গীতাঞ্জলি**-র নূতন সংস্করণ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। দুটি বই-ই ডবল ক্রাউন ষোলো পেজি আকারে স্মল পাইকা অক্ষরে ছাপা, কাগজে বাঁধাই, এক টাকা দাম আজকালকার পক্ষে খুবই শস্তা। 'চিত্রা'র এই সংস্করণে যে পাঠপরিচয় সন্নিবিষ্ট হয়েছে, 'রচনাবলী'র গ্রন্থপরিচয় অপেক্ষাও তা বিস্তৃত। গীতাঞ্জলির 'বর্তমান সংস্করণে অনেক গান ও কবিতার রচনাস্থান নির্দিষ্ট……এবং রচনা-তারিখ ও পাঠ সংশোধিত' হয়েছে।

ঢাকা থেকে সোমের চন্দর ছোটোগল্প সংগ্রহ 'সংকেত ও অন্যান্য গল্প' নামে প্রকাশিত হয়েছে (১৷৷৹)। পাঁচটি গল্প আছে।

কবিতা

অষ্টম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা আষাঢ়, ১৩৫০ ক্রমিক সংখ্যা ৩৭

পত্রগুচ্ছ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত ও বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত]

১৫

কল্যানীয়েষু, আজ তোমাকে একখানা চিঠি লিখেছি, কিন্তু সেটা চিঠি হয়ে উঠল না। বাংলায় আর-একটা শব্দ আছে চিঠা—সেটার দলিলপত্রে ব্যবহার হয় কিন্তু সাহিত্যের দফতরে সেটাকে টেনে নিতে পারলে কাজে লাগত।

বর্তমান পলিটিক্‌সের চালচলন দেখে মনটা অত্যন্ত ভারাক্রান্ত ছিল তাই সেই প্রসঙ্গটার কক্ষপথে পৌঁছবামাত্র আমার চিঠি তার ভারাকর্ষণে চ্যাপটা হয়ে পলিটিক্‌সের শনিগ্রহের চারদিকে ঘুর খেতে লাগল। দৌড় দিয়েছে লম্বা চালে কিন্তু রস পেলুম না। মাথার মধ্যে মেঘ ঘনিয়েছিল, ভেবেছিলুম হবে এক চোট ধারাবর্ষণ কিন্তু হোলো কিনা শিলবৃষ্টি। তার কারণ কড়া হাওয়া দিয়েছিল মনের আবহমণ্ডলে।

ইতিহাসের ঝোড়ো মাতুনি চলেছে জগৎ জুড়ে, লুটোপুটি করচে ওষধি বনস্পতি, দোহাই পাড়চে শাখা প্রশাখারা বধির আকাশের দিকে। এই ধাক্কাটা তাদের ভাঙবেই যাদের মজ্জা দুর্বল, কাঁচা ফল অনেক যাবে পড়ে পাক ধরবার পূর্বেই। একটা সংকটের পর্ব চুকিয়ে দিয়ে যারা টিঁকে থাকবে তারা নতুন জীবনের পালা আরম্ভ করবে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অতীতের মাঝখানে, যা অনিবার্য তা সব নিষেধকে ঠেলে ঠুলে ঢুঁ মারবে ভিতর থেকে। আমরা সেই অনিবার্যতার সঙ্গে জড়িত তাও জানি, আমাদের জোর লাগাতে হবে তার দক্ষিণে নয় বাঁয়ে দাঁড়িয়ে, তাকে চরমে নিয়ে যাব সবাই মিলে সত্য-মিথ্যার ঠেলা-ঠেলিতে। তবু গীতার শাসন মানতে হবে—ইতিহাসবিধাতার

সৃষ্টিকার্যে খাটুনি খাটতেই হবে কিন্তু মনকে রাখতে হবে নিরাসক্ত। বিভ্রান্ত হয়ে চেঁচামেচি করি কেন, হিস্টিরিয়ার হাত পা খেঁচুনি কেন লাগে কথায় কথায়। বাংলা দেশের মনে অল্প একটুতেই ধুলো-ওড়ানো আঁধি লাগে, উনপঞ্চাশ পবনের মধ্যে সেইটেই সব চেয়ে দুর্বল হাওয়া। দেখতে সে পালোয়ান, কিন্তু যারা সৃষ্টিকার্যের পক্ষভুক্ত তারা এর হাঁসফাসানিতে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। যারা অব্যবস্থিতচিত্ত তাদের কে মনে করিয়ে রাখতে পারবে যে মহৎকাজে চাই তপস্যার চিত্তবৃত্তি—শান্তোদান্তউপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা।

তোমার চিঠিখানা প্রবাসী সম্পাদকি কারখানায় চালান হয়ে গেছে, কেননা সময় নেই। জ্যৈষ্ঠমাসের [ছাপার অক্ষরে দেখতে পাবে]।

Family Reunion বইখানি গভীরভাবে ভালো লেগেছে। যদি মন স্থির করতে পারি পরে তোমাকে কিছু লিখব।

আগামী কাল ২৫ বৈশাখ। এখানে আয়োজন চলেচে। ভালো লাগচে না।

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪ বৈশাখ ১৩৩৯

১৬

কল্যানীয়েষু

সেমন্তীর জন্যে আমরা উদ্বিগ্ন ছিলেম। চার্লির পত্রে তার শেষ খবর পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি।

জন্মমৃত্যুর মাঝখানকার এই জীবনটা ক্ষণিক জীবন তাতে তো সন্দেহ নেই, অর্থাৎ প্রজাপতির সঙ্গে আয়ুর পরিমাণ নিয়েই তার তফাৎ। মানুষ, অন্তত আমরা অনেকেই এই ক্ষণজীবনের তরণীকে আয়ুর সীমানাপারের দিকেই লগি ঠেলে চালাচ্ছি। তার মানে নিজের ভিতর থেকে সেই অভিজ্ঞতাকে রচনা করতে চাচ্ছি অন্য কালে অন্যেরা যাকে আদর করে আপন

অভিজ্ঞতার সঙ্গে গেঁথে নেবে। অন্যের অনুভূতির স্রোতে নিজের অনুভূতিকে ভাসিয়ে নিয়ে তাকে দূর ভবিষ্যতের ঘাটে ঘাটে চালান করে দেওয়া, অর্থাৎ এমন ব্যবসা করা, যার পাওনা জমতে থাকে প্রেতলোকের খাতাঞ্চিখানায়, কারো ভোগে আসে না—হয়তো সারা জীবন লোকসান দিয়ে যখন ডিভিডেণ্ড ডিক্লেয়র্ড হয় তখন তহবিল হয় অদৃশ্য। অথচ এই পাওনার দাবী নিয়ে যে হাতাহাতি চলে, তা কোম্পানির কাগজের স্বত্বের মকদ্দমার চেয়ে কম উম্মাজনক নয়, এমন কি এতে পিছন দিক থেকে গুপ্ত ছুরি মারামারিও চলে। বয়স যখন অল্প ছিল তখন এই মরীচিকা সম্পদের জন্যে লোভ ছিল প্রবল। সাহিত্যিক ভাষায় যাকে অমরতা বলে থাকে, যার স্বত্বসাব্যস্তের নিশ্চিত দলীল মহাকালের বড়ো আদালত থেকেও সব সময়ে পাওয়া যায় না সেটা আমার নামে রেজেষ্টারি হয়ে গেছে বলে বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে, প্রকাশ্যে না হোক্ মনে মনে তক্‌রার করেছি, এখন তা নিয়ে স্বগত উক্তিতেও সময় নষ্ট করতে প্রবৃত্তি হয় না। নামের ঝুলিতে যা জমা হয় কী হবে তার দাম যাচাই করে। এতদিন ধরে যে ফসল ফলিয়েছি, যার কিছু উঠেছে মরাইয়ে, কিছু ছড়িয়ে আছে ক্ষেতের মধ্যে, সে সমস্ত ভাণ্ডারে তুলে থাকে থাকে ভাগ করে গুছিয়ে রাখবার জন্যে আমার এই শ্যামলী পাড়ায় একটা উদ্যোগ চলেছে। আমাকে তাতে মাঝে মাঝে মন দিতে হয়, এই কথা ভাবি দানের জিনিষ সম্বন্ধে দায়িত্ব আছে, যা অন্যের জন্যে উৎসর্গ করা হয়েছে তাকে এলোমেলো করা চলবে না, অন্যের প্রতি সম্মান রক্ষার জন্যেই। কিন্তু কী জানি এই ভাবী কালের সমুদ্রপারগামী জাহাজে মাল তোলার কাজে আমার মন ক্লান্ত হয়, সেই সঙ্গে বার বার মনে ইচ্ছা জাগে আমার মৃত্যুর পরে যেন স্মৃতিসভার উদ্যোগ না করা হয়। বার্ষিক অনুষ্ঠানের দ্বারা সভাধিবেশনে স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখবার কৃত্রিম কর্তব্যতা আমাদের দেশে কোনো কালে ছিল না,—ক্রমশ এ রকম চেষ্টার মধ্যে জোর গলার ঘোষণাগুলো মিথ্যায় জড়িয়ে আসে, এই সম্ভাবনা মনে করতেও আমার মন সঙ্কুচিত হয়। মানুষের স্বভাবের মধ্যে

ভোলবার শক্তি আছে—সেই শক্তির ভিতর দিয়েই সত্যের বাছাই হয়, বাইরে থেকে খোঁচা দিয়ে দিয়ে সেই শক্তিকে ব্যর্থ করা অন্যায়। এই ভোলার দ্বারাই মানুষ মৃত ব্যক্তির অনেক লজ্জা চাপা দিয়েছে। এক সময়ে যে শিরোপার জরির কাজগুলো ছিল উজ্জ্বল, যদি স্বতই তার জেল্লা কমে যেতে থাকে তবে ক্ষণে ক্ষণে তার প্রদর্শনী করাকে কি সম্মান দেখানো বলে? যদি না কমে থাকে তা হলে স্বতপ্রকাশিত মহিমার উপরে বার্নিশ লাগাবার চেষ্টায় অনেক সময়ে উল্টো ফল হয়।

তোমাকে এই খবরটা দিতে বসেছিলুম, যে আমি সম্প্রতি ক্ষণিক জীবনের ছোটো আয়ুর মাপের পেয়ালায় প্রতিদিনের রসপানে প্রবৃত্ত আছি, আমার ক্ষণিকার প্রথম কবিতায় যার কথা লিখেছিলুম। দ্বারের সমুখে পাতাঝরা শিমুল গাছ ফুলে উঠেছে ভরে। মধুর লোভে ছোটো বড়ো নানা জাতের পাখী ভিড় করেছে। কিছুদিন পরে ফুল যাবে নিকেশ হয়ে, কচি পাতার পালা আসবে, মধুলোভীদের কাকলী নীরব হবে, তখন উঠবে ওর আপন পাতারই মর্মরধ্বনি। নিজের দিকে তাকিয়ে ভাবচি, দিনের পাওনা দিন আমাকে দিয়ে যাচ্ছে, তার প্রয়াস নেই, তার বোঝা নেই, তার দাম নেই যেমন আমার বাগানের বাতাবী লেবুর গাছে যে রোদ ঝিলমিলিয়ে উঠচে তার কোনো দাম নেই। দাম পাওনার তাগিদে যদি পাড়ায় বেরোনো যেত, দিনের সীমা-পেরোনো সঞ্চয়ের পাকা খাতা নিয়ে পড়তে হোতো, তা' হলে দিন হোতো মাটি। আজকাল গান তৈরি করচি, রিহর্সলে বসচি, এ গানের এ কাজের খুশিটুকু ক্ষণিকের মধ্যে পরিমিত, কাল কেউ এ-সব মনে রাখবে না, কিন্তু আজ এর মধ্যে যে মধু আছে সে আজকের পক্ষে যথেষ্ট। ইতি ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭

পুরী

কল্যাণীয়েষু,

অমিয়, নতুন কবিতা লিখতে ফরমাস করেছ কিন্তু ক্লান্ত শরীর মনে নতুনের স্ফূর্তি হয় না—শুকনো ডালের মজ্জা থেকে ফুল রস পাবে কোথা থেকে? অসুস্থ শরীর নিয়ে এসেছি কল্‌কাতা থেকে;—সার্কিট হৌসের দোতলায় সমুদ্রের সামনে বসে আছি একটা কেদারায়। এ সমুদ্রের প্রাণটা যেন পাণ্ডুবর্ণ, নীলিমার নিবিড়তা নেই এর জলে, ঢেউগুলো কি আমারি বুকের রক্তদোলনের মতো হাঁফ ধরা,—শ্রান্ত এর একঘেয়ে শব্দ, আর ঐ সারবাঁধা ফেনার পদবন্ধ, নির্জীব পয়ারের চোদ্দ অক্ষর বাঁধা লাইনের মতো তটের উপর গড়িয়ে পড়চে পুনঃ পুনঃ—ঐ বার বার অনুচ্চ ভাষায় ফিরে ফিরে আসাতে জোর দেয় না—জোরকে নিঃশেষ করে দেয়। বাতাসটা অত্যন্ত ঘুম পাড়ানে। তন্দ্রাবিষ্ট দিনের বৈচিত্র্যহীন পুনরাবৃত্তি ঐ শাদা ফেনমালার নিরর্থক গতায়াতের মতো। ভেবেছিলুম এখানে এসে কিছু লিখব, কিছুতেই মন লাগল না লিখতে। এমন সময়ে তোমার অনুরোধ এল—কেদারায় পড়ে পড়েই লিখলুম। কলমটাকে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে তুলতে হোলো। মনে পড়চে এইখানেই এই বাড়িতেই লিখেছিলুম—হে আদিজননী সিন্ধু বসুন্ধরা সন্তান তোমার। সমুদ্রে তখন বোধ হয় যৌবনের উদ্দামতা ছিল—তার সঙ্গে ছন্দের পাল্লা দেবার স্পর্দ্ধাতেই আমার সেই লেখা। এখনকার লেখায় সেদিনকার মতো উদ্বেল প্রাণের অচিন্তিত গতিমত্ততা থাকতেই পারে না, আছে হয়তো আত্মসমাহিত মনের ফল ফলানোর নিগূঢ় আবেগ। যদি মনকে কর্মবিতৃষ্ণা থেকে টেনে তুলতে পারি তাহলে তোমাকে আর একটা চিঠি লিখব। ইতি ২৩।৪।৩৯

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

অনেক দিন পরে তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুব খুসি হয়েছি। আমিও বার বার তোমাকে চিঠি লিখি লিখি করেছি। কিন্তু প্রাণ যখন সচল ছিল তখন সে আপনার বোঝা আপনিই বয়েছে এখন সে স্থাবর হয়ে পড়াতে ছিয়াত্তর বছরের আয়ুর ভারে মন্থর মনটাকে কোনো কাজে চেতিয়ে তোলা বড় শক্ত হয়ে পড়েচে। মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে স্থাণু হয়ে থাকা তো চলে না, সেইজন্যে আজকাল প্রকৃতির সাহচর্য্য আমার পক্ষে সহজ হয়ে এসেছে। উভয় পক্ষেই পরস্পরের কাছে কোনো দাবী দাওয়া নেই। আর একটা আনন্দ পাই বড়ো বড়ো গাছগুলোর মধ্যে। ওদের জীবনলীলায় বয়স যেন থেমে আছে, ওরা প্রাচীন নবীন এক সঙ্গেই— বয়সের ক্লান্তি ওদের একটুও নেই। ঐ শাল গাছ পঞ্চাশ বছর আগে যে অম্লান ফুল ফুটিয়েছিল আজও ঠিক সেই ফুলই ফোটাচ্ছে কিন্তু ক্ষণিকায় আমি ত্রিশ বছর বয়সে যে কবিতা লিখেছি, আজ আমি সে কবিতা লিখিনে। আমার কবিতার ভিতর দিয়েই কুষ্ঠির গণনা করা যেতে পারে, তার মধ্যেই রয়ে গেছে বয়সের হিসাব। আকাশের উপর দিয়ে যে দিন রাত্রি আসে যায় কালিদাসের যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত তাদের ছায়া আলোর সম্পদ একই, অথচ ৭০ বছরের মধ্যেই তারা আমার দেহমনকে যেন বহু জন্ম জন্মান্তরের ভিতর দিয়ে নিয়ে আসচে। সঞ্চয় ফেলতে ফেলতে চলেছি, পরিচয়ের বদল হচ্চেই। কিন্তু মানুষের মুস্কিল এই যে আমাদের পারিপার্শ্বিক আমাদের পরিণতির নূতন পর্ব্বকে সহজে স্বীকার করতে চায় না, এক কালের দাবী অন্য কালেও চাপাতে চায়। এই জন্যেই আমাদের শাস্ত্রে পঞ্চাশের পর সমাজের রঙ্গভূমি থেকে নেপথ্যে সরে যেতে বলে। এ দেশের উপদেশ অনুসারে সমাজ অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে সম্বন্ধ জীবনের মাঝখানটাকে।

বাল্যকালও দায়িত্ববিহীন, বৃদ্ধ বয়সও। সামনের জীবনের জন্যে বালককে যখন প্রস্তুত হতে হয় তখন সংসার তার উপরে কর্তব্যের দাবী করে না। কিন্তু মৃত্যুর জন্যেও প্রস্তুত হওয়া উচিত। মৃত্যুকে যারা অনর্থক বলেই জানে, তারা যেন চিরদিনই বাঁচতে হবে সেইরকম ভঙ্গীতে মৃত্যুকে অস্বীকার করতে চায়। কিন্তু ঠিকমতো করে থেমে যাওয়াতেই প্রাণের পূর্ণতা প্রকাশ পায় এটা মনে রাখলে সেই থামবার জন্যেই সাধনা করা চাই। বস্তুত সকলে মিলে ঠিক সময়ে থামতে দিতে চায় না বলেই শেষ বয়সটা এত ক্লান্তির কারণ হয়ে ওঠে। মৃত্যুর প্রবেশ প্রাঙ্গণে যে বৃহৎ অবকাশ অপেক্ষা করে আছে তাকে যদি বাইরের সংসার এবং অন্তরের পূর্ব্বাভ্যাসে মিলে নষ্ট করতে না থাকে তা হলে সেটা খুব সুন্দর। য়ুরোপের নকল করে কর্ম্মপূজাকে আমরা এত বড়ো কৃত্রিম মূল্য দিয়েছি যে জীবনটা যে একটা আর্ট, সুতরাং সমাপ্তিতে তার একটা সম্পূর্ণতা আছে বাহাদুরী করে এটা আমরা ভুলতে বসেছি। বৃদ্ধের আদর্শ যারা, অর্থাৎ যারা ঠিকমতো করে বুড়ো হতে জেনেছে একদিন আমাদের সমাজে তাদের খুব বড়ো জায়গা ছিল। আজ সে জায়গা তাদের দিতে চায় না বলেই তাদের তারুণ্যের ভাণ করতে হয়। কম্যুনাল এওয়ার্ড নিয়ে বক্তৃতা দিতে হয়, সাহিত্যের মজুরিগিরি চালাতে হয়, foreword লেখা, নবজাত মাসিকপত্রে আশীর্ব্বাণী, নতুন রচনা সম্বন্ধে অভিমত দেওয়া ইত্যাদি হাজার রকম উপদ্রব মেনে না নিলে কর্ত্তব্য ত্রুটির অপবাদ আক্রমণ করে। আগে অরণ্য ছিল এখন তাও নেই, গিরিশিখরে, সমুদ্রতীরে আধুনিক বানপ্রস্থের রসদ জোগানো যে সে লোকের কর্ম্ম নয়। অতএব দেখতে পাচ্ছি সুন্দর করে মরা অদৃষ্টে নেই, ক্লান্তিতে জীর্ণ জীবনের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে মাঝরাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে অজায়গায় থামতে হবে।

তোমাকে আর একখণ্ড "পত্রপুট" দিতে বলব। আশা করি নূতন সংস্করণের গদ্য বইগুলিও তোমাকে পাঠানো হচ্ছে। প্রুফ সংশোধন করতে গিয়ে দেখি সেগুলি পাঠ্য। ইতি—১৩ জুলাই ১৯৩৩

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সমালোচনা

আত্মপরিচয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী, দেড় টাকা।

সাহিত্যের স্বরূপ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী, ছয় আনা।

আমাদের নববর্ষের সঙ্গে রবীন্দ্রজন্মদিবসের অনুষঙ্গ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গেছে; বস্তুত, সমস্ত বৈশাখ মাসটির নিবিড় রবীন্দ্র-রস বিশেষভাবে আমাদের মনকে নাড়া দেয়। বছরের প্রথম মাস ব'লে বৈশাখ চিরকালই আমাদের কাছে শুভ, কিন্তু পঁচিশে বৈশাখ এই মাসটিকে একটি অতিরিক্ত এবং অপূর্ব ব্যঞ্জনা দিয়েছে। এবারে বৈশাখের অভ্যর্থনা বিশ্বভারতী যথাযোগ্যভাবে সম্পন্ন করেছেন রবীন্দ্রনাথের দুটি নতুন বই প্রকাশ ক'রে—এবং বই দুটির উপলক্ষে দুটি নতুন গ্রন্থমালার সূত্রপাত ক'রে। 'আত্মপরিচয়' রবীন্দ্র-পরিচয় গ্রন্থমালার প্রথম বই। বইটি বিশেষভাবে মূল্যবান। ছ'টি প্রবন্ধ ও একটি ফ্যাকসিমিলিতে ছাপা ছবি আছে—সবই পূর্বপ্রকাশিত, কিন্তু এই প্রথম গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ। রচনাগুলির বিষয় কবির আত্মজীবন, তাঁর আত্মিক জীবনের মর্ম উদ্ঘাটনে বইটি 'জীবনস্মৃতি' 'ছেলেবেলা'র পাশে স্থান পাবে। রচনাগুলি ১৩১১ থেকে ১৩৪৭-এর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে ও উপলক্ষে লেখা, তাই রচনারীতিতে বৈসাদৃশ্য যথেষ্ট আছে, কিন্তু এটা লক্ষ্য করবার যে দৃষ্টিভঙ্গি মূলত এক। জীবন-কাহিনী সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মনোভাবের সমর্থন তিনি কখনো করতে পারেননি, এ-বিষয়ে নানা জায়গায় নানা মন্তব্য তাঁর পাওয়া যাবে। সে-সব পড়ে ধারণা করা যায় যে কোনো কবি কি শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে পাশ্চাত্য কৌতূহল তাঁর প্রগল্‌ভ লেগেছে। তিনি মনে করতেন যে কবি যেখানে মানুষ মাত্র, সেখানে তিনি আর পাঁচজনের মতোই সাধারণ মানুষ, তিনি কী খেতেন, কী পরতেন, স্ত্রীর সঙ্গে কী-রকম ব্যবহার করতেন এ-সব তথ্য অবান্তর এবং প্রকাশ-অযোগ্য, তা নিয়ে খুব বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করা মানসিক বিকৃতির লক্ষণ। এ-মতের বিরুদ্ধে কিছু যুক্তি নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে কোন মত ঠিক সে-তর্কে আপাতত যাবার দরকার নেই। রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবন বিষয়ে যা-কিছু লিখেছেন তা থেকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি। তিনি সর্বদা তাঁর আন্তরিক জীবনের কথাই লিখেছেন, তাঁর কবিত্বের ক্রমবিকাশ, তাঁর বিদ্যালয়, তাঁর ধর্মবিশ্বাস, তাঁর বাল্যকালের সমস্ত প্রভাব, যা তাঁর পরবর্তী জীবনকে রূপ দিয়েছে—এ-সব বিষয়ে তিনি পূর্ণমাত্রাতেই আপন ইতিহাস জানিয়েছেন। যাঁরা তাঁর স্বভাবে কার্পণ্য কিংবা আত্মগোপনের স্পৃহা দেখতে পান, তাঁরা তাঁর এই ধরনের লেখায় ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি আশা করেন, কিন্তু ও-রকম আশা করাই অন্যায়। যে-জীবন নিতান্তই ব্যক্তিগত

সে-বিষয়ে কোনো-কিছু বলা একান্তই তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিলো, ভ্রমণকাহিনীগুলিও এ-বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে। আমরা যাকে 'তথ্য' বলি সে-বিষয়ে বিমুখতা তাঁর প্রকৃতিগত, এবং বয়স বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে তা আরো প্রবলই হয়েছে। 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' কি 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'তে নিজের কথা তবু কিছু-কিছু আছে, কিন্তু 'যাত্রী' 'রাশিয়ার চিঠি' প্রভৃতি শেষ জীবনের ভ্রমণগ্রন্থে নিজের বিষয়ে তিনি একেবারেই চুপ। নিজের জীবনের কথা বার-বার তাঁকে বলতে হয়েছে, কিন্তু যেখানেই যেটুকু বলেছেন সবই তাঁর সাহিত্যরচনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত, এ ছাড়া আর সব কথাই তাঁর মন স্বতঃই বর্জন করেছে। এ-সব লেখার মূল্য তাঁর 'জীবনচরিতের উপাদান' হিসেবে নয়, তাঁর সাহিত্য বোঝাবার উপায় হিসেবে। বস্তুত, নিজের লেখার শ্রেষ্ঠ সমালোচনা তিনি নিজেই লিখে গেছেন। যেখানে তিনি ব্যক্তিগত জীবনের তথ্য উল্লেখ করতে বাধ্য হয়েছেন, সেখানে তাঁর অনিচ্ছা ও উদাসীনতা লেখাতেই ধরা পড়ে, 'আত্মপরিচয়ে'র অন্তর্গত চিঠিতে স্ত্রী-বিয়োগের তারিখটি পর্যন্ত ভুল লেখা আছে।

আত্মপরিচয়ের প্রথম ও তৃতীয় প্রবন্ধে নিজের জীবনকে নিজের লেখার সঙ্গে মিলিয়ে তিনি প্রকাশ করেছেন। নিজেকে তিনি কী চোখে দেখতেন সেটা স্পষ্ট হ'য়ে ফুটেছে। তিনি কর্তা নন, উপলক্ষ্য; কবি নন, কবির মুখপত্র। তাঁকে দিয়ে কোন এক বিশ্বকবি তাঁর নিজের কথা বলিয়ে নিচ্ছেন, তাঁর ভিতর দিয়ে কোন এক বিশ্বসত্তা আপনাকে প্রকাশ করেছে। এটাই রবীন্দ্রনাথের ধর্মবিশ্বাস, আবার এটাই তাঁর সাহিত্যসাধনার ভিত্তি। যখন যা লিখেছেন তার তাৎপর্য নিজে বোঝেন নি। সেই ছোটো-ছোটো লেখাগুলিকে নিজের মধ্যেই সম্পূর্ণ ব'লে ভেবেছেন, কিন্তু পরে দেখা গেছে সেগুলি এক বিরাট সমগ্রতার ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, তাদের ভিতর দিয়ে এক মহান তাৎপর্য নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত। বলতে চেয়েছেন নিজের সুখ-দুঃখের কথা, তা হ'য়ে গেছে বিশ্বের কথা। শুধু তাঁর সাহিত্য নয়, তাঁর জীবনকেও কে এক নেপথ্যবাসী প্রতি মুহূর্তে রচনা ক'রে যাচ্ছেন, তার সমস্ত খণ্ড-খণ্ড বিচ্ছিন্নতাকে একটি 'অখণ্ড তাৎপর্যের মধ্যে' সম্পূর্ণ ক'রে তুলছেন। এই কথাটাই তিনি বলতে চেয়েছেন 'জীবনদেবতা', 'অন্তর্যামী'—এবং আমি মনে করি 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতায়। এদিক থেকে এগুলিকে তাঁর চাবি-কবিতা বলা যায়। কেননা এইটেই তাঁর জীবনের ও সাহিত্যের মূল কথা। বলা যেতে পারে যে এ-কথা প্রত্যেক বড়ো কবি সম্বন্ধেই সত্য—

নিজের অজ্ঞাতেই যে ছোটো কথা বড়ো কথা হ'য়ে ওঠে, নিজের সুখদুঃখের কাহিনী বিশ্ব-বাণীতে পরিণত হয়, সেটাই তো প্রতিভা। এই প্রতিভার অলৌকিক রহস্যময়তা সম্বন্ধে কবিরা অনেকেই সচেতন—বিভিন্ন কবি বিভিন্ন নামে তাকে সম্বোধন করেছেন—কিন্তু এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মতো এমন সুতীব্র সচেতনতা অন্য কোনো কবিতে দেখা যায় না। নিজের প্রতিভাকে নিজের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ক'রে তিনি দেখেছিলেন, এমনকি শেষ পর্যন্ত সর্বব্যাপী ঈশ্বরের সঙ্গে তার অভিন্নতা স্বীকার করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির এখানেই অনন্যতা। এ-বইয়ের প্রথম প্রবন্ধে এ-কথাটি খুব স্পষ্ট ক'রেই তিনি বলেছেন এবং এর তৃতীয় প্রবন্ধ 'আমার ধর্মে'র সঙ্গে একে মিলিয়ে পড়লে তাঁর বক্তব্য সম্পূর্ণ বোঝাবার সুবিধে হবে।

এ-বইয়ের সবগুলি রচনাই মূল্যবান, তবু এর পরেই পঞ্চম প্রবন্ধটির বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই। এটি রবীন্দ্র-জয়ন্তীর প্রতিভাষণ। এখানে 'ছেলেবেলা'র পূর্বাভাস পাওয়া যাবে। সত্তর বছর বয়সে দেশব্যাপী বিরাট অভিনন্দনের এই প্রত্যুত্তরে তাঁর প্রতিভার মহত্ত্বই ধরা পড়েছে। রচনাটি সাহিত্যিকের ও সাহিত্যসমালোচকের বার-বার পাঠ্য। এ থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করছি—আজকের দিনে আমাদের সমালোচনার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ যখন দুঃসহ হ'য়ে উঠেছে, তখন এই কথাগুলির যত বেশি পুনরাবৃত্তি হয়, ততই ভালো :

> সাহিত্যে মানুষের অনুরাগ-সম্পদ সৃষ্টি করাই যদি কবির যথার্থ কাজ হয়, তবে এই দান গ্রহণ করতে গেলে প্রীতিরই প্রয়োজন। কেননা প্রীতিই সমগ্র করে দেখে। আজ পর্যন্ত সাহিত্যে যাঁরা সম্মান পেয়েছেন তাঁদের রচনাকে আমরা সমগ্রভাবে দেখেই শ্রদ্ধা অনুভব করি। তাকে টুকরো টুকরো ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছিদ্র সন্ধান বা ছিদ্র খনন করতে স্বভাবত প্রবৃত্তি হয় না। জগতে আজ পর্যন্ত অতি বড়ো সাহিত্যিক এমন কেউ জন্মান নি, অনুরাগবঞ্চিত পরুষ চিত্ত নিয়ে যাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাকেও বিদ্রূপ করা, তার কদর্থ করা, তার প্রতি অশোভন মুখবিকৃতি করা যে-কোনো মানুষ না পারে। প্রীতির প্রসন্নতাই সেই সহজ ভূমিকা যার উপরে কবির সৃষ্টি সমগ্র হয়ে সুস্পষ্ট হয়ে প্রকাশমান হয়।

'রবীন্দ্র-পরিচয় গ্রন্থমালায় রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে অন্যান্য বই দেখতে আমরা উৎসুক থাকবো।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের প্রথম বই 'সাহিত্যের স্বরূপে' ন'টি সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ একত্র করা হয়েছে—সব ক'টিই হাল আমলের রচনা, এবং অধিকাংশই 'কবিতা' পত্রিকায় প্রথমে প্রকাশিত।

সাহিত্যপ্রসঙ্গে যত প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন তার সবগুলির মধ্যে একটি নিরবচ্ছিন্ন পারম্পর্য আছে। বিভিন্ন উপলক্ষ্যে সাহিত্যের মূল সূত্রের আলোচনাই তিনি করেছেন, সেখানে তাঁর ধারণার পরিণতি ঘটেছে, পরিবর্তন ঘটেনি। তিনি যে বলেছেন 'সমালোচনার আসরে আমার আসন থাকতেই পারে না', এ-কথা অত্যন্ত বিনয়প্রসূত সে-কথা বলাই বাহুল্য। কেননা যদিও তাঁর ভাষা 'অলংকারের ঝংকারে মুখরিত', তবু—কিংবা সেইজন্যেই—সাহিত্যের মর্ম তাঁর আলোচনায় যে-রকম প্রকাশমান এমন আমাদের দেশের অন্য কোনো সমালোচকের লেখাতেই নয়। যিনি সৃষ্টির ক্ষেত্রে এত বড়ো তিনি যখন সমালোচনার ক্ষেত্রে নামেন, তখন তাঁর কাছে আমাদের সাহিত্যশিক্ষা যত প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্ট হবে, শুধু-সমালোচকের লেখায় তা যে হ'তে পারে না এ তো সহজবুদ্ধির কথা। সমালোচকের একটি কঠোর নীরস মূর্তি আমরা সাধারণত কল্পনা ক'রে থাকি, কিন্তু সেটা সমালোচনার একটা দিক মাত্র। যেখানে পরিশ্রম দরকার, তথ্যসন্ধান দরকার, ইতিহাসের ব্যাখ্যা কিংবা আঙ্গিকের চুল-চেরা বিশ্লেষণ দরকার, সেখানে সমালোচকের কাজ নীরস ও মমতাহীন, কিন্তু শুধু সেটাই তো সমালোচনা নয়। সমালোচনার আর-একটা দিক আছে, সেটাই বড়ো দিক। সেটা সাহিত্যের রস পাঠকের মনে সংক্রামিত করা, সাহিত্যের মূল সূত্র উদ্ঘাটন করা, এবং প্রসঙ্গত ভালো লেখার একটি আদর্শ সকল লেখকের ও পাঠকের সামনে উপস্থিত করা। এ-কাজ যাঁরা করেছেন তাঁরাই শ্রেষ্ঠ সমালোচক ব'লে স্বীকৃত, এবং তাঁদের সকলের লেখাই এতখানি সরস যে পরবর্তী যুগে তাঁদের মতামত সম্পূর্ণ গৃহীত না-হ'লেও শুধু লেখার গুণেই পাঠকের চিত্তে তাঁদের রাজত্ব নষ্ট হয়নি। অর্থাৎ, সমালোচনাকেই তাঁরা সাহিত্য ক'রে তুলেছিলেন। এইটেই শ্রেষ্ঠ সমালোচনা। এই বইয়েরই এক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মোটের উপর নিরাপদ হচ্ছে ভাল না করা, সাহিত্যের সমালোচনাকেই সাহিত্য করে তোলা। সে-রকম সাহিত্য মতের একান্ত সত্যতা নিয়ে চরম মূল্য পায় না। তার মূল্য তার সাহিত্যরসেই।'

রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীরই সমালোচক। তাঁর সমালোচনার মূল্য তার মতামতে নয়, তার সাহিত্যরসে। তাই ব'লে মতামতকে অগ্রাহ্য করছি না। বিশেষত, এই সময়ে, যখন রাজনৈতিক আঁধিতে সাহিত্যসম্বন্ধে প্রায় সকলেরই দৃষ্টি আবিল, তখন রবীন্দ্রনাথের এই চটি বইটি সংশোধকের কাজ

করতে পারে। তিনি এখানে যা বলেছেন তা সংক্ষেপে এই: সাহিত্যের ইতিহাসে যুগে-যুগে মানুষের রুচির পরিবর্তন দেখা যায়। তাই ব'লে মানুষ পাগল নয়, খামকা এক সময়ে একটা জিনিসকে ভালো ব'লে পঞ্চাশ বছর পরে আবার আর-একটাকে ভালো বলে না।. মানুষ যা-কিছুকে স্বীকার করে, গ্রহণ করে, সেই সমস্ত সাহিত্যশিল্পকলায় বাইরের রূপকল্পে যতই প্রভেদ থাক, সুগভীর আন্তরিক 'মিল আছে। সেটা এই যে তাদের সকলকেই মানুষ সুন্দর ব'লে চিনেছে। সুন্দর কাকে বলে তাও তিনি বুঝিয়ে বলেছেন। ব্যবহারিক জীবনে যাকে আমরা সুন্দর বলি সাহিত্যে সে সুন্দর না-ও হ'তে পারে; মেয়ের বিয়ে দিতে হ'লে যে-পাত্রকে ভালো বলবো, সাহিত্যে সে হয়তো অপাংক্তেয়। কন্দর্প সুন্দর নয়, সুন্দর ফলস্টাফ; যুধিষ্ঠিরের চাইতে অনেক বেশি চরিত্রবান হনুমান। মানুষ এদের সুন্দর ব'লে চেনে কেমন করে? এরা বাস্তব ব'লেই। এরা বিশ্বাস জন্মায়, এদের গ্রহণ করতে কোনো দ্বিধা হয় না, তাই এরা সুন্দর। যুধিষ্ঠিরকে মনে হয় বানানো, হনুমানকে মনে হয় সত্যি। শেষ বিচারে তাই দেখা যায় যে সুন্দর ও বাস্তব একই জিনিস, Truth is Beauty।

জানি, আজকাল এমন অনেকে আছেন 'সুন্দর' কথাটা শুনলেই যাঁরা যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। কিন্তু ভেবে দেখলে বোঝা যাবে যে রিয়্যালিজ্‌ম্ বলতে সত্যি যা বোঝায় রবীন্দ্রনাথ তারই সমর্থক। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ও সাহিত্যের ইতিহাসের উপর রবীন্দ্রনাথের সূত্র প্রয়োগ ক'রে দেখলেই তার যাথার্থ্য প্রমাণ হবে। আজকাল যাঁরা সাহিত্যকে নিছক ইতিহাসের দিক থেকে বিচার করতে চাচ্ছেন, এমনভাবে কথা বলছেন যেন লেখকরা ইতিহাসের ক্রীড়নক মাত্র তাঁদের বাড়াবাড়িতে বিরক্ত হয়েই তিনি 'সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা' লিখেছিলেন, সেই বিরক্তির ছাপ লেখায় ধরা পড়েছে। মূল প্রবন্ধের গোড়ায় ও শেষে যে-ক'টি বাক্য বিশ্বভারতী ছেঁটে দিয়েছেন, 'কবিতা'র পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধার করলে এটা স্পষ্টই বোঝা যাবে: '...কাল তোমার সঙ্গে যখন সত্যি ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করছিলুম তখন আমি মনে মনে বরাবর জানছিলুম যে অত্যুক্তি করছি। এ রকম জেনে শুনে অত্যুক্তি করার কারণ এই যে, ভিতরে কোনো এক জায়গায় বিরক্তি সঞ্চিত হ'য়ে আছে।...তোমাদের ইতিহাসের শিক্ষা নিয়ে তোমরা যদি বাড়াবাড়ি কর তাহলে আমিও কোমর বেঁধে লাগব বাড়াবাড়ি করতে।' সাহিত্যসৃষ্টির মূলে যে আছে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য, এ-কথা রবীন্দ্রনাথের এই

প্রবন্ধে হয়তো একটু বেশি জোর দিয়ে বলা হয়েছে, কিন্তু এ-কথা ভুললেও চলবে না যে আজকাল যাকে আমরা ঐতিহাসিক দৃষ্টি বলছি সেটা সাহিত্যের ইতিহাস বোঝাবার পক্ষেই কার্যকরী (এবং বর্তমান যুগের পূর্বেও এই দৃষ্টি নিয়ে সাহিত্যের ইতিহাসের আলোচনা হয়েছে), সাহিত্যের রসবিচারে সেটা অবান্তর, শুধু অবান্তর নয়, ক্ষতিকর। অর্থাৎ কোনো লেখা ভালো কি মন্দ তার বিচারে ইতিহাসের শিক্ষা প্রয়োগ করতে গেলে পদে-পদে মারাত্মক ভুল হবার আশঙ্কা। সেখানে সাহিত্যিক আদর্শই বিচারের উপায় প্রতিভার ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যকে সসম্মানে স্বীকার করাই সাহিত্য-সমালোচনার প্রথম সোপান।

এই প্রবন্ধগুলি প'ড়ে বোঝা যায় যে শেষজীবনে রবীন্দ্রনাথের মনে কিছু বিক্ষোভ, কিছু অভিমান, এবং অনেকখানি বিরক্তি জ'মে উঠেছিলো। তার কারণ ছিলো না তা বলবো না। 'আমার আশঙ্কা হয় এক সময়ে গল্পগুচ্ছ বুর্জোয়া লেখকের সংসর্গদোষে অসাহিত্য ব'লে অস্পৃশ্য হবে—' চলতি কালের হাওয়ার উপর তাঁর এ-কটাক্ষ অহেতুক নয় তা আমরা জানি। আরো কিছুদিন বেঁচে থাকলে এ-কথাও তাঁকে শুনতে হ'তো যে সাম্যবাদী সমাজে রবীন্দ্রনাথের লেখার কিছুমাত্র মূল্য থাকবে না! দুঃখের কথা এই যে শিল্পীমাত্রেরই চিত্ত স্পর্শকাতর, এবং যে-সব লোক রাজনীতির পাঠ্যবই থেকে বচন সংগ্রহ ক'রে আজকের দিনে সাহিত্যের ক্ষেত্রে উৎপাত করতে বদ্ধপরিকর তাদের স্পর্ধিত কীচকবৃত্তি রবীন্দ্রনাথও একেবারে উপেক্ষা করতে পারেননি। তবে শেষ পর্যন্ত এ-কথা ভেবেই সান্ত্বনা পাওয়া যায় যে এই সব মতামত, যা আজকের দিনে অত্যন্ত আশঙ্কার কারণ ব'লে বোধ হয়, এই সব তর্ক-বিতর্ক যা উপস্থিত মুহূর্তে অত্যন্তই জরুরিরূপে দেখা দেয়—এ-সমস্তই কালস্রোতে বুদ্বুদের মতো মিশে যাবে, কিন্তু আট লাইনের একটি ভালো কবিতার এমনই শক্তি, যে শতাব্দীর পর শতাব্দীর ওঠা-পড়াও তাকে ধ্বংস করতে পারে না। যে-শক্তিতে রবীন্দ্রনাথ শক্তিমান, তা কালের খেলেনা নয়, 'ইতিহাসের অতীতে সে, মানবের আত্মার কেন্দ্রস্থলে'। সেই শক্তিকে বাতিল ক'রে দেবে কোন ডিক্টেটর!

গদ্য-কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নানা উপলক্ষে বলেছেন ও লিখেছেন, এখানেও দুটি প্রবন্ধ আছে। যাঁরা গদ্যকবিতাতে ছন্দমিলের শাসনকে সহজে ফাঁকি দেবার উপায় মাত্র মনে করেন, এই লেখা দুটি তাঁদের চক্ষুরুন্মীলক

হ'তে পারে। রবীন্দ্রনাথ নিজে যে-সব গদ্যকবিতা লিখেছেন তার পিছনে গভীর চিন্তার একটা পটভূমিকা ছিলো সে-কথা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কথাও কবিতায় স্থান পাবে—এই সংকল্পই রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার ভিত্তি। এইজন্য তাঁর গদ্যকবিতা বেশির ভাগই গল্পজাতীয় কি চিত্রধর্মী। কবিতার ক্ষেত্রের সম্প্রসারণেই গদ্যকবিতার সার্থকতা। কোনো-কোনো বিষয় আছে যা ছন্দে বলাই যায় না, তাই গদ্যকবিতার দরকার। এখানে অবশ্য বলবার আছে যে 'পরিশেষে'র গল্প-কবিতাগুলি ছন্দেও বটে, অথচ গদ্যকবিতার সব গুণই তাতে আছে। পদ্যকে গদ্য রেখে তাকে দিয়েই গদ্যের কাজ করিয়ে নেয়া যে সম্ভব তাও তো রবীন্দ্রনাথই দেখিয়েছেন।

একটি আপত্তি জানিয়ে এ-আলোচনা শেষ করি। এ-বইয়ের প্রথম প্রবন্ধ 'সাহিত্যের স্বরূপে'র শেষ বাক্যটিতে একটা কথা পেলাম 'যুগবর্তী'। আমার দৃঢ় বিশ্বাস কথাটা যুগবতী, যুগবর্তী নয়। এই প্রবন্ধ প্রথমে 'কবিতা'র একটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, এবং শেষ বাক্য দুটি কবি নিজের হাতে প্রুফে বসিয়ে দেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে তাঁর হাতের লেখায় যুগবতী পেয়েছিলাম, 'কবিতা'য় যুগবতী ছাপা হয়েছিল, এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে কোনো ছাপার ভুল হয়েছে ব'লে আমাদের জানাননি। (সামান্য কোনো ছাপার ভুল হ'লেও তৎক্ষণাৎ সেটা উল্লেখ ক'রে চিঠি লেখা তাঁর অভ্যেস ছিলো।) দুঃখের বিষয় তাঁর হস্তাক্ষর-অঙ্কিত সেই প্রুফের কপিটি আমি হারিয়ে ফেলেছি—অবশ্য থাকলেও সেটা হয়তো চরম প্রমাণ ব'লে গৃহীত হ'তো না; হাতের লেখা পড়তে আমার ভুল হয়েছে, কিংবা তিনিই ভ্রমক্রমে যুগবর্তীকে যুগবতী লিখেছেন এ-রকম তর্ক উঠতে পারতো। কিন্তু কথাটা যে যুগবতী-ই, তার আভ্যন্তরীণ প্রমাণ যথেষ্ট আছে ব'লে আমি মনে করি:

> গোরুটাও হাড়-বের-করা, শিংভাঙা, কাকের-ঠোকর-খাওয়া ক্ষতপৃষ্ঠ, গাড়োয়ানের মোচড় খেয়ে খেয়ে গ্রন্থিশিথিল ল্যাজওয়ালা হওয়া চাই। লেখকের অনবধানে এ যদি সুস্থ সুন্দর হয় তাহলে মিড-ভিক্টোরীয় যুগবতী অপবাদে লাঞ্ছিত হয়ে আধুনিক সাহিত্যক্ষেত্রে তাড়া খেয়ে মরতে হবে সমালোচকের কশাইখানায়।

মিড-ভিক্টোরীয় যুগবতী মানে mid-Victorian, গোরুর বিশেষণ ব'লে স্ত্রীলিঙ্গ, এ তো দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট। বিশেষণের এই স্ত্রীরূপ ব্যবহারে পরিহাস ফুটেছে—সমস্ত কথাটাই তো হালকা ঠাট্টার চালে বলা,

এবং যুগবতী কথাটা এখানে কী চমৎকার মানিয়েছে তাও কি বুঝিয়ে বলতে হবে? সত্যি বলতে, মিড-ভিক্টোরীয় যুগবতী কথাটাই সমগ্র বাক্যকে প্রাণ দিয়েছে, রস দিয়েছে। যুগবর্তী হ'লে সে-রসটাই মারা যায়, ঠাট্টার বদলে ইস্কুলমাষ্টারি গাম্ভীর্য এসে পড়ে। অনেকে হয়তো জোর ক'রে তর্ক করবেন যে যুগবর্তী ব্যাকরণসঙ্গত, কিন্তু যুগবতী ব্যাকরণসঙ্গত নয় সেটা প্রমাণ করা দুঃসাধ্য, তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের লেখা বিচার করবার ব্যাকরণ কোনো উপায়ই নয়। তিনি তো সেই শ্রেণীর লেখক ছিলেন না যাঁরা অতি কষ্টে ব্যাকরণ বাঁচিয়ে চ'লে পণ্ডিতসমাজে প্রশংসা অর্জন করেন, আমরা সকলেই জানি যে তাঁর রচনার লক্ষ্য মুগ্ধবোধ নয়, মুগ্ধহৃদয়। যে-সরসতার দ্বারা আমাদের লক্ষ-লক্ষ হৃদয় তিনি মুগ্ধ ক'রে রেখেছেন সেইটেই কি আমরা প্রধান ক'রে দেখবো না? সরসতার কাছে ব্যাকরণকে যদি পথ ছাড়তে হয়, তবে সসম্ভ্রমে দৌড় দেবে ব্যাকরণ। ব্যাকরণের দোহাই পেড়ে তাঁর সরস কথা কেটে আমরা নীরস কথা বসাবো এও কি সম্ভব?

বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ এই তাঁরা যেন এ-বিষয়টি খুব ভালো ক'রে ভেবে দেখেন। আশা করি বইয়ের পরবর্তী সংস্করণে কথাটিকে যুগবতী দেখতে পাবো।

মংপুতে রবীন্দ্রনাথ। মৈত্রেয়ী দেবী। ডি, এম, লাইব্রেরি, ৩॥০।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এ-পর্যন্ত যে-ক'টি ভালো বই বেরিয়েছে, 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' নিঃসন্দেহে তাদের অন্যতম। অবশ্য রানী চন্দ-র 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথে'র মতো এ-বইটিও রবীন্দ্রনাথের মৌখিক আলাপ-আলোচনারই সংগ্রহ। তবে 'আলাপচারী'র চাইতে এটি আকারেও বড়ো, বস্তুতেও অনেক বেশি বিচিত্র ও সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ শেষজীবনে কয়েকবার মংপু শৈলাবাসে মৈত্রেয়ী দেবীর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন; সেই সময়ে কবি যে-সব আলাপ-আলোচনা করেছিলেন, মৈত্রেয়ী দেবী প্রশংসনীয় ধৈর্য ও অধ্যবসায় সহকারে সেগুলি তাঁর ডায়ারিতে নোট ক'রে রাখতেন—তাই থেকে এ-বইয়ের জন্ম। কবির মুখের কথাগুলি একেবারে জীবন্তরূপে পরিবেষণ করা হয়েছে, পড়তে-পড়তে তাঁর কণ্ঠস্বর ও বাচনভঙ্গি শুনতে পাই—এ-গুণটি রানী চন্দ-র বইয়েও লক্ষ্য করেছিলাম।

এ-কথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথের কথোপকথনের বহুমুখী উজ্জলতা এ-বইয়ে যেমন ফুটেছে তেমন অন্য কোনো বইয়েই নয়। ভাষার অপূর্ব শালীনতা;

হাস্যরসের স্বতঃস্ফূর্ত দ্যুতি ; অবিশ্বাস্য ready wit ; কথা নিয়ে এমনভাবে খেলা করা, যাতে চেষ্টার কি শ্রমের চিহ্নমাত্র নেই ; লঘু থেকে গুরুতে, গভীরতা থেকে পরিহাসে মনকে একটুও ঝাঁকানি না-দিয়ে লাইন-বদল করা ; সর্বোপরি, ক্লান্ত না-হ'য়ে ও না-ক'রে বহুক্ষণ ধরে অনর্গল কথা বলার ক্ষমতা—এই সবগুলি লক্ষণই মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর অনুলিপিতে সম্পূর্ণ রক্ষা করতে ও প্রকাশ করতে পেরেছেন, এটা কম কথা নয়। ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে কথক হিসেবে কোলরিজের খ্যাতি আকাশচুম্বী ; শোনা যায় যে-কোনো সময়ে দু'তিন ঘণ্টা ধ'রে অবিশ্রান্ত কথা বলা তাঁর কাছে ছেলেখেলা ছিলো, আর সে-কথা এমনই যে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রাখতো, এবং শোনবার পরেও বহুদিন তার ছাপ মন থেকে মুছে যেতো না। শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথের কথকতাও ঐ স্তরে পৌঁচেছিলো এ-কথা বললে অত্যুক্তি হয় না। কেননা দুটি কারণে ইদানীং তাঁর কথা বলা প্রায় বিশুদ্ধ স্বগতোক্তি হ'য়ে উঠেছিলো। প্রথমত, তাঁর কাছে এসে স্বাধীনভাবে কথা বলা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হ'তো না (যদিও মৈত্রেয়ী দেবীর বই প'ড়েই জানা যায় যে এমন লোকও ছিলো যারা তাঁর কাছে এসে অজস্র বাজে বকতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হতো না) ; দ্বিতীয়ত, তাঁর শ্রবণশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছিলো ব'লে আগন্তুকদের তিনি কথা বলবার সুযোগই কম দিতেন, নিজেই সবটুকু সময় কথা দিয়ে ভ'রে রাখতেন। তাই তাঁর শেষজীবনের কথা কোলরিজের কথার মতোই শ্রোতাদের উপলক্ষ্য ক'রে আপন মনে বলা, সেইরকমই দীর্ঘস্থায়ী—এবং তার বৈচিত্র্য ও মাধুর্য যে কতখানি তা আমাদের প্রত্যক্ষভাবেই জানবার সৌভাগ্য হয়েছে। আন্তরিক সম্পদে অত্যন্ত ধনী হ'লেই এ-রকম কথা-বলা সম্ভব। সাধারণত আমরা দেখতে পাই যে অনেকে একসঙ্গে বসলে তবেই আড্ডা জমে, কথোপকথনে সবাই কিছু-কিছু চাঁদা দিলে তবেই আমাদের আনন্দের ভাণ্ডার ভ'রে ওঠে। কথোপকথন জিনিসটা স্বভাবতই অস্থির, মুখ থেকে মুখে অবিশ্রান্ত ঘোরাফেরা না-করলে তার মধ্যে সেই রস জ'মে ওঠে না যার ফলে তা সকলেরই পক্ষে উপভোগ্য হয়। খুব জমাট আড্ডার মধ্যেও কোনো একজন লোক নিজে কিছু বলবার সুযোগ যদি না পায়, তার পক্ষে সে-আড্ডা নীরস হ'য়ে ওঠে ; দুজনের কথাবার্তা বেশিক্ষণ চালানো শক্ত হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একাই একশো ; তাঁর দীর্ঘ 'সুসম্পূর্ণ জীবন তাঁকে কথা বলার কোনো-না-কোনো বিষয় সব সময়েই জুগিয়ে যেতো, আর ভাষার উপর তাঁর তো রাজকীয়

কর্তৃত্ব। তাই আগন্তুকরা শুধু তাঁর কথা শুনেই সম্মোহিত হ'তো, নিজেরা বিশেষ কিছু বলছেন না ব'লে কোনো অভাববোধের স্থানই ছিলো না।

কথকতায় রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় এ-বইতে রইলো। আমরা খুশি হয়েছি, উত্তর পুরুষ কৃতজ্ঞ হবে। নানা বিষয়ে কথা আছে, কোনো-কোনো অংশ জীবনী-উপাদানের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য, কোনো-কোনো অংশ গভীরভাবে মর্মস্পর্শী। কবি যেখানে তাঁর পুত্র-কন্যাদের মৃত্যুর কথা বলছেন, তার তুল্য কোনোখানে কিছু পড়িনি। আর সব জড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর ব্যক্তিত্বের যে-ছবিটি পাই তার প্রতি শ্রদ্ধায় আবার নতুন ক'রে আমাদের মাথা নত হয়। মৈত্রেয়ী দেবীর লেখনীচালনা সার্থক হয়েছে।

বইটি সম্বন্ধে আমার একটিমাত্র অভিযোগ আছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উদ্দেশে 'রবীন-ধুত্তোর কাব্য' ইত্যাদি কবি-মুখের বিদ্রূপ লেখক লিপিবদ্ধ করেছেন। কথাটা হয়তো শ্রুতিকটু, কিন্তু বলতেই হয় যে এতে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বকে ঈষৎ ছোটো করা হয়েছে। অনেক কথা আছে যা অলস মুহূর্তে ঘরোয়া কথাবার্তায় বেশ মানিয়ে যায়, কিন্তু প্রকাশ করতে গেলে বিসদৃশ হ'য়ে পড়ে। এগুলো ছাপার অক্ষরে টেনে আনার দরকার ছিলো না। এটা আমি আধুনিক লেখকদের মান বাঁচাবার জন্যে বলছি না (তাঁদের মধ্যে মাননীয় কিছু থাকলে সেটা কিছুতেই চাপা থাকবে না), রবীন্দ্রনাথেরই চারিত্ররূপের সত্যতার দিক থেকে বলছি। তাঁকে আমরা যে-ভাবে দেখেছি, যে-ভাবে তাঁকে আমরা ভাবতে অভ্যস্ত, এই ব্যঙ্গোক্তিগুলি আমাদের সেই ধারণাকে আঘাত করে, তাঁর মহত্ত্বকে খর্ব করে। একটা ঘটনা এ-বইয়ে উল্লিখিত হয়েছে। কোনো একজন 'নাম-চেনা আধুনিক কবি'র লেখা বিষয়ে কবি বলছেন : 'আমি তো প্রায় মিনিট দশেক ধরে চেষ্টা করলুম, প্রত্যেকটা লাইনের অর্থ একরকম ক'রে হয়, কিন্তু তার সঙ্গে অন্য লাইনের যে কি যোগ তা কবি জানেন কিংবা তাঁরও অন্তর্যামী। তুমি যদি বলতে পার, আমার স' পাঁচ আনা সমেত কলমের বাক্সটা নিশ্চয় তোমায় দিয়ে ফেলব।'

লেখক বলছেন, 'দেখুন আপনি নিজে একদিন এর লেখার কি প্রশংসাই করেছিলেন, এখন এইরকম বলছেন ?'

কবি। 'কি করব—বল্লে ভালো, আমি ভাবলুম, নিশ্চয় ভালো।'

তাহ'লে কি রবীন্দ্রনাথ নিকটবিহারীদের কথা অনুসারে আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর মতামত দিতেন ? যে যখন কাছে থাকতো তার মতেই মত দিতেন ? রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এইরকম একটি ধারণা মুহূর্তের জন্যও সাধারণের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ে মৈত্রেয়ী দেবী গুরুদেবের প্রতি অবিচার করেছেন এ-কথা আমাকে বলতেই হ'লো। কোনো জিনিস নিয়ে শুধুই ব্যঙ্গ করা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিলো; আধুনিক সাহিত্য নিয়েও তা করেননি। মংপুতে ব'সে কি কেবলই রবীন-ধুত্তোর কাব্যের মতো তাঁর অযোগ্য ব্যঙ্গ-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, আর কিছুই বলেননি ?

রবীন্দ্রনাথ যা-কিছু বলেছিলেন, লেখক হয়তো তার সবই নোট করেননি, এবং যা নোট করেছিলেন তারও সবটাই হয়তো এ-বইয়ের অন্তর্গত করেননি। উপাদানের নির্বাচনে লেখকের পক্ষপাতিত্বই ধরা পড়ে। এ-বইয়ে আধুনিক লেখকদের উদ্দেশে কেবল ঠাট্টাই কেন আছে, তার কারণও আবিষ্কার করা শক্ত নয়। বইটি আদ্যোপান্ত পড়লে বোঝা যায় যে আধুনিক লেখকের প্রতি মৈত্রেয়ী দেবীর নিজের প্রবল প্রতিকূলতা। বইয়ের শেষের দিকে মৈত্রেয়ী দেবী বলছেন : 'সত্যিই আমি ভেবে পাইনে, [রবীন্দ্র] প্রভাবমুক্ত হবার জন্য এরকম আপ্রাণ চেষ্টার দরকার কি ? সহজে যদি কারও লেখা অন্যরকম হয়ে ওঠে, সে যদি সুশ্রাব্য হয়, ভালই তো। কিন্তু তার জন্য এত চেষ্টা, এত বাড়াবাড়ি রকম হৈ হৈ···কি দরকার ? ভালো জিনিসের প্রভাবে ক্ষতি কি ? মন্দের প্রভাব থেকে বাঁচাবার সে একটা কবচও তো বটে।' কিন্তু কেন যে রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত হবার জন্য এত বাড়াবাড়ি রকম হৈ হৈ দরকার, এ-প্রশ্নের উত্তর মৈত্রেয়ী দেবীই নিজের অজান্তে দিয়েছেন। রবীন্দ্র-প্রভাব থেকে মুক্ত হবার কিছুমাত্র চেষ্টা না-করলে তার ফল কী-রকম দাঁড়ায় এই বইয়েরই ৬৩-৬৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত কবিতাটি তারই নমুনা। যে-কবিতা রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে প্রায় চেনাই যায় না, অথচ যা রবীন্দ্রনাথের লেখা নয়, সে-কবিতা লিখলেই বা কী, না-লিখলেই বা কী ?

যা-ই হোক, 'রবীন-ধুত্তোর' সাহিত্যের বিষয়ে জানবার জন্য এ-বই কেউ পড়বেন না, কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্য ও জীবনীর অনুশীলন যাঁরা করবেন এ-বই তাঁদের নানাভাবে সাহায্য করবে। কবির অনেক রচনার ইতিহাস এখানে পাওয়া যাবে ; সাহিত্য, সমাজ, স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ, নীতিতত্ত্ব ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁর সব-চেয়ে পরিণত মতামত এখানে একত্রিত ; একটি কবিতা

কী-ভাবে তাঁর প্রথমে মনে আসতো, এবং কী-ভাবে বার-বার অদল-বদল হ'তে-হ'তে তার শেষ রূপটি গ'ড়ে উঠতো, যার সঙ্গে প্রথম খসড়ার প্রায় কোনো মিলই থাকতো না, কবি ও সমালোচকের পক্ষে অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ এই ইতিহাস এখানে বিবৃত। তাছাড়া, কবির জীবনী সংক্রান্ত অনেক ঘটনা বিক্ষিপ্ত আছে, কোনোটি কৌতুকাবহ, কোনোটি গভীর ব্যঞ্জনাময়। ২৫৬ পৃষ্ঠায় একটি ভুল পেলুম।

তিনু গোয়ালার গলি
লোহার গরাদ দেওয়া একতলা ঘর
পথের ধারেই—

এই কবিতাটি গদ্যকবিতা, এবং এটি 'পুনশ্চ' গ্রন্থে আছে, এই মর্মে রবীন্দ্রনাথের মুখে উক্তি আছে। কিন্তু এটি গদ্যকবিতা নয়, পয়ারছন্দে লেখা, এটি 'পুনশ্চে' নেই, আছে 'পরিশেষে', গোয়ালার নাম কিনু, তিনু নয়।* জানি না এ ভুল রবীন্দ্রনাথের না মৈত্রেয়ী দেবীর। নিজের লেখার নাম-ঠিকানা কবি অনেক সময়ই হারিয়ে ফেলতেন, অসতর্ক মুহূর্তে এ-রকম বলা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিলো না, কিন্তু এই ভুলকে ছাপার অক্ষরে ভুলই রাখা কি সঙ্গত হয়েছে ? তাছাড়া, মৈত্রেয়ী দেবীর নিজের উক্তির মধ্যে 'জীবনের জীবনীপ্রবাহ' 'আনন্দে আনন্দিত' 'স্বাভাবিক স্বভাব' এ-ধরনের ভাষা পীড়াদায়ক ; 'পুনরাভিনয়', 'সত্ত্বা' 'তত্ব' 'বধু' 'দায়ীত্ব', 'জগৎব্যাপি' ইত্যাদি বানানভুলগুলিতেও সৌষ্ঠবের হানি হয়েছে। ১৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের কবিতায় 'নিজ অর্থ না জানে' পংক্তিটি ছন্দ-ছুট, অনুলিপিতে বা মুদ্রণে ভুল হয়েছে বলে মনে হয়। ১৬৫ পৃষ্ঠায় তৃতীয় পর্বের গোড়ায় ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ এই তারিখের তলায় লেখা আছে, '··· গুরুদেব ১০ই সেপ্টেম্বর মংপু পৌঁছবেন।' কথাটার মানে ঠিক বোঝা গেলো না, ছাপার ভুল নিশ্চয়ই ?

বুদ্ধদেব বসু

---

* রবীন্দ্র-রচনাবলীর পঞ্চদশ খণ্ড প'ড়ে জানলাম যে এই কবিতাটি 'পরিশেষ' থেকে 'পুনশ্চ'র দ্বিতীয় সংস্করণে বদলি হয়েছে।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত, শান্তিদেব ঘোষ। বিশ্বভারতী, দেড় টাকা।

রবীন্দ্রনাথের আগে বাংলা গান বলতে আমরা কীর্ত্তন, ভাটিয়ালি, বাউল বা রামপ্রসাদী এই রকম এক-একটা বিশেষ স্থরের বিশেষ শ্রেণীর গানকেই বুঝতুম। কেবলি বাংলাদেশের 'বাংলা গান' নামে কোনো গান ছিল বলে জানি না। বোধ হয় প্রথম রবীন্দ্রনাথই আনলেন আমাদের সেই মুক্তি। অবিশ্যি এদিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলালও আমাদের স্মরণীয়। পরবর্তী সঙ্গীত-রচয়িতাদের মধ্যে নজরুল ইসলামেরও একটি বিশিষ্ট আসন আছে।

কিন্তু বৈচিত্র্যে এবং অজস্রতায় রবীন্দ্রনাথ এতই উপরে যে আর কারো সঙ্গেই তাঁকে এক পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। এবং তাঁরই জন্যে আজকের দিনে বাংলা গান আর অবহেলার যোগ্য নেই। নিতান্ত উন্নাসিক গায়কেরাও আজ রবীন্দ্রনাথের গানকে এক অভিনব সৃষ্টি বলে স্বীকার করেন।

সকলেই বলেন যে বাংলা গান স্বভাবতই বাণীপ্রধান, এবং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাণীসিদ্ধ পুরুষ। তাঁর গানের অতুলনীয়তা সেখানেই। আমাদের সুখ দুঃখের বাহনই আমাদের ভাষা। অনেক সময় দেখেছি—একখানা হিন্দি গান গেয়ে যেখানে কাউকেই সুখী করতে পারিনি সেখানে ঠিক সেই স্থরেই যেমন-তেমন কয়েকটি বাংলা কথা বানিয়ে দিলেই শ্রোতারা বাহবা দিয়ে উঠেছেন। কাজেই বাংলা দেশে সঙ্গীতরচয়িতা রূপে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ক্ষুধিতের মুখে অন্নের মত। তিনি যেন আমাদের মর্ম্মস্থানে এসে আঘাত দিলেন। এত প্রাচুর্য্য যেন আমরা বিশ্বাস ক'রে উঠ্‌তে পারলুম না। বোধ হয় খানিকটা সেই কারণেই প্রথম প্রথম তাঁর গান আমরা ঠিক গ্রহণ ক'রে উঠতে পারিনি। এমন অনেক গাছ আছে যতই জল ঢালো আর মাটিতে যতই সার দাও রস শোষণের ক্ষমতাই তার থাকে না। অথচ একটা পোড়ো মাঠের মধ্যে যেখানে জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই সেখানেও একটি গাছ হয়তো ফলে ফুলে ভরে ওঠে। কোনো-কোনো প্রাণশক্তির রস গ্রহণের ক্ষমতাই অত্যন্ত প্রবল থাকে। রবীন্দ্রনাথের পরিবারে গান-বাজনার বিশেষ প্রচলন ছিল ব'লে তিনি তাঁর সৃষ্টির মুখে অনুকূল হাওয়া পেয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু আসল কথাটা এই যে রবীন্দ্রনাথের ছিলো সেই বিরল প্রাণশক্তি, আবহাওয়া থেকে রস শুষে নেবার ক্ষমতা যার অসীম।

ভারতীয় সংগীতের যাঁরা আদি স্রষ্টা তাঁদের নাম আমরা জানিনা, কেননা সে সময়ের কোনো ইতিহাস নেই। পল্লবিত হয়ে নানা গল্প নানা লোকের মুখে মুখেই রচিত হয়েছে, আর সে-সব শুনেই আমাদের কৌতূহলকে তৃপ্ত

করতে হয়। আর তারপরে কত শত বছর ধরে আমরা সেই গানই গেয়ে এসেছি—তার মধ্যেই হয়তো কোনো প্রতিভাবান গায়ক কিছুটা রকমফের করেছেন, সেই গান গেয়েই অনেক সুধাকণ্ঠ আমাদের মুগ্ধ করেছেন কিন্তু নতুন কোনো আস্বাদ তাঁরা সৃষ্টি করতে পারেন নি। সেই হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ভারতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতরচয়িতা বলে গণ্য।

শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষের 'রবীন্দ্র সংগীত' বইখানি পড়ে খুবই আনন্দ হলো। এ রকম একখানা বইয়ের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল।

এর আগে রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে এতখানি বিশদ আলোচনা বোধ হয় আর কেউ করেননি। শান্তিদেববাবু অনেকদিন ধ'রে রবীন্দ্র-সংগীতের সাধনা করছেন, তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সংশ্রব ছিলো, তাই বইখানা ভাবের দিক্ থেকে উজ্জ্বল ও তথ্যের দিক্ থেকে মূল্যবান হয়েছে। লেখক কোনোরকম পারিভাষিক জটিলতার মধ্যে পাঠককে টেনে নিয়ে যাননি, সহজ ভাষায় সকলের জন্য লিখেছেন, রবীন্দ্রসংগীতের বৈশিষ্ট্যের প্রধান সূত্রগুলি ধরিয়ে দেয়াই তাঁর চেষ্টা। কোন গান কী উপলক্ষ্যে বা কোন ঘটনার প্রতিঘাতে লিখিত এ-খবরগুলো আমাদের পক্ষে অত্যন্তই ঔৎসুক্যের বিষয় ছিল, এ বইটি পেয়ে অনেকখানি তৃপ্তিলাভ হল সন্দেহ নেই।

প্রাচীন রাগসংগীতের সঙ্গে রবীন্দ্র-সংগীতের সম্বন্ধ; তাঁর স্থরে বৈদেশিক প্রভাব, তালের দিকে তাঁর অভিনবত্ব, গীতিনাট্যে তাঁর অতুলনীয়তা—এই সমস্ত বিষয়েই শান্তিদেববাবু আলোচনা করেছেন। কাব্যের ও স্থরের দিক থেকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত নিয়ে আরো বই আমাদের ভাষায় নিশ্চয়ই লেখা হবে, বিষয়টি এত ব্যাপক যে এ নিয়ে আরো অনেক কথাই বলবার আছে, কিন্তু এ-বিষয়ে প্রথম বই, এবং প্রথম ভালো বই হিসেবে 'রবীন্দ্র সংগীত' উল্লেখযোগ্য হয়ে রইলো।

দু' একটা জায়গায় আমাদের একটু খট্‌কা লেগেছে, তার উল্লেখ করি। শান্তিদেববাবু একজাগায় লিখেছেন 'জনসাধারণের কাছে রবীন্দ্রনাথের অল্পবয়সের গানগুলোই বেশী ভাল লাগে।' কথাটা কি ঠিক্? তাঁর অতি তরুণ বয়সের 'মায়ার খেলা' অবশ্য আশ্চর্য্য রচনা, স্থর ও কথা দু' দিক থেকেই—কিন্তু তার পরের পর্য্যায়ে ব্রহ্ম সংগীতের যা স্থর তাতে কোনো রাবীন্দ্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল না। গতানুগতিকতার গণ্ডি অতিক্রম করবার পরেই রবীন্দ্রনাথের গান 'রবীন্দ্রসংগীত' হয়ে জাত নিল এবং

সে-সব গানের বেশীর ভাগই তাঁর পরবর্ত্তী জীবনের রচনা। যাকে বলা যেতে পারে বিশুদ্ধ 'রবীন্দ্রসংগীত', তাতে কথা ও সুরের একটা অঙ্গাঙ্গী যোগ রয়েছে, সেই মিলনেই সে-গানের চরম সার্থকতা।

তা ছাড়া একথাও বোধ হয় ঠিক নয় যে তাঁর প্রথম জীবনের কবিতা রচনায় যুক্তাক্ষর ব্যবহারের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর প্রথম জীবনের কবিতায় যে যুক্তাক্ষর কম তার কারণ যুক্তাক্ষরের রহস্য তিনি তখনো আবিষ্কার করতে পারেন নি, পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙালি কবিরা যুক্তাক্ষরের ব্যবহার জানতেন না। বাংলা ছন্দের মাধুর্য্য যে যুক্তাক্ষরের উপরেই নির্ভর করে, এ-আবিষ্কার রবীন্দ্রনাথেরই, এবং গানে যে যুক্তাক্ষর অপাংক্তেয় আমাদের এই বহুকালের কুসংস্কার থেকে রবীন্দ্রসংগীত আমাদের মুক্তি দিয়েছে। অবিশ্যি শান্তিদেববাবুও রবীন্দ্রনাথের যুক্তাক্ষরবহুল গানের উল্লেখ করেছেন; জীবনের কোনো সময়েই রবীন্দ্রনাথ কবিতায় যুক্তাক্ষর ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন না, এ কথা বললে ঠিক কথাটি বলা হয় না এটুকু বলাই আমার উদ্দেশ্য।

বইটি দেখতেও সুন্দর। প্রচ্ছদ-পটটি শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর আঁকা। তবে ছাপার ভুল অজস্র, বিশ্বভারতীর প্রকাশিত কোনো বইতে এত ছাপার ভুল দেখিনি। এই ভুলগুলোর যাতে শোধন হয় সেইজন্যেও বইটির তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় সংস্করণ হওয়া উচিত।

প্রতিভা বসু

বাংলার কাব্য, হুমায়ুন কবির। গুপ্ত রহমান এ্যাণ্ড্ গুপ্ত, ১০২ পৃ

প্রথমেই বলে নিই, কবির সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত, এবং তিনি সামাজিক-মানসের প্রকাশ হিসাবে বাঙ্‌লা কাব্যের ইতিহাস আলোচনার যে চেষ্টা এই গ্রন্থে করেছেন তার সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ স্বীকৃতি ও সহানুভূতি আছে। বস্তুত, এই দৃষ্টিভঙ্গির দিক্ থেকে না দেখ্‌লে কাব্য বা সাহিত্যের ইতিহাস তার সকল রহস্য উন্মুক্ত করে না বলেই আমার বিশ্বাস। অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে অতি সংহত ভাষা ও ভাবগভীরতায় কবির সাহেব সমগ্র বাঙ্‌লা কাব্যের সামাজিক রহস্য উদ্‌ঘাটিত করতে চেষ্টা করেছেন, এবং বহুলাংশে কৃতকার্যও হ'য়েছেন। সমগ্র বাঙ্‌লা কাব্যের এই ধরণের আলোচনা ইতিপূর্বে বড় একটা হয়নি বল্‌লেও চলে। "চতুরঙ্গে" যখন এই

বই'র অধ্যায়গুলো প্রকাশিত হ'চ্ছিল, প্রায় তখনই বোধ হয় শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল সেনগুপ্ত তাঁর "বাঙ্‌লা সাহিত্যের ভূমিকা"য় কতকটা এই জাতীয় প্রয়াস করেছিলেন। বাঙলা কাব্য ও বাঙালী সমাজের সম্বন্ধ নির্ণয়ে এই প্রয়াসগুলি উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য সমালোচনায় এই দৃষ্টিভঙ্গি বাঙলাদেশেও একেবারে কিছু নূতন নয়। বহুদিন আগে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মশায় তাঁর "New Essays in Criticism" গ্রন্থে এর গোড়াপত্তন করেছিলেন; স্বদেশী যুগে Dawn Society-র সাহিত্য দৃষ্টির পেছনে এই ধরণের চিন্তা ছিল, এবং রবীন্দ্রনাথও তার প্রভাব এড়াতে পারেননি'। পরেও অন্তত দু'একজন লেখক এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বাঙ্‌লা সাহিত্যকে দেখ্‌তে ও বুঝতে চেষ্টা করেছেন। কবির সাহেব্ আর একটু পথ পরিষ্কার করে দিলেন, এইজন্য বাঙালী পাঠক তাঁকে নিঃসন্দেহে সাধুবাদ জানাবে। এ-গ্রন্থ উৎসুক চিন্তাশীল পাঠকের মনকে নানাদিক থেকে আলোড়িত করবে, অনেকে অনেক চিন্তার খোরাক এর ভেতর পাবেন, একথাও নিঃসন্দেহে বলা চলে। বইটির ছাপা, বাঁধাই ও অলঙ্করণপারিপাট্য চমৎকার, অতি সুরুচিসম্পন্ন, এবং রচনা ছোটখাট ভুল ত্রুটি সত্ত্বেও আগাগোড়া সুখপাঠ্য। শব্দচয়ন ও বাক্‌ভঙ্গির নৈপুণ্যে কবির সাহেবের বক্তব্য সর্বত্রই স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন। বাঙ্‌লা কাব্য, তথা বাঙ্‌লা সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁদের অনুরাগ আছে, দেশের ইতিহাসের পটভূমিকায় যাঁরা দেশের সাহিত্যের রূপ দেখে তার সঙ্গে পরিচয় আরও নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ করতে চান্, তাঁরা সজাগ দৃষ্টি ও মোহমুক্ত মন নিয়ে এই বইটি পাঠ করুন, সমালোচক এই অনুরোধ করতে পারেন।

সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বোধ হয় বলা প্রয়োজন যে কবির সাহেবের ব্যাখ্যার বহুক্ষেত্রে আমি তাঁর সঙ্গে একমত নই। এই মত-বৈপরীত্য কিছু রুচি বা দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধের জন্য নয়। তথ্যের অসম্পূর্ণতা এবং অসম্পূর্ণ তথ্যগত ব্যাখ্যাই এই বিরোধের মূলে। বস্তুত, সাহিত্যব্যাখ্যা ও সমালোচনায় যাঁরা এই দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষপাতী তাঁদের দায়িত্ব অতি গুরুতর। একদিকে সাহিত্যের ইতিহাসের সূক্ষ্মবোধ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান যেমন তাঁদের থাকা দরকার, তেমনই দরকার দেশের ঐতিহ্য ও বৃহত্তর অর্থে সামাজিক ইতিহাসের সূক্ষ্ম বোধ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান। বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে যদি বা কিছু আলোচনা আমাদের আছে, ২।৪ খানা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসও রয়েছে সামাজিক ইতিহাস নিয়ে পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা একেবারেই হয়নি'। সত্যি বল্‌তে কি, আদি ও মধ্যযুগের বাঙ্‌লার ঐতিহ্য

ও সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত অসম্পূর্ণ, দৃষ্টি অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন। যে নিষ্ঠা, ধৈর্য ও বিশ্লেষণবুদ্ধি নিয়ে এই ইতিহাসের মালমসলা সংগ্রহ করতে হয়, যে মোহযুক্ত পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে প্রত্যেকটি ছোট-বড় তথ্যের পশ্চাতে ইতিহাসের ইঙ্গিত প্রত্যক্ষ করতে হয়, এ পর্যন্ত সামাজিক ইতিহাস রচনায় তা' নিয়োজিত হয়নি'। এ-কাজ শ্রমসাপেক্ষ গবেষণার কাজ; অথচ তা' না হ'লে কোনও সাহিত্যের সঙ্গে সমাজ মানসের ক্রিয়া ও যোগাযোগ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা কিছুতেই সম্ভব নয়। খুব প্রশংসনীয় গভীর বোধ ও বুদ্ধির সাহায্যে কবির সাহেব অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষত অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালগত শেষের অধ্যায়গুলিতে, এই সমাজ ইতিহাসের উপর এবং বাঙ্‌লা সাহিত্যের উপর নূতন আলো ফেলেছেন, এ-কথা অনস্বীকার্য; কিন্তু তথ্যের অসম্পূর্ণতার জন্য অনেক ক্ষেত্রে তাঁর ব্যাখ্যা বিপথগামী হ'য়েছে, একথাও মনে না ক'রে পারিনে। কয়েকটা দৃষ্টান্ত আহরণ করলে বোধ হয় আমার বক্তব্য পরিষ্কার হ'বে।

গ্রন্থারম্ভেই পূর্ববাঙলা ও পশ্চিম বাঙ্‌লার কাব্যের মননরীতি ও প্রকাশ-ভঙ্গির পার্থক্যের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে অন্যান্য কারণের মধ্যে ভৌগোলিক পরিবেশের পার্থক্যের ইঙ্গিত কবির সাহেব করেছেন; বলেছেন, 'পশ্চিম বাঙ্‌লার প্রকৃতি বাঙালীর কবিমানসকে যে-রূপ দিয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে লোকাতীত রহস্যের আভাস'। তার প্রধান কারণ, সেখানে জীবন সংগ্রামের মুখরতা অনির্বচনীয়ের আস্বাদন-উন্মুখতায় বিলীন। একথা তিনি বলেছেন নিঃসন্দেহে বৈষ্ণব কাব্যলোক স্মরণে রেখে। পরবর্তী এক অধ্যায়ে বৈষ্ণব কাব্য সম্বন্ধে বল্‌তে গিয়ে এই ভৌগোলিক পরিবেশের উপর তিনি অনেকখানি জোর দিয়েছেন। কিন্তু পশ্চিম বাঙ্‌লায় 'অহোরাত্র জীবনের চঞ্চল লীলা' ত পূর্ববাঙ্‌লার চেয়ে কিছু কম নয়। একাদশ শতকের একটি শিলালিপিতে রাঢ়দেশকে স্থানীয় একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন অজন্মা অনুর্বর বলে; এদেশ, বিশেষভাবে রাঢ়ের উত্তরভূমি সত্যই 'জলহীন ফলহীন আতঙ্কপাণ্ডুর মরুক্ষেত্র'। সেখানেও ত জীবনসংগ্রামের কিছু অভাব নেই; সেখানেও শস্য ফলাতে হ'লে প্রকৃতির সঙ্গে নিষ্ঠুর যুদ্ধ করতে হয় দিবারাত্র; কিছুতেই মানুষ তাকে ভুলে থাকৃতে পারেনা। আর দক্ষিণ রাঢ়, বিশেষভাবে বর্দ্ধমান জেলা ত ব্রিটিশ আমলের গোড়ায়ও পূর্ববাঙ্‌লার মতই ছিল নদীবহুল শস্যশ্যামল। অথচ, সত্যই পশ্চিম বাঙ্‌লার কাব্যে, বিশেষভাবে বৈষ্ণব কাব্যে রয়েছে লোকাতীত রহস্যের আভাস; সেখানে

কবির সাহেব ভুল করেননি'। কিন্তু, আসল কারণটা ভৌগোলিক প্রকৃতির পার্থক্যের মধ্যে নেই; তা' খুঁজতে হ'লে বল্লালোত্তর ও ইস্‌লামোত্তর পূর্ব ও পশ্চিম বাঙ্‌লার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিবর্তনের বিস্তৃত ইতিহাসের মধ্যে যেতে হ'বে। সে-ইতিহাসের মধ্যেই পাওয়া যাবে এই বিশেষ সাহিত্য-প্রকৃতির যথার্থ কারণ। এই কারণটা একান্তই সমাজ-সংগঠন-নির্ভর। পূর্ব ও পশ্চিম বাঙ্‌লার সমাজ-সংস্থান ঐতিহাসিক কারণেই ভিন্নধর্মী; সেই হেতু বৈষ্ণব কাব্যের সৃষ্টি ও প্রভাব পশ্চিম বাঙ্‌লায় যত বেশী, পূর্ববাঙ্‌লায় সেই অনুপাতে অত্যন্ত কম।

ভৌগোলিক পরিবেশের পার্থক্যের পরেই লেখক নরতত্ত্ব ও ধর্মের পরিবেশের পার্থক্যের আলোচনা করেছেন। এখানেও তথ্যের ভুলের দরুণ ব্যাখ্যায় ভুল থেকে গেছে। বাঙ্‌লার আদিমতম অধিবাসী নিগ্রয়েড্ হ'লেও হ'তে পারে: কিন্তু যে-নরগোষ্ঠীর দান বাঙালীর রক্ত, বাঙ্‌লার সভ্যতা ও সংস্কৃতির গোড়ায় তারা অস্ট্রোএসিয়াটিক, বা ভাষতাত্ত্বিকদের বর্ণনায় অস্টিক্; কবির সাহেব তাদের উল্লেখই করেননি। বাঙালী দ্রাবিড়-মোঙ্গোলীয়ের সংমিশ্রণ, এ মত এখন আর স্বীকৃত নয়। বাঙ্‌লার প্রত্যন্ত প্রদেশগুলি ছাড়া আর কোথাও মোঙ্গোলীয় প্রভাব পরিস্ফুট নয়। অথচ মোঙ্গোলীয় রক্তের তথাকথিত অহিংস্রতার মধ্যে কবির সাহেব পূর্ববাঙ্‌লার বৌদ্ধমানসের খানিকটা সূত্র খুঁজতে চেষ্টা করেছেন। প্রথমতঃ, মোঙ্গোলীয় রক্তের অহিংস্রতার কথা নরতত্ত্ব ও ইতিহাসে স্বীকৃত নয়; এ-সম্বন্ধে জোর ক'রে কিছুই বলা যায় না। চেংগীস্ খাঁ, কুবলাই খাঁ এবং আরো অনেক মোঙ্গোলীয় অভিযাত্রীদের হিংস্র অভিযানের কথা, ভারতবর্ষে প্রথম মোঙ্গোল অভিযাত্রীদের কথা এ-প্রসঙ্গে ভুল্‌লে চলবে কেন? দ্বিতীয়তঃ পূর্ববাঙ্‌লার মহাযান-বজ্রযান-তন্ত্রযান বৌদ্ধধর্ম এবং সমসাময়িক ব্রাহ্মণ্যধর্ম, পূজাপার্বণ, আচারানুষ্ঠান, মূর্তিতত্ত্ব, পশুবলি ইত্যাদির দিক্ থেকে এ-দু'য়ে পার্থক্য বিশেষ কিছু ছিল না বল্‌লেই চলে; অন্তত হিংসা বা অহিংসাগত কোনও হেতু পূর্ববাঙলায় বৌদ্ধধর্মের প্রসারের মূলে ছিলনা, একথা জোর করেই বলা চলে। এ-কথা সত্য পূর্ববাঙ্‌লায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব, নাথ ধর্মের প্রভাব পশ্চিম বাঙ্‌লার চেয়ে অনেক গভীর ও ব্যাপক ছিল, যেমন পরবর্তী কালে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব বেশী ছিল পশ্চিম বাঙ্‌লায়। দুইই উচ্চতর শ্রেণী ও বর্ণের ধর্ম ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সন্দেহ নেই, এবং দুয়ের ফলেই বাঙালীর সমাজ মানসের একটা

গভীর পরিবর্তন ঘটেছিল; কিন্তু তার কারণ নিহিত রয়েছে সমসাময়িক রাষ্ট্র ও সমাজবিন্যাসের মধ্যে, এবং তা' বুঝ্‌তে হ'লে বল্লাল-পূর্ব এবং বল্লালোত্তর, সঙ্গে সঙ্গে ইস্‌লামোত্তর রাষ্ট্র ও সমাজ বিন্যাসের বিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজন। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধের যে ইঙ্গিত কবির সাহেব করেছেন, তার মূলে রয়েছে শ্রেণী ও বর্ণগত কারণ; সেন আমলেই তা' সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল।

বৈষ্ণব কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে কবির সাহেব বলেছেন, 'মোসলেম বিজয়ের প্রাথমিক যুগে হিন্দুমানসে বিক্ষোভ এবং বিদ্রোহই ছিল প্রবল; কিন্তু সে বিদ্রোহের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ক্রিয় মনোবৃত্তির প্রসার বেড়ে গেল। এই নিষ্ক্রিয়তা হিন্দুমানসে যে-অবসাদ এনে দিয়েছিল, তারই ফলে মায়াবাদ এবং সন্ন্যাস মনোবৃত্তির ভারতবর্ষে এত প্রাদুর্ভাব।' এই কথাটিকে কবির সাহেব বিস্তৃত করে ব্যাখ্যা করেছেন। সাধারণভাবে কথাটাকে আমি একেবারে অস্বীকার করিনে। কিন্তু মধ্যযুগের বাঙ্‌লা সাহিত্যে কাব্যের পর কাব্যে যখন পড়ি রন্ধনবিদ্যার অপূর্ব পারিপাট্যের সুবিস্তৃত বিবরণ, বিচিত্র ঘর বাড়ী, নৌকা জাহাজ প্রভৃতি নির্মাণ ও ব্যবহারের খুঁটিনাটি বিবৃতি, গুজ্‌রাট্‌ থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপগুলি এবং সুদূর চীন পর্যন্ত সুবিস্তৃত ব্যবসা-বাণিজ্যের বিপুল উদ্যম, অশ্ববিদ্যা, হস্তিবিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রসার, জমিদার ও প্রতাপবানদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের শক্তিপরীক্ষার পুনঃপুনঃ বিবরণ, তখন কি করে বলি জনসাধারণ ছিল অবসাদগ্রস্ত, নিষ্ক্রিয় বা সংসার-বিমুখ? আমার ত মনে হয়, কবির সাহেব এই মায়াবাদ ও সন্ন্যাস মনোবৃত্তি, অবসাদ ও সংসারবিমুখীনতার কথাটা অত্যন্ত সরল করে বলেছেন, এবং অতি বেশী জোর দিয়ে বলেছেন। জীবনের ব্যবহারিক দিকের-তথ্যের দিকে তাকালে এতটা জোর দেওয়া সম্ভব হয়ত হ'তো না। মোস্‌লেম-পূর্ব ভারত সম্বন্ধে ত একথা বলাই চলেনা! আসল কথা, বৈষ্ণব কাব্যে যে নিষ্ক্রিয়তা ও সংসার-বিমুখীনতার সঙ্গে ইস্‌লামের বিপ্লবাত্মক সক্রিয় মনোভাবের অপরূপ সমন্বয় লেখক লক্ষ্য করেছেন, সেই নিষ্ক্রিয়তা ও সংসার-বিমুখীনতা একান্তই একটা বিশেষ শ্রেণীর, এবং শ্রেণীগত কারণেই সেই বিশেষ সংকীর্ণ শ্রেণীর মধ্যে তার প্রসার লাভ ঘটেছিল। অবশ্য, এই কাব্যের আবেগ যখন মুক্তি পেল তখন এই মনোভাবের প্রসার ক্রমশঃ ব্যাপ্তি লাভ করলো, কিন্তু তা' কিছু সংসার-বিমুখীনতার জন্যে নয়।

বৈষ্ণব কাব্যে যে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হ'য়েছে বারবার এবং তার

মূল্য পরিপূর্ণ দেওয়া হ'য়েছে তার মূলে কবির সাহেব ইস্‌লামের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। ইস্‌লামের প্রচণ্ড ও বিপ্লবাত্মক ক্রিয়ার ফল যে মধ্যযুগের বাঙালীর আবেগমুক্তির মূলে রয়েছে একথা অস্বীকার না করেও বলা চলে যে, মানুষের এই পরিপূর্ণ মূল্যদান ভারতীয় এবং মধ্যযুগীয় বাঙ্‌লা সাহিত্যেও কিছু নূতন নয়। 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'—কথাটা চণ্ডীদাসই কিছু প্রথম বলেন নি'। মহাভারতে রয়েছে

গুহ্যং ব্রহ্ম (পাঠভেদ : মন্ত্র) তদিদং ভো ব্রবীমি
ন মানুষাদ্ অন্যচ্ ছ্রেয়োঽস্তি কিঞ্চিৎ ॥

এই ধরণের অনেক উক্তির এই একটি। তা ছাড়া মধ্যযুগীয় বৈষ্ণবোত্তর সাহিত্যেও শাস্ত্র ও পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতের যত প্রভাবই থাকুক না কেন, সেখানে দেবতা তো আর দেবতা নেই, দেবতা তো মানুষ হ'য়েই আমাদের ঘরে বাইরে আনাগোনা করছেন। প্রাকৃত জনের প্রাকৃত সাহিত্যে মানুষের এই পরিপূর্ণ মূল্য বরাবরই স্বীকৃত হয়েছে। হয়নি সংকীর্ণ শ্রেণীগত সংস্কৃত জনের নাগর সাহিত্যে। দুঃখের কথা এই, প্রাকৃতজনের সাহিত্য ধরে রাখবার কেউ ছিলনা।

এই প্রসঙ্গেই কবির সাহেব অন্যত্র বলেছেন, "একথা বল্‌লেও বোধ হয় খুব অন্যায় হয়না যে বৈষ্ণব কবিতা সুবর্ণবণিকের জন্য প্রধানতঃ সুবর্ণবণিকদের রচনা......"। অন্যায় হয় বই কি। একান্তই অনৈতিহাসিক উক্তি! ঐতিহাসিক তথ্যগত ইঙ্গিতের ঐকান্তিক সরলতায় তথ্যই গেছে বিকৃত হ'য়ে। প্রথম শ্রেণীর অন্ততঃ বিশজন বৈষ্ণব কবির মধ্যে একটি সুবর্ণবণিককেও কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবেনা। তা ছাড়া বৈষ্ণব কবিতা সুবর্ণবণিকদের জন্য রচনা, একথাই বা কি করে বলা চলে? পশ্চিম বাঙ্‌লায় সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, পূর্ববাঙ্‌লায় সাহা কৈবর্ত ইত্যাদি ব্যবসায়োপজীবী উচ্চতর ব্রাহ্মণ্য-সম্প্রদায়-বহির্ভূত বর্ণসমূহের ভেতর বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্যের প্রসার লাভ ঘটেছিল বেশী, খুব স্বাভাবিক সামাজিক কারণে, কিন্তু তাই বলে যদি বলা যায় সুবর্ণবণিকদের জন্য বৈষ্ণব কবিতা রচিত হ'য়েছিল তাহ'লে ইতিহাসের উপর একটু বেশী অত্যাচার করা হয়।

পূর্ববাঙ্‌লার মনসামঙ্গলের সঙ্গে একদিকে পশ্চিম বাঙ্‌লার চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল কাব্যে সমাজবোধের পার্থক্য দেখতে গিয়ে কবির সাহেব ঠিকই ধরেছেন যে, পূর্ব বাঙ্‌লার লৌকিক কাহিনী ও লোকগাথাগুলিতে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখ ও সংগ্রাম, এককথায় সমাজবোধ প্রবলতর।

এর মূলে ইস্‌লামের সামাজিক বোধ কার্যকরী, কবির সাহেব এইরূপ মনে করেন। তথ্যের আর একটি দিকের প্রতি তাকালে এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করা বোধ হয় চলে। কি পূর্ব বাঙ্‌লা কি পশ্চিম বাঙ্‌লা সর্বত্রই লোকস্তরে, অর্থাৎ জনসাধারণের পর্যায়ে নিম্নতর সামাজিক শ্রেণীতে এই সচেতন মানবধর্মী সমাজবোধ বরাবরই ছিল, ইস্‌লাম প্রভাবের আগেও ছিল। সাহিত্যে তার প্রমাণ আমাদের সাম্‌নে উপস্থিত 'নেই মাত্র; কারণ এই লোকসাহিত্য বরাবরই ছিল শ্রুতিনির্ভর, লিপিনির্ভর নয়। কিন্তু ভাস্কর-শিল্পে এই প্রমাণ পাওয়া যায় পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলকগুলিতে। বাঙ্‌লার বাইরেও মোস্‌লেম-পূর্বকালের পাথর ও পোড়ামাটির শিল্পে এই প্রমাণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। কাজেই এই বস্তুঘনিষ্ঠ সমাজচেতনা একান্তভাবেই ইস্‌লামের দান একথা জোর করে বলা চলে না। বাঙ্‌লায় মধ্যযুগের লোকস্তরের শিল্পে ও সাহিত্যে এই সমাজচেতনা অতি নিবিড়, পূর্ববাঙ্‌লায় নিবিড়তর, তাও সামাজিক ও শ্রেণীগত কারণে; কিন্তু লোকস্তরের শিল্প ও সাহিত্য উচ্চস্তরের সামাজিক চাপে বহুদিন আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি; শিক্ষিত সমাজের গ্রাহ্য হয়নি'। বস্তুত, 'মধ্যযুগের লৌকিক কাব্য ও গাথাগুলি আধুনিক কালে কেউ লিপিবদ্ধ না করলে আজ পর্যন্তও শিক্ষিত সমাজ হয়ত তার খোঁজই রাখতো না। ইস্‌লামের অন্তর্নিহিত সাম্যবোধের প্রভাব মধ্যযুগে কার্যকরী হয়নি', একথা আমি বলিনে, কারণ সপক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলা কঠিন; কিন্তু ইস্‌লামপূর্ব যুগেও যেখানে এই ঘনিষ্ঠ মানবধর্মী সমাজবোধের পরিচয় লোকস্তরে সমাজ-মানসের প্রকাশের মধ্যে পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে ইস্‌লাম-প্রভাবের উপর খুব জোর দেওয়া চলে কি? আসল কথা, লোকস্তরে ধর্মের প্রভাবের চেয়ে দৈনন্দিন জীবন সংগ্রাম ও সংঘর্ষের প্রভাব অনেক বেশী কার্যকরী, এবং সেখানে হিন্দু-মুসলমানের ভিতর পার্থক্য অন্তত মধ্যযুগে কিছু ছিল না।

একাধিক জায়গায় কবির সাহেব আলাওলের "পদ্মাবতী"র উল্লেখ করেছেন এমন ভাবে যে, মনে হয় তিনি আলাওলকে মৌলিক সৃষ্টির কৃতিত্বদান করেছেন। বস্তুত, আলাওলের "পদ্মাবতী" মালিক মুহম্মদ জয়সীর হিন্দী কাব্য "পদুমাবতে"র প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ মাত্র। মৌলিক সৃষ্টির কৃতিত্ব আলাওলের উপর আরোপ করা চলে না।

বাঙ্‌লা রামায়ণ-মহাভারত সম্বন্ধে কবির সাহেব বলেছেন, "রামায়ণ-মহাভারতের বিপুল প্রসার ও উদার কাহিনীর মধ্যে বাঙ্‌লার মাটির রূপ-

রসগন্ধ দানা বাঁধতে পারেনি, সমগ্র ভারতের ঐতিহ্যের বাহন হিসাবেই তাদের মূল্য।" একথা সত্য যে, বাঙ্‌লা রামায়ণ-মহাভারতের খাতে ভারতীয় ঐতিহ্যস্রোত বাঙ্‌লা দেশে অনেকটা প্রবাহিত হ'য়েছে, কিন্তু তা' হ'য়েছে বলে বাঙ্‌লার মাটির রূপরসগন্ধ তা'তে দানা বাঁধেনি একথা সত্য নয়। কৃত্তিবাস ও কাশীরাম রামায়ণ-মহাভারতের একমাত্র অনুবাদক নন, এবং শ্রীরামপুরের মিশনরীরা যে অনুবাদ প্রচার করেছিলেন তাও এঁদের দুজনের যথার্থ পরিচয় নয়। রামায়ণ মহাভারত অসংখ্য রচিত হয়েছিল মধ্যযুগে; সেগুলিকে অনুবাদ বলাই অন্যায়, এবং বাঙলাদেশে রামায়ণ-মহাভারত কাহিনী সে-যুগে যে-ভাবে প্রচলিত ছিল তা'তে বাঙালীর মানস-বৈশিষ্ট্যের সাক্ষ্য একেবারে উপেক্ষণীয় নয়।

মোস্‌লেম-উত্তর মধ্যযুগে পশ্চিম ও উত্তর ভারতের সঙ্গে বাঙ্‌লা ও গুজরাতের আপেক্ষিক সাহিত্যসমৃদ্ধির তুলনা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন, মুসলমান বিজয়ের পর "যুযুধমান রাজশক্তির পরস্পরের সংঘাতে, বন্যায় তরঙ্গের পরে তরঙ্গের মত নতুন নতুন অভিযাত্রীর আগমনে পশ্চিম ও উত্তর ভারতের তরঙ্গায়িত জীবন প্রবাহে দর্শন বা কাব্যপ্রতিভা বিকাশের অবকাশ কই?" এটা বোধ হয় একটু অন্যায় বলা হ'লো। তুলসীদাস সুরদাস ও অন্যান্য অনেক কবি ও গাথা রচয়িতাদের রাজস্থানী হিন্দী প্রভৃতি সাহিত্য কি উপেক্ষণীয়? তাদের সমৃদ্ধি কিছু কম ছিল কি?

আধুনিক বাঙ্‌লা সাহিত্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে কবির সাহেব বলেছেন, "বঙ্কিমযুগের হিন্দু মানসের স্বপ্ন ছিল প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন। সে-স্বপ্ন কোনোদিন রবীন্দ্রনাথকে টানেনি"। একথা তো পুরোপুরি সত্য নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের সুদীর্ঘ একটি কাল কাটিয়েছিলেন প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির আকর্ষণের মধ্যে, এবং তার ভেতর নবজীবন সঞ্চারের চেষ্টায়। মধ্যযুগীয় মোস্‌লেম সংস্কৃতির স্পর্শ ঠাকুরপরিবার ও রবীন্দ্রনাথের জীবনে লেগেছিল সত্য, কিন্তু তা জীবনের দেউড়ি পাড় হ'য়ে অন্দরমহলে প্রবেশ করতে পারেনি'। ভারতীয় মোস্‌লেম জীবন ও সংস্কৃতি রবীন্দ্রনাথের গভীরতর আবেগকে খুব আলোড়িত করেছে, তার প্রমাণ বিরাট রবীন্দ্র সাহিত্যে নেই বল্‌লেই চলে: একথা স্বীকার না করে উপায় নেই। এর সামাজিক কারণ খুব পরিষ্কার। তবে বুদ্ধি ও বিচারের মধ্যে তার প্রভাব কখনও তিনি অস্বীকার করেন নি'।

কয়েকটি তথ্য ও তাদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমার মতামত একটু সুবিস্তৃত করেই বিবৃত করলুম। কিন্তু ভয় হ'চ্ছে পাঠক মনে না করেন যে, এই ধরণের তথ্য ও ব্যাখ্যা আগাগোড়াই এ-গ্রন্থে রয়েছে। বইটি আদ্যোপান্ত না পড়ে' সে-কথা মনে করলে খুব ভুল করা হ'বে। কারণ বহুক্ষেত্রে, এই স্বল্পপরিসরের মধ্যেও নানা প্রসঙ্গে কবির সাহেব বাঙলা কাব্যের বিভিন্ন অধ্যায়ের অতি সুন্দর যুক্তিসহ অর্থবহ ব্যাখ্যা দান করেছেন, বিশেষ করে আধুনিক সাহিত্যের আলোচনায় যেখানে তিনি সমাজ-মানসের বিবর্তনের ঐতিহাসিক ধারা ব্যাখ্যা করেছেন সেখানে তাঁর দৃষ্টি অতি স্বচ্ছ এবং পরিচ্ছন্ন। সেই ব্যাখ্যায় ভারতচন্দ্র, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, এঁদের সাহিত্যের পরিচয় আমাদের চোখের, সাম্‌নে সুস্পষ্ট হ'য়ে ফুটে ওঠে। শুধু তাই নয়, একান্ত সাম্প্রতিক হিন্দু মধ্যবিত্তের সাহিত্যে যে বিড়ম্বিত, 'পরাজিত ও পলায়নী সুর' প্রত্যক্ষ সাম্প্রতিক মুসলমান মধ্যবিত্তের সাহিত্যসাধনা যে এখনও পর্যন্ত নিষ্ফলা তারও যথার্থ সামাজিক কারণ এই ব্যাখ্যার মধ্যেই মিল্‌বে। আদি এবং মধ্য যুগেরও অনেক ব্যাখ্যা সাহিত্য ও সমাজের ইতিহাস এবং তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধের উপর নূতন অর্থের সন্ধান দেয়। কবির সাহেবের এই গ্রন্থ মূল্যবান্ মনে করি বলেই আমার আপত্তির কয়েকটি আমি সবিস্তারে বল্‌লুম। তবু, আমার মনে হয় তিনি যত বড় বিষয়ের অবতারণা করেছেন তার তুলনায় তার আলোচনা করা হ'য়েছে অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে। এতটা সংক্ষিপ্ততা বিষয়ের প্রতি কতকটা অবিচার! বস্তুত, বাঙালীর শতাব্দীর পর শতাব্দীর সমাজমানস অতি জটিল, এবং প্রকাশ জটিলতর। এতটা সংক্ষিপ্ততায় তার আভাস দেওয়াও কঠিন। জটিল জিনিসকে সরল সংক্ষিপ্ততায় বিবৃত করতে গেলে বিষয়ের গুরুত্ব অনেক সময় ক্ষুণ্ণ হয়।

নীহাররঞ্জন রায়

Rabindranath through Western Eyes by Dr. Aronson (Kitabistan)

ইউরোপের বিদগ্ধ সমাজে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ও সম্বর্ধনা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এ সমাজের পরিচয়ের সূত্রপাত ১৯১৩। যুদ্ধ-বিরতির পরে যখন রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমে যান, তখন তাঁর সহজ মানবধর্ম, ব্যক্তির কৈবল্যে বিশ্বাস এবং জীবনকে গ্রহণ ক্ষমতা অসংখ্য লোকের কাছে

তাঁকে প্রিয় করে। রক্তপাতের পর ইউরোপের অনেক ক্লান্ত ও উদভ্রান্ত মন তাঁর আদর্শে শান্তি খোঁজে। রবীন্দ্রনাথ সম্বর্ধনার পিছনে আন্তরিকতা ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু শুধু আন্তরিকতা শেষ পর্যন্ত কাজের কথা নয়, আন্তরিকতার পিছনে নিরপেক্ষ সমালোচকের মানসিক ভারসাম্য না থাকলে সেটা টেঁকসই হয় না। আবার অনেক কূটনীতিজ্ঞ রাজনৈতিক ভারতীয় রবীন্দ্রনাথকে তাঁদের কর্মসিদ্ধি ও প্রচারকার্যের জন্য ব্যবহার করার চেষ্টা করেন। ডঃ এ্যারনসন বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে পশ্চিমী প্রতিক্রিয়া অবধারণ করলে পূর্ব ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ও সংঘাত আমরা সম্যক-ভাবে উপলব্ধি করতে পারব। রবীন্দ্রনাথ ইউরোপে সাধারণ লোক এবং অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তির কাছে "বিশুদ্ধ" পূর্ব সভ্যতার প্রতীক রূপে গণ্য হন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ও দেশের সাধারণ লোকের ধারণা কিছুদিন আগে পর্যন্ত বিচিত্র ছিল। যে দেশের পথেঘাটে বাঘ, সিংহ ও সাপ নির্বিকারে ঘুরে বেড়ায় বলে বিশ্বাস, সে দেশের মানস সম্বন্ধে কাল্পনিক ধারণা ও-দেশে স্বাভাবিক। তারও পরে যদি লোকে ভুলে যায় যে-সভ্যতা গণ্ডী মানে না, ইংরেজ রাজত্বের ফলে বিশেষ করে ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে পশ্চিমের যোগাযোগ অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠ, তাহলে রবীন্দ্রনাথের প্রতি সুবিচার আরো কঠিন হয়।

ডঃ এ্যারনসন তাঁর বইতে যে সব তথ্যের সংকলন করেছেন এবং যে দক্ষতা ও অভিনব দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে তাদের বিশ্লেষণ ও বিচার করেছেন তার সম্যক পরিচয় এ সমালোচনার সংকীর্ণ পরিসরে দেওয়া সম্ভবপর নয়। লেখক হিসাবে ডাঃ এ্যারনসনের প্রধান গুণ এই যে, তিনি তাঁর আলোচনা প্রসঙ্গে আধুনিক জীবনের অনেক বিশ্বজনীন সমস্যার ইঙ্গিত করেছেন, যাদের সমাধানের উপরে ভবিষ্যৎ শান্তি ও সভ্যতা নির্ভর করে।

ডঃ এ্যারনসন্ তাঁর গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কাব্যবিচারের প্রয়াস মোটামুটি করেন নি। পশ্চিমে রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও ব্যক্তিত্ব বিচারের যে উদ্যম হয়েছিল তার হেতু ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী সমাজ-তত্ত্ববিদের, তার গুণে তিনি সমরোত্তর ইউরোপীয় মনের একটি বিচিত্র ছবি আমাদের সামনে এনেছেন। যাঁরা পূর্ব পশ্চিমের মিলনে বিশ্বাসী তাঁরা এ-বইতে মনের খোরাক পাবেন: কত আজগুবি সঙ্কীর্ণতা ইউরোপের অনেকের মনে বদ্ধমূল তার পরিচয় পাবেন। সাহিত্য যে পলিটিক্সনিরপেক্ষ নয়, তা ডঃ এ্যারনসন্ পাণ্ডিত্যের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন। কিন্তু সমোরত্তর ইউরোপের রাজনীতির গোলকধাঁধার বর্ণনা করে তিনি শেষ পর্য্যন্ত

বলেছেন যে পশ্চিমের যে সব মনীষীরা বিশুদ্ধ কাব্যের দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে যাচাই করেছেন তাঁরাই শেষ পর্যন্ত সত্যকার রবীন্দ্রনাথের মুখোমুখী হয়েছেন, যেমন য়েট্স্, পাউণ্ড ইত্যাদি। আর যাঁরা রবীন্দ্রনাথের লেখায় ক্রীশ্চান্ কিম্বা বৈদিক যুগের প্রতিনিধি খুঁজেছেন তাঁদের প্রয়াস পণ্ডশ্রম হয়েছে।

এ বই-এর একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ে লেখক জর্মানিতে রবীন্দ্রনাথের বিপুল সম্বর্দ্ধনা ও প্রতিপত্তির কারণের আলোচনা করেছেন। যুদ্ধের পর পরাজিত জর্মানিতে বুদ্ধি-বিরোধী যে ভাবুকতা গড়ে উঠেছিল, তা সমসাময়িক অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তির কাছে অস্বাভাবিক এবং বিপদসূচক ঠেকেছিল। রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনার পিছনে সাহিত্যপ্রীতি কতটা ছিল তা ডঃ এ্যারনসন্ সন্দেহ করেছেন। তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে যে-মনোভাব জর্মানিতে রবীন্দ্রনাথকে ঋষির পর্যায়ে তুলেছিল সেই মনোভাবের প্রতিক্রিয়াই শেষ পর্যন্ত নাৎসি পার্টির পুষ্টিসাধন করে। এবং তাঁর এ সিদ্ধান্তের পিছনে যে ঐতিহাসিক সত্য আছে তা অস্বীকার করা যায় না।

পাশ্চাত্ত্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্য বিচারের অনেক অন্তরায় ছিল। এ প্রসঙ্গে এ্যারনসন্ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য মনের উল্লেখ করেছেন। আমাদের দেশে ইংরেজী ভাষা বহুদিন ধ'রে শিক্ষার বাহন বলে অনেক ভারতীয় ইংরাজি সাহিত্যের রসাস্বাদনে সক্ষম হন, তাঁদের কাছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনের বিরোধিতা খুব বড়ো বাধা বলে ঠেকে না। কিন্তু যেহেতু ভারতবর্ষ ইংরাজের কলনি, সেহেতু ইউরোপীয়দের কাছে উপরোক্ত বিরোধিতার বিঘ্ন সহজেই ঘটে। চীনে কবিতার ইংরেজী অনুবাদ যখন প্রথম বেরোয়, তখন তার সমাদর সত্বর হয়েছিল, এবং সে সমাদর এখনো কমেনি। অথচ ১৯২৫এর পর ইউরোপে রবীন্দ্রনাথের প্রতিপ্রত্তি কমে এসেছে। ডঃ এ্যারনসন্ বলেন, প্রতিপত্তির পতনের মূলে রয়েছে ১৯৩০এর পরে ইউরোপে "positive faith"এর অভাব। ১৯১৮-এর তুলনায় কি ১৯৩০-এ positive faith ইউরোপে কমে এসেছিল? ইংলণ্ডের সাহিত্যে বরং positive faithএর সন্ধান ১৯৩০-এর পরে স্পষ্ট। একদিকে ক্যাথলিক ধর্ম ও সংঘে বিশ্বাসী এলিয়ট্, অন্যদিকে চীন ও স্পেনে ভ্রাম্যমাণ বামপন্থী কবি অডেন, দুজনেই কি আস্থাবান মনের প্রতীক নন? যে সময় এডিংটন, জীন্স্ প্রমুখ নব-বৈজ্ঞানিকদের জনপ্রিয়তা বর্দ্ধিষ্ণু এবং হাক্স্লির নায়ক জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে যৌগিক ধ্যানে প্রায় মুহ্যমান সে সময় রবীন্দ্রনাথের

প্রতিপত্তি ইউরোপে ত আরো বৃদ্ধি পাওয়া উচিত ছিল, কারণ ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে ওদেশে নানারকম ধারণা এখনো আছে। কেন পেল না, সে প্রশ্নের আলোচনা হয়ত এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে।

ডঃ এ্যারনসন্ ফ্রান্সে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার সমাদর এবং রাশ্যা-ভ্রমণের অধ্যায় বাদ দিয়েছেন, তাতে বইটির অঙ্গহানি হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কয়েকটি আধুনিক ও পুরাতন কবির তুলনামূলক সমালোচনার আলোচনা তিনি একটি অধ্যায়ে করেছেন, সে অধ্যায়টিও উল্লেখযোগ্য। স্থানাভাবে তার আলোচনা করা গেল না।

সমর সেন

বাংলা ছন্দ ও মিল

বুদ্ধদেব বসু

এই কবিতাগুলির বিষয়ে আঙ্গিকের দিক থেকে দু' একটি কথা বলতে ইচ্ছা করি। বাক্ছন্দের সঙ্গে কাব্যছন্দের মিলন—এই ছিলো আমার সাধনা। রচনাকালে নিজের মনে-মনে নিম্নলিখিত অনুশাসন গ্রহণ করেছিলুম:

(১) বাক্যবিন্যাসের মৌখিক রীতি থেকে চ্যুত হবো না।

(২) 'সাধু' ক্রিয়াপদ 'হইবে' 'বলিব' 'করিতেছে' প্রভৃতি ব্যবহার করবো না।

(৩) 'কাব্যিক' ক্রিয়াপদ' ফুটি' চলিছে হতেছে ইত্যাদিও বর্জনীয়।

(৪) 'কাব্যিক' শব্দকে সম্পূর্ণ বয়কট্ ক'রে চলবো। 'মম' 'তব' 'কভু' 'যেথা', 'মোদের' 'সাথে' 'মাঝে' 'আঁধার' 'সনে' 'যবে' 'মতন' 'পরান' এই ধরনের কথাগুলিকে কাছেই ঘেঁষতে দেবো না।

(৫) মতো অর্থে প্রায়, দাও অর্থে দেহ, দেখতে অর্থে দেখিবারে, এলাম অর্থে এনু, পারি না অর্থে নারি এ-সবও নির্মমরূপে বর্জনীয়। প্রতিশব্দ এড়িয়ে চলবো। হাতকে হস্ত, গাছকে তরু, ফুলকে পুষ্প, হাওয়াকে পবন, পৃথিবীকে ভুবন বলবো না। মুখের কথায় এদের যা বলি কবিতাতেও তা-ই বলবো। অধিকরণে -'তে' ('ঘরেতে', 'টেবিলেতে') পশ্চিমবঙ্গের মৌখিক রীতি হ'লেও, কিংবা সেইজন্যেই, প্রাদেশিকতা ব'লে বর্জনীয়।

* লেখকের সদ্যপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'দময়ন্তী' থেকে সঙ্কলিত।

৩

(৬) অথচ এরই সঙ্গে ভাষা হবে সুগম্ভীর সাংস্কৃতিক ; সংস্কৃত শব্দ বেশি ক'রে নিলে রচনায় যে দৃঢ়তা ও সংহতি আসে সেটা ছাড়বো কেন ? সূর্যকে রবি কিংবা আকাশকে গগন বলবো না, কেননা ওগুলো আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহারের কথা, কিন্তু 'রতি-হ্রস্ব' কি 'স্বতঃশ্লথ' বলতে দোষ নেই, কেননা ও-ধরনের কথা আমাদের মৌখিক আলাপে কখনো ব্যবহৃতই হয় না।

এই অনুশাসনগুলি মেনে নিয়ে কাব্যরচনা সহজ হয়নি। 'বন্দীর বন্দনা' 'কঙ্কাবতী'র কবিতা হু-হু ক'রে লিখেছিলুম, কিন্তু 'দময়ন্তী'র এক-একটি কবিতা লিখতে বিস্তর সময় লেগেছে, প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে। আশা করি সে-পরিশ্রমের চিহ্ন কবিতাগুলির মুখশ্রীকে মলিন করতে পারেনি। গদ্যের পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে কাব্যের আবেগ-সঞ্চারী স্বভাবের মিলন ঘটাতে চেয়েছি। দেখা গেছে এ দু'য়ের সম্বন্ধ তেল-জলের সম্বন্ধ নয়। এখানে ব'লে রাখি যে এই গ্রন্থে একটিও গদ্যকবিতা নেই। কোনটা গদ্যকবিতা আর কোনটা গদ্যকবিতা নয় সে নিয়ে অনেক গুণীজনের মনেও সংশয় উপস্থিত হ'তে দেখেছি, সেইজন্য কথাটা উল্লেখ করলুম। কাব্যরচনার যে-বহুব্যবহৃত পদ্ধতি থেকে মুক্তির চেষ্টায় গদ্যকবিতার উদ্ভব, সে-মুক্তি পদ্যে আবদ্ধ থেকেও অর্জন করা অসম্ভব নয়। আমি দেখছি পদ্যকে দিয়েও গদ্যকবিতার কাজ করিয়ে নেয়া যায়, রবীন্দ্রনাথ তা বহুবার করেছেন। অধুনা পদ্যের সেই রূপটিই আমার মনকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করছে। 'পরিশেষ' 'জন্মদিন' শেষ লেখা' প্রভৃতিকে অনেকে ভুল ক'রে গদ্যকবিতা বলেন। এখানে সতর্কতা দরকার। পদ্য, অথচ গদ্যকবিতার মতো মৌখিক ভাষায় গঠিত, বাংলা পদ্যের নতুন পরিণতি বোধ হয় এই দিকেই।

বলা বাহুল্য, তালিকাভুক্ত নিয়মগুলি সম্পূর্ণ মেনে চলা সম্ভব হয়নি। বিচ্যুতি ঘটেছে। 'যেদিন শরীরে তোর মুঞ্জরিবে—' ('দময়ন্তী'), 'কালের কুটিল গতি গর্ভবতী করিবে কঙ্কালে' ('ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা'), 'বৃষ্টির ঝর্ঝর স্বর ঝরিছে মধুর' ('ছন্দ') দুটি 'কাব্যিক' ও একটি 'সাধু' ক্রিয়াপদ পাওয়া গেলো। 'যে-ভয়ে কখনো গান্ধির কভু অরবিন্দের চরণ শরণ' না-লিখে পারিনি। 'শান্তিনিকেতনে গ্রীষ্ম' কবিতায় অকপটেই 'কাব্যিক' রীতিকে স্বীকার ক'রে নিয়েছি, কিন্তু এ-স্বীকৃতি এ-বইয়ের ঐ একটিমাত্র কবিতাতেই। 'পূর্বরাগে' ধরণীকে এড়াতে পারিনি, 'সাগর-দোলা'য় সাগরকে সগৌরবে

জায়গা ছেড়ে দিতে হয়েছে। সাবধানী পাঠক অন্বেষণ করলে আরো ব্যতিক্রম হয়তো পাবেন, কিন্তু খুব বেশি পাবেন না। মোটামুটি, এবং যথাসম্ভব যত্নে, নিয়মগুলি মেনে চলেছি।

বাক্‌রীতির সঙ্গে কাব্যরীতির মিলনের শ্রেষ্ঠ বাহন কোন ছন্দ ? ছন্দো-বিচারে পাণ্ডিত্যের অধিকারী আমি নই কিন্তু কাব্যরচনায় আমার অভিজ্ঞতা থেকেই এ-বিষয়ে যদি কিছু বলি বিজ্ঞ ব্যক্তিরা অপরাধ নেবেন না। এটা দেখা যাবে যে 'দময়ন্তী'র বেশির ভাগ কবিতাই পয়ারজাতীয় ছন্দে রচিত। এটা দৈবাৎ হয়েছে তা বলতে পারিনে। কেননা নানা সময়ে নানা কবিতা লিখতে ব'সে এই ধারণাই আমার মনকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে যে বাক্‌রীতির সঙ্গে কাব্যরীতি মেলাতে হ'লে পয়ারই শ্রেষ্ঠ বাহন। বস্তুত, বাঙালির কথা বলবার স্বাভাবিক ছন্দই পয়ার ছন্দ। সকলেই জানেন যে পয়ারে অনেকখানি ফাঁক থাকে যেটা কবি ইচ্ছামতো ভ'রে নিতে পারেন কিংবা ফাঁক রাখতে পারেন। এইটেই পয়ারের বিশেষত্ব। এই জন্যে মুখের ভাষার সঙ্গে তার সহজ আত্মীয়তা। কোনো একটি শব্দ, কিংবা বাক্যগঠনের কোনো ভঙ্গি এড়াতে হ'লে পয়ারে তার অনেক রাস্তা খোলা পাওয়া যায়। আবার যে-শব্দটি, বাক্যগঠনের যে-ভঙ্গিটি বাঞ্ছনীয়, তার জন্যেও কোনো-না-কোনো দরজা খোলা থাকেই। পয়ারের অফুরন্ত সঙ্কোচন-সম্প্রসারণশীলতার জন্যই এটা সম্ভব হয়। পয়ারকে নিয়ে কী যে করা যায় আর কী যে করা যায় না তার কোনো সীমানা আছে ব'লে মনে হয় না। লঘু ও ভারবান, দ্রুত ও মন্থর, গম্ভীর ও চপল সবই সে হ'তে জানে। গভীর-তম চিন্তা থেকে লঘুতম পরিহাস—মনের সকল মহলেই তার অবাধ আনাগোনা। বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের পাশেই মুখের একটা চলতি বুলি সহজেই সে নিজের মধ্যে মানিয়ে নেয়। একই কবিতায় মননশীলতা ও ব্যঙ্গ, বাস্তবিকতা ও কল্পনা, এই ধরনের আলাদা-আলাদা সুর পাশাপাশি বসাতে হ'লে পয়ারের মতো প্রশ্রয় কোথাও পাওয়া যায় না। যুক্তাক্ষর চাপিয়ে তাকে দৃঢ় করো, গম্ভীর করো, আবার যুক্তাক্ষরের গ্রন্থি শিথিল ক'রে দিয়ে তাকে ঝর্নার মতো নাচাও। অনেকটা কম হ'য়ে গেলো, টেনে পড়ো ; কিছুটা বেশি হ'লো, চেপে দাও। কিছুতেই যেন ছন্দপতন হ'তে চায় না। পয়ার শতরূপী ও সর্বব্যাপী। পৃথিবীর আর-কোনো ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করবার এমন একটি আশ্চর্য যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে কিনা জানিনে।

পয়ারের পরেই ছড়ার ছন্দ। এ-ছন্দেও ঠিক পয়ারের মতোই অনেক ফাঁক থাকে; পয়ারের মতোই এর হালকা অংশ টেনে পড়ি ও ভারি অংশ চেপে পড়ি, মোট ওজন সমান থাকে। পয়ার আর ছড়ার ছন্দে মূলত কোথাও একটা খুব বড়োরকমের মিল নিশ্চয়ই আছে, নয়তো এটা কী ক'রে সম্ভব হয় যে একই পংক্তি ছড়ার ছন্দেও পড়া যাচ্ছে, আবার পয়ার ক'রে পড়লেও তার জাত যাচ্ছে না? 'ঘরেতে দুরন্ত ছেলে করে দাপাদাপি', রবীন্দ্রনাথের এ-পংক্তি স্পষ্টই পয়ারজাতীয়, কিন্তু এটি 'বিষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর' কবিতায় নিখুঁত ছড়ার ছন্দে বসানো আছে। এ-সাদৃশ্য আকস্মিক নয়, চারিত্রিক; আমাদের গ্রাম্য ছড়ায় এমন অনেক পংক্তিই পাওয়া যায়, যা রীতিমতো পয়ারে চালিয়ে দেয়া যায় অথচ ছড়ার ছন্দ থেকেও যা বিচ্যুত নয়। অথচ পয়ারে ও ছড়ার ছন্দে মস্ত একটা প্রভেদও আছে, সেটা আমরা কানে শুনতে পাই। দুই ছন্দের দুই স্বতন্ত্র সুর। এ-প্রভেদটি ঠিক কোথায় সেটা ছান্দসিকের আলোচ্য।

অনেকের মনে হ'তে পারে যে যেহেতু বাংলার অশিক্ষিত অচেতন মন ছড়ার ছন্দেই নিজেকে প্রকাশিত করেছে সেইজন্য এই ছন্দই আমাদের মৌখিক ভাষার সবচেয়ে কাছাকাছি। কিন্তু কবিতা লিখতে ব'সে দেখা যায় যে এ-ধারণাটি ঠিক নয়। পয়ারের বিশাল মুক্তি ছড়ার ছন্দে নেই, তা অনেকটা সীমাবদ্ধ। অনেক কথা আছে যা এ-ছন্দে ঢোকে না, অনেক ভাব আছে যা এ-ছন্দ বহন করতে পারে না। যদিও হচ্ছে দিচ্ছে প্রভৃতি ক্রিয়াপদগুলি এতে পয়ারের চাইতে সহজে ঢোকে, তবু অন্য অনেক 'কাব্যিক' কথা আছে যা বর্জন ক'রে তার দেহরক্ষা দুরূহ হয়। (অধিকরণে 'তে' উপসর্গটির বাহুল্য এ-ছন্দে লক্ষ্য করবার।) তাছাড়া গাম্ভীর্য এর প্রকৃতিগতই নয়, অপেক্ষাকৃত লঘুরসের কবিতাই এতে সম্ভব, এবং এ-ছন্দ কিছুক্ষণ পরেই একঘেয়ে ঠেকে। পক্ষান্তরে, পয়ারের বৈচিত্র্য অন্তহীন।

রবীন্দ্রনাথ যাকে তিন মাত্রার ছন্দ বলতেন, যাতে তাঁর অনেক কবিতা ও বেশির ভাগ গান রচিত, সে-ছন্দ স্বভাবতই মৌখিক ভাষার সবচেয়ে দূরে। এ-ছন্দ একেবারেই আঁটোসাঁটো, মাপাজোকা, প্রতিটি মাত্রা কথা দিয়ে-দিয়ে ভরিয়ে চলতে হবে, একটুও ফাঁক কোনোখানে নেই। ছোটো গীতিকবিতার পক্ষে এ-ছন্দ খুব উপযোগী, কিন্তু কবি যেখানে নাটকীয় বৈচিত্র্য-প্রয়াসী সেখানে এ-ছন্দ কোনো কাজেই লাগে না। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে বাংলা ভাষার কাব্য-নাট্য কি নাটকীয় কাব্য সবই যে পয়ারে লেখা

তাতেই প্রমাণ করে যে মৌখিক ভাষার ছন্দের সঙ্গে পয়ারেরই আন্তরিক মিল সবচেয়ে গভীর। এর একমাত্র ব্যতিক্রম বোধ হয় 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা', সেখানে পরিহাসপ্রধান বিষয়ের জন্য তিন মাত্রার ছন্দ মানিয়েছে। তবু বলবো যে 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' 'পরিশেষে'র পয়ারে লেখা যেতো, কিন্তু 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' তিন মাত্রার ছন্দে কখনোই নয়। পদ্যে নাটক কিংবা নাটকীয় কাব্য লিখতে হ'লে বাঙালি কবির পয়ারই আশ্রয়; ছড়ার ছন্দের গুনগুনানি সুর কিংবা তিনমাত্রার সুনিয়ন্ত্রিত মধুরতা এ-ক্ষেত্রে তাঁকে বর্জন ক'রে চলতেই হয়। পয়ারের সঙ্গে অন্য দুটি ছন্দের জাতিগত পার্থক্য কবিতার আবৃত্তি শুনলেও ধরা পড়ে। 'দেবতার গ্রাসে'র আবৃত্তি এমনভাবে হওয়া সম্ভব যাতে প্রায় মুখের কথা শুনছি ব'লেই মনে হয়, কিন্তু 'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে' কিংবা 'আনমনা গো আনমনা'র আবৃত্তি পদে-পদেই বুঝিয়ে দেবে যে এটা পদ্য, এর ঝোঁকগুলি অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট, এ গদ্য থেকে একেবারেই আলাদা জাতের ভাষা। কাব্যিক শব্দ ও সাধু ক্রিয়াপদগুলিকে যদি পয়ার থেকে নির্বাসিত করা হয় তাহ'লে সঙ্গে-সঙ্গেই তা মৌখিক ভাষার ঠিক ততটাই অনুরূপ হ'তে পারে, কবিতার পক্ষে যতটা হওয়া সম্ভব। অথচ তা গদ্য নয়, গদ্যছন্দও নয়, ছন্দোবন্ধনের মাধুর্যের সঙ্গে কথ্য ভাষার সতেজ প্রাণশক্তির সমন্বয়।

এই গ্রন্থের কোনো-কোনো কবিতায় আমি পয়ারের ব্যবহারে প্রথা-পথের বাইরে দু-একটি পরীক্ষা করেছি। পয়ারে বিজোড় মাত্রার স্থান নেই এ বহুকালের পুরোনো কথা, কিন্তু 'হে কাল!' কবিতায় আমি সাহস ক'রে লিখেছি—

> হাজার জাহাজডুবি রেখে গেছে বণিকের নাবিকের হাড়,
> পাহাড়।...
> উজ্জ্বল আলোর মতো অলঙ্কার, রক্তের মতো লাল
> প্রবাল।...
> পূর্ণ ক'রে দেবে এই শীর্ণ শতাব্দীর
> শরীর।...
> দিনে-দিনে, তিলে-তিলে মুঞ্জরিত প্রাণপুঞ্জ, রক্তের মতো লাল
> প্রবাল।...

এখানে 'পাহাড়' 'শরীর' ও 'প্রবাল' কানকে পীড়িত করা উচিত, কিন্তু পীড়িত করবে না, ঠিক মানিয়ে যাবে যদি পাহাড়ের হা, শরীরের রী ও প্রবালের বা একটু টেনে পড়ি। সুখের বিষয় তিনটিই দীর্ঘ স্বর, এবং পংক্তির

শেষে আছে ব'লে দীর্ঘ ক'রে পড়বার স্বাভাবিক ঝোঁকও আমাদের হয়। আসলে কথাগুলি দেখতে যদিও তিন মাত্রা, একটু টেনে প'ড়ে চার মাত্রার ওজন তাদের সহজেই দিতে পারি। পয়ারে এ-রকম টেনে পড়াটা কিছু অন্যায় নয়, হামেশাই ও-রকম পড়তে হয়, পাখি সব করে রব পড়তেও সব আর রব-কে অনেকখানি না-টানলে ছন্দই থাকে না। হসন্ত অক্ষরের আগের স্বরের দীর্ঘতা বাংলা উচ্চারণের সাধারণ নিয়ম। এখানে পাহাড় আর প্রবালকে টেনে পড়ার আভ্যন্তরীণ কারণও কিছু আছে ব'লে আমার মনে হয়, স্তবকের শেষে পূর্বসঞ্চিত বিষণ্ণতা যেন একটি দীর্ঘশ্বাসের মতো এই দীর্ঘ স্বরের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হ'লো; যেটা শেষ হবার সেটা পরিপূর্ণরূপেই শেষ হ'য়ে গেলো।

তাহ'লে দাঁড়াচ্ছে এই যে দৃশ্যত যেটা তিন মাত্রা সেটা শ্রাব্যত চার মাত্রা হ'তে পারে। এর আর-একটা উদাহরণ মনে পড়ছে। 'বিদেশিনী' ব'লে একটা কাব্যকাহিনী লিখেছিলুম, তাতে আছে:

এরা তো বাঙালি নয়, কী ক'রে বুঝবে
মা, বাবা, ভাই, বোন, স্বামী, স্ত্রী
এ-সব কথার মানে কী।

এটা লেখবার সময় কিছু মনে হয়নি, কোনো সমালোচক বন্ধুও কিছু বলেননি, কিন্তু হঠাৎ সেদিন আমার নিজেরই মনে হ'লো যে এখানে মা, স্ত্রী, কী এ তিনটি একাক্ষরা কথায় ছন্দের তো কাৎ হ'য়ে পড়া উচিত ছিলো, কিন্তু তা হয়নি কেন? ভেবে দেখলুম না-হবার কারণটা খুব সহজ। এক মাত্রার কথাগুলিকে অচেতন প্রবৃত্তি থেকেই টেনে প'ড়ে আমরা মনে-মনে দুই মাত্রার মূল্য দিয়ে ব'সে আছি, তাই এতে যে রীতিবিরুদ্ধ কিছু আছে, পড়বার সময় তা আমাদের মনেই হয় না। যদি লিখতুম

মাতা, পিতা, ভাই, বোন, পত্নী, স্বামী
এ-সব কথার কী যে মানে।

তাহ'লে যা হ'তো এও তাই, কিন্তু ঠিক তাও নয়। এ দুয়ের মধ্যে কোনটা যে ভালো তা আশা করি কাউকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। যেটা লিখিনি সেটা যে আড়ষ্ট লাগছে, দুর্বল বোধ হচ্ছে, তার কারণ এখানে ছন্দের নিয়মরক্ষাই হয়েছে, প্রাণরক্ষা হয়নি। যেটা লিখেছি, সেটা শব্দচয়নে ও বাক্যবিন্যাসে হুবহু মুখের কথার মতো ব'লে সহজ ও জোরালো লাগছে, তার উপর মা, স্ত্রী, ও কী-তে কিছু জায়গা ছেড়ে দিয়েছি ব'লে কমাগুলি জিরোবার জায়গা

পেয়েছে ও প্রশ্নটা তীব্র হ'তে পেরেছে। চোখের বিচারে এতে ছন্দের খুঁত আছে, কিন্তু সেটা ভুল বিচার, কান একেই সাগ্রহে বরণ করে। ঠিক এইরকম 'চলচ্চিত্র' কবিতার

এখন তাহ'লে করা
কী?

এখানে 'কী' দেখতে একমাত্রা হ'লেও আসলে দুই মাত্রা। টেনে পড়তে হয় ব'লে প্রশ্নটার মর্মান্তিকতা অধিকতর পরিস্ফুট।

চোখে-দেখার ছন্দের চাইতে কানে-শোনার ছন্দকে আমি সর্বত্রই প্রাধান্য দিয়েছি। আমাদের কথ্য ভাষায় অসংখ্য যুক্তাক্ষর আছে যা চোখে দেখা যায় না, যেমন বাংলা, হলদে, টুকরো, পাগড়ি, খাজনা। এ-সব শব্দ এতকাল আমাদের পয়ার-কাব্যে হয় ব্যবহৃত হ'তো না, কিংবা ব্যবহৃত হ'লেও অক্ষর-গুনতি মাত্রার মূল্য পেতো। শব্দটিতে তিনটি অক্ষর থাকলে তিন মাত্রা ধরা হ'তো, চারটি কি পাঁচটি থাকলে চার কি পাঁচ। এই কথাগুলি থেকে আমরা কাব্যের রাজত্বে পুরো খাজনা আদায় ক'রে নিচ্ছি না এ-কথা অনেক দিন আগেই আমার মনে হয়েছিলো। ভেবে দেখেছিলুম 'আমরা' কথাটির আমরা মুখে যে-উচ্চারণ করি সে-অনুসারে ওটা দু'মাত্রাই, অথচ আমাদের পয়ারে কখনোই ওর প্রতি সে-রকম ব্যবহার দেখিনি। 'এখন বিকেল' কবিতাটিতে যখন লিখেছিলুম:

আমরা আজ দুঃসাহসী সমুদ্র-দস্যুর মতো
চলো লুঠ ক'রে আনি বিকেলের রূপকথা-দ্বীপেরে,
কিংবা এখনো বিকেল আসে চুপি-চুপি কলকাতায়

তখন মনে-মনে ভয় ছিলো, কারণ বহুকালের অভ্যাসের মোহ কাটিয়ে ওঠা সহজ নয়। এ-পথে হঠাৎ খুব বেশি অগ্রসর হ'তে সাহস পাইনি। আমি যখন সাবধানে পথ হাৎড়িয়ে ফিরছি তখন সুভাষ মুখোপাধ্যায় অতি অল্প বয়সে তাঁর 'পদাতিকে'র আশ্চর্য কবিতাগুলি লিখে আমাকে চমক লাগিয়ে দিলেন। তাঁর হাতেরই ধাক্কায় বাংলা ছন্দের নতুন একটি মহল খুলে গেলো, তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র করেছি। 'গোলদিঘি' 'ভারতবর্ষ' 'অনেকদিন' 'খিদিরপুর' এ-সমস্ত শব্দেরও গুপ্ত যুক্তাক্ষর তাঁর কানে বেজেছে, এতে আমার মন বার-বার বিস্ময়ের সঙ্গে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছে। 'মোরা' শব্দকে এড়াবার সব-চয়ে সহজ উপায় যে আমরা-কে খুব স্বাভাবিকভাবে 'আম্রা' উচ্চারণ করা,

এ-কথা বিশ্বাস করবার জোর পেলুম সুভাষের কবিতা প'ড়ে। 'ইলিশ' কবিতায় লিখেছি :

আকাশে আষাঢ় এলো, বাংলাদেশ বর্ষায় বিহ্বল।

মনে পড়ে 'বাংলাদেশ' কথাটি এখানে একটু সচেতনভাবেই বসিয়েছিলুম। দশ বছর আগে হ'লে বসাতে পারতুম কি? খুব সম্ভব পারতুম না। খুব সম্ভব বঙ্গদেশে লিখতুম, তাতে পংক্তিটি আমার মতে অনেক খারাপ হ'তো। 'শান্তিনিকেতনে বর্ষা' কবিতায় আছে :

…বিশুষ্ক বীরভূম খুলে ক্লান্ত ঠোঁট
পান করে এই প্রাণ…

আমি বিশ্বাস করি, এখানে তিনমাত্রিক বীরভূম পংক্তিটিকে একটু বেশি গাঢ়তা দিয়েছে। পাঠক মনে-মনে 'শুষ্ক বীরভূম' ক'রে নিয়ে তুলনা ক'রে দেখতে পারেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আরো বলা যায় যে 'তার উপর' কথাটি খুব স্বাভাবিকভাবে তারুপর (কি তারোপর) উচ্চারণ করলে পয়ারে অনায়াসে চারমাত্রিক জায়গা পায়, 'হয়তো' দু'মাত্রা হ'তে কোনোই আপত্তি করে না। পাঠক একটু চিন্তা করলে এ-রকম আরো অনেক কথা তাঁর মনে পড়বে।

অবশ্য আমি এ-কথা বলি না যে যেখানেই অদৃশ্য যুক্তাক্ষর পাওয়া যাবে সেখানেই এই কৌশল প্রয়োগ করতে হবে। এ-বিষয়ে মন সম্পূর্ণ খোলা রাখাই ভালো। যখন যে-রকম দরকার তা-ই করবো। যখন যে-ধ্বনিটি, যে-ব্যঞ্জনাটি চাই ঠিক তারই অনুসারে যুক্তাক্ষরগুলি সাজাবো। যেগুলি দৃশ্যতই যুক্তাক্ষর, দরকার হ'লে তাদেরও গ্রন্থি আলগা ক'রে কানের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে কুণ্ঠা করবো না।

উজ্জ্বল আলোর মতো অলঙ্কার, রক্তের মতো লাল—

এখানে একই পংক্তিতে যুক্তাক্ষরের প্রতি দু'রকম ব্যবহার করেছি; 'উজ্জ্বল' তিন মাত্রা, 'রক্তের' চার মাত্রা। একই কবিতায় এইরকম মিশ্রণের পক্ষপাতী কিছুকাল পূর্বে আমি ছিলুম না, কিন্তু এখন এতে আমি কোনো দোষ তো দেখিই না উপরন্তু এ-কথাও মনে হয় যে এইরকম মিশ্রণ ব্যতীত পয়ারের বৈচিত্র্য সম্পূর্ণ উদ্ঘাটন করা বোধ হয় সম্ভবই নয়।

এবারে মিলের কথা। বাংলায় সব মিলই যে যুগ্মস্বরের মিল কিংবা ইংরেজি মতে 'মেয়েলি' মিল এ-কথা আজকের দিনে নতুন নয়। অবশ্য

এই যুগ্ম-মিলের প্রবর্তন রবীন্দ্রনাথই করেন, প্রাক্-রবীন্দ্র যুগে এক মাত্রার মিলে কারো কানে খটকা লাগতো না। কয়েক বছর আগে অজিত দত্ত 'কবিতা'য় একটি প্রবন্ধে এক স্বরের মিল ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব করেন। তাঁর এই প্রস্তাবে আমার আন্তরিক সমর্থন ছিলো। ভেবে দেখলে দেখা যাবে এই যুগ্ম-মিলের সংস্কারে আমাদের কাব্যের স্বাভাবিক প্রকাশ অনেক স্থলেই ব্যাহত হয়েছে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাব্য থেকে তার উদাহরণ দেয়া যায়। মিলের খাতিরে শব্দের স্বাভাবিক উচ্চারণ বিকৃত করতে রবীন্দ্রনাথও কখনো-কখনো বাধ্য হয়েছেন :

দুগ্ধফেনশয়ন করি আলা
স্বপ্ন দেখে ঘুমায়ে রাজবালা। ('সোনার তরী'—'নিদ্রিতা')

'আলা' কথাটি এখানে একটু শ্রুতিকটু তাতে সন্দেহ কী। 'আলো' বলতে পারলে কত ভালো হ'তো! এখানে না-হয় কোনো উপায়ই ছিলো না, কিন্তু ওরই ঠিক পরের কবিতায় ('সুপ্তোত্থিতা') 'মালা' ও 'বালা'র সঙ্গে মেলাবার জন্য 'উতলা'কে তিনি 'উতালা' লিখেছেন—নিতান্তই যুগ্মমিলের সংস্কারের বশবর্তী হ'য়ে। 'উতালা'র কোনো দরকার ছিলো না, উতলাই যথেষ্ট মিল হ'তো। কদাচ কখনো এইরূপ ক্ষেত্রে শব্দকে তিনি অবিকৃতই রেখেছেন, যেমন 'চিত্রা'র 'নগরসংগীত' কবিতায় 'কাকলি'র সঙ্গে 'আকুলি' মিলিয়েছেন, কাকলি-কে কাকুলি লেখেননি। কাকলি-আকুলি কানে সইলে উতলা-বালার অপরাধ কী? বস্তুত, দুটোই যে ভালো মিল, যে-কোনো কাব্যপ্রেমিক সততার সঙ্গে আপন কান দিয়ে পরীক্ষা করলেই তা উপলব্ধি করবেন।

যুগ্ম-মিল যে আমাদের একটা সংস্কার মাত্র, তাও চোখের সংস্কার, তার আরো প্রমাণ দিচ্ছি। অজিত দত্ত তাঁর প্রবন্ধে বলেছিলেন যে 'বাংলায় হসন্ত শব্দে এক স্বরের মিল চলে এবং মোটামুটি ভালো মিল বলেই গণ্য হয়।' খুব সত্য কথা। 'মন-বন', 'গান-কান' 'সুর-দূর' ইত্যাদি অসংখ্য মিল বাংলা কবিতায় সর্বদা চ'লে আসছে; এগুলি সবই একমাত্রার মিল, অথচ যেহেতু চোখে দেখতে দুটো অক্ষর সেই জন্যে এদের বিরুদ্ধে কখনো কোনো আপত্তি শোনা যায় না। এ-সব মিল যাঁরা অনায়াসে মেনে নেন তাঁরাই কখনো 'পাখি'র সঙ্গে 'দেখি' কিংবা 'শুনি'র সঙ্গে 'বাণী' মিল দেখলে আঁৎকে ওঠেন, ও-রকম মিল নাকি কবির অক্ষমতারই পরিচয়। অথচ 'শুধু-বঁধু' 'ব্যথা-কথা' এ দুটি একস্বরের মিল

আমাদের কাব্যে বহুলপ্রচলিত, এ-বিষয়েও অজিত দত্ত উল্লেখ করেছিলেন। শুধু-বঁধু যদি কর্ণপীড়ন না করে দেখি- পাখিও করতেই পারে না। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের রচনায় একমাত্রার মিল প্রচুর আছে, 'সোনার তরী'তে যেত-দিত মিল পাওয়া যায়, ('রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে'), তাতে ঐ অনিন্দ্য কবিতার উপভোগ্যতা কিছুমাত্র হ্রাস হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের মিল সম্বন্ধে আর-একটা কথা উল্লেখযোগ্য। তোলে ফোটে ছোটে প্রভৃতি কথার বানান কবিতায় তিনি লিখতেন তুলে ফুটে ছুটে—অন্তত অনেকদিন পর্য্যন্ত তা-ই লিখতেন—এবং কখনো-কখনো এদের সঙ্গে এমন-সব মিল দিতেন, যেগুলি চোখে দেখতে যুগ্ম মিল, বস্তুত এক স্বরের মিল। যেমন বিখ্যাত 'দুরন্ত আশা' কবিতায় :

> বিপদ মাঝে ঝাঁপায়ে পড়ে
> শোণিত উঠে ফুটে ;
> সকল দেহে সকল মনে
> জীবন জেগে উঠে।

এখানে 'উঠে' মানে 'ওঠে', উচ্চারণও তা-ই, অন্তত তা-ই হওয়া উচিত। তা ছাড়া ক'রে-ঝরে, দোলে-চলে ইত্যাদি মিল আসলে একস্বরের হ'লেও 'ভালো' মিল ব'লেই সাধারণত স্বীকৃত। এ-রকম উদাহরণ আরো অনেক সংগ্রহ করা সম্ভব, কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। এই ধরনের মিলগুলিকে আমরা যে বিনা দ্বিধায় যুগ্ম-মিল ব'লে গ্রহণ ক'রে এসেছি তাতে এইটেই বোঝা যায় যে আমরা সাধারণত চোখ দিয়ে মিল দেখি, কান দিয়ে মিল শুনিনে।

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের মিলের খুঁত ধরা আমার উদ্দেশ্যে নয়। হাজার-হাজার কবিতায় ও গানে পদে-পদে যুগ্ম মিল অর্থের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রেখে তিনি এমন নিখুঁতভাবে দিয়ে গেছেন যে তা চিরকাল আমাদের বিস্ময়ের বস্তু হ'য়ে থাকবে। আমি শুধু বলতে চাই যে যুগ্ম মিলের—কিংবা প্রথাগত 'ভালো' মিলের—আবশ্যিক তাগিদে তাঁর মতো বিরাট প্রতিভাকেও কখনো-কখনো বিপদে পড়তে হয়েছে ; তাঁর রচনা থেকেও এমন পংক্তি উদ্ধার করা সম্ভব, যে-কোনো উপায়ে 'ভালো' মিল দেবার দায় না-থাকলে যা আরো উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটতো। অজিত দত্ত উল্লিখিত 'গুপ্ত প্রেম' কবিতার লাগিয়া-ভাগিয়া দৃষ্টান্ত অনেকেরই মনে পড়বে। এ-কথা সত্য যে বাংলা ভাষায় মিলের ঐশ্বর্য স্বভাবতই খুব বেশি, আর এটাও রবীন্দ্রনাথেরই

আবিষ্কার, তাই যুগ্ম-মিলের তিনিই প্রবর্তক। এত অজস্র বিচিত্র যুগ্ম-মিল যে আমাদের ভাষায় ইতস্তত ছড়িয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের আগে আমরা তা এমন ক'রে জানিনি—ভারতচন্দ্র কি ঈশ্বর গুপ্তের মিল রবীন্দ্রনাথের তুলনায় ছেলেখেলা। এই ঐশ্বর্যের যথার্থ ব্যবহার বাঙালি কবিরা নিশ্চয়ই করবেন, আমাদের কাব্যে যুগ্ম-মিলই প্রধান থাকবে। ইংরেজিতে যুগ্ম-মিলে কবিতার সুর হালকা হ'য়ে যায়, বাংলায় তা হয় না, বাংলায় গাম্ভীর্যের সঙ্গে তার বিরোধ নেই, তাই আমাদের কাব্যে তার ব্যাপক ব্যবহার হ'তে বাধ্য। আমার বক্তব্য শুধু এই যে মিলটাকেই যেন প্রাধান্য না-দেয়া হয়, মিলের খাতিরে কবিত্বকে খর্ব করা না হয় যেন, যা বাংলা কবিতায় অনেক সময় হ'য়ে থাকে। একস্বরের মিল যে খারাপ মিল, সেটা যাঁরা ব্যবহার করেন তাঁরা যে অবশ্যতই অক্ষম কবি, এই সংস্কারের উচ্ছেদ আমি কামনা করি। এর পিছনে অভ্যাসের জড়িমা ছাড়া আর-কিছু নেই। আসলে একস্বরের মিল শ্রুতিকটু মোটেও নয়, দৃষ্টিকটুমাত্র। কবিতার পাঠকদের আমি এই অনুরোধ জানাই তাঁরা যেন চোখের চাইতে কানের ব্যবহার বেশি করেন, তাহ'লে আশা করা যায় কিছুদিন পরে একমাত্রার মিল চোখেও আর বাধবে না, কান তার যথার্থ মূল্য দিতে শিখলে চোখ আপনিই মেনে নেবে। যা বলতে চাই ঠিক সেই কথাটি বলবো, সবচেয়ে স্বাভাবিক ও পরিচ্ছন্নভাবে বলবো, কবিদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এ-ই। তার জন্য যদি একমাত্রার মিল আনতে হয়, আনবো একমাত্রার মিল। যুগ্ম-মিল হ'লে ভালো, কিন্তু তার খাতিরে যদি বক্তব্যকে খর্ব কি কবিত্বকে ক্ষুণ্ণ করতে হয়, কি কোনো নীরস অসুন্দর কথা বসাতে হয়, তাহ'লে মোহগ্রস্ত হ'য়ে যুগ্ম-মিল আঁকড়ে প'ড়ে থাকবো না, কেননা ভালো কবিতা লেখাই আমাদের উদ্দেশ্য, ভালো মিল দেয়া নয়। এ-প্রসঙ্গে এটাও ভাববার যে সমস্ত 'কাব্যিক' শব্দ ও একই কথার বিভিন্ন আভিধানিক প্রতিশব্দ বর্জন ক'রে চলতে হ'লে আমাদের ব্যবহার্য শব্দসংখ্যা অনেকটা ক'মে যাবে, এবং সেই অনুপাতে অধিগম্য যুগ্ম-মিলের সংখ্যাও কমবে, তখন একমাত্রার মিলকে গ্রহণ না-করলে বোধ হয় চলবেই না। আমার মনে হয় আজকের দিনে 'হিয়া' 'দেখিবারে' কি 'হনু' দিয়ে মিল দেবার চাইতে একস্বরের মিল শতগুণে ভালো, এমন কি মিল না-দেয়াও ভালো।

'দময়ন্তী'তে একমাত্রার মিল আমি ব্যবহার করেছি। খুব বেশি না ; কিন্তু সমালোচকের চোখে পড়বে। তাঁদের জানাতে চাই যে ঐ মিলগুলো

ইচ্ছে ক'রেই দেয়া হয়েছে। এড়িয়ে যেতে না পারতুম এমন নয়, কিন্তু সে-জন্য যে-মারপ্যাঁচ করতে হ'তো তাতে কবিতাটি নষ্ট হ'তো। যা বলতে চাচ্ছি বলা হ'তো না। তাছাড়া কেউ কি সত্যি-সত্যি বলবেন যে

উচ্চকিত উচ্চস্বর ক্ষীণ হ'লো; দিন মরে ধুঁকে,
অন্ধকার শতছিদ্র একছন্দা তন্দ্রা-আনা ডাকে—

এখানে মিলের জন্য তাঁর উপভোগে কোনো ব্যাঘাত হয়েছে? মনে করুন যদি লিখতুম

উচ্চকিত উচ্চতান, ক্ষীণ হ'লো; দিন মরে ঝুরে,
অন্ধকার শতছিদ্র একছন্দা তন্দ্রা-আনা সুরে—

তাহ'লে ডবল-মিলও হ'তো, বেশি 'কাব্যিক'ও হ'তো, কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে কোনটি ভালো তার বিচার পাঠকই করবেন।

কোনো থিওরি ক'রে কবিতা লেখা যায় না এ অতি পুরোনো কথা। যে-কোনো কবি যে-কোনো থিওরিই করুন নিজেই তা লঙ্ঘন করবেন, করতে বাধ্য। এই প্রবন্ধের গোড়ার দিকে যে-অনুশাসনগুলি লিপিবদ্ধ করেছি সে-সম্বন্ধেও এই কথা। অক্ষরে-অক্ষরে পালনের কথা ওঠে না, মোটামুটি একটা দিক্‌নির্ণয়ের আভাস হিসেবেই ওটা নিতে হবে। শুধু আমার একলার কথা নয়, বাংলা পদ্যের ও কবিতার নতুন একটা পরিণতির পথ এদিকে খোলা আছে ব'লে আমি বিশ্বাস করি। আমি নিজে 'কাব্যিক' শব্দের বিরোধী হ'য়েও হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে একটা কবিতায় লিখে ফেলেছিলুম:

প্রাণে মোর আনো তব বাণী, গানে মোর আনো তব সুর।

এ-কবিতা প'ড়ে অন্নদাশঙ্কর আমাকে লিখেছিলেন, 'শেষটায় আপনিও মোর লিখলেন!' না-লিখতে পারলেই খুশি হতুম বইকি। কিন্তু এখানে মোর আর তব বাদ দিতে গেলে কবিতার ছন্দ, সুর, ভাষাবিন্যাস সমস্তই বদলে ফেলতে হয়, তার মানে এ-কবিতাটি আর লেখাই হয় না, অন্য কবিতা লিখতে হয়। লেখা কবিতার চাইতে না-লেখা কবিতা যে ভালো নয় তার কোনো প্রমাণ নেই, কিন্তু কবিমাত্রেই জানেন যে কবিতার রূপকল্প একটা বাইরের জিনিস নয়, অন্তরের আবেগ থেকেই তার ছন্দ, সুর ও ভাষা গ'ড়ে ওঠে। মোটামুটি কথাটাকে তাহ'লে এ-ভাবে বলা যাক যে 'কাব্যিক' ভাষা যতদূর সম্ভব এড়িয়েই চলতে হবে, কিন্তু যদি কখনো আন্তরিক

ভাববেগের প্রেরণায় দু' একটা কথা অনিবার্যভাবে এসেই পড়ে, তাহ'লে শুদ্ধু সেইটে এড়াবার জন্য কবিতার স্বতঃস্ফূর্ত সহজ রূপটিকে নষ্ট না-ক'রে, কিংবা সমস্ত কবিতাটিই বর্জন না-ক'রে বরং সেটাকে সহ্য করাই ভালো। কবিতা সম্বন্ধে কোনো আঁটোসাটো ধরাবাঁধা আইনকানুন কোনোদিনই সম্ভব নয়, সবই মোটামুটির ব্যাপার। এবং এই প্রবন্ধের উপসংহারে এ-কথাও স্মরণ করি যে সব থিওরিই ক্ষণস্থায়ী, শেষ পর্যন্ত যা টেঁকে তা কবিতার প্রাণবস্তু, যা সকল থিওরিকে অতিক্রম ক'রে যায়।

সমালোচকের জল্পনা

অমিয় চক্রবর্তী

পরিচয়

পরিচয়ের কাজটাকে বাদ দেওয়া চলে না। লোকটি কে হে?—যদি বলা যায় তাঁর জামার বোতামটা অসহ্য; তাঁর পিসীমা ভালো লোক নয়; তাঁর চোখের শূন্য দৃষ্টিতে,—"শূন্য" অর্থে চার্ব্বাকদর্শনের......; বিশ্বস্তসূত্রে জেনেচি পর্শুদিন তিনি স্বপ্নে তিনটে ফ্রয়েডিয়ন্ ঘোড়াকে......; তাহলে প্রশ্নটা শূন্যেই থেকে গেল। তথ্যের তির্যক্ চাইনি, তত্ত্বও নয়, তাঁর পরিচয় চেয়েছিলাম। আমি যে তাঁকে চিনিই না। অমুক বাবুর প্রসঙ্গে যদি প্রথমেই জানাও তিনি "প্ররোহ" কথাটা ক-বার ব্যবহার করেচেন তাহলে জ্ঞানাঞ্জন শলাকা ব্যর্থ হবে। রিপোর্টর-বৃত্তির খণ্ডবিজ্ঞান ভয়াবহ, তারই ছোঁওয়া সর্বত্র দেখ্‌তে পাই। ভদ্রলোকটি সাড়ে বত্রিশ ভাজা খান কিনা, তাঁর বাড়ি কোন্ বস্তির পাশে, চা-বাগানে কত সুদ পান্ এর মধ্যে বিশেষজ্ঞের বিশেষ অজ্ঞতার সন্ধান মেলে। সৌখীন শিল্পরসিক আশ্চর্য সমাচার দিলেন, জানোনা?—আসল খবর দিচ্চি। ওঁর নাকটা মোটেই রোমান্ নয়—দেশী তিলপুষ্পের সঙ্গেও মিল্‌চে না—সব ফাঁকি; আর ওঁর পায়ের গোড়ালির সাইজ্ প্রাচীন গুয়াটিমালার গুহাচিত্রের......। অন্ধের হস্তীদর্শনের মতো হোলো। কাকে বোঝাই পরিচয় মেলে নি। চেনার পর্বে অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাও দুর্নৈতিক, নিরর্থক। এমন কি অমুকের পলিটিক্সও মগজে মজ্‌ল না; তাঁকে সামাজিক তৌল ক'রেই বা কেন দেখ্‌ব। আমাকে তাঁর পাণ্ডার নাম বোলোনা।

অথচ লোকটিকে চিন্‌লে এর অনেক কিছুই চাই। দর্শন বিজ্ঞান লোকতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব কোনোটাই দোষ করে নি। নূতন বই চেনাবার বেলাতে তাই। নানা প্রসঙ্গেই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠ্‌তে বাধা নেই, কিন্তু পরিচয়ের সুরটুকু ধরাও। সেই দায়িত্বটা সমালোচকের, যেহেতু আমি বইটা পড়ি নি, তিনি পড়েচেন। মন্তব্যের কেন্দ্রে বইয়ের চেহারা ফুটিয়ে তোলা সংবেদনশীল কলমের সাধ্য; সেই লেখনী যাঁর আছে তাঁকেই বল্‌ব আশ্চর্য্যো বক্তা, অর্থাৎ খাঁটি রিভিউ-লেখক।

সদ্য বইয়ের সমালোচনায় আমরা পনেরো আনা অলগ্ন তর্ক চাপিয়ে, বিসদৃশ তুলনা এবং অস্বচ্ছ সংজ্ঞার আড়ালে আলোচ্য গ্রন্থকে চাপা দিই। বৌদ্ধশাস্ত্রে যাকে বলা হয়েচে গ্রন্থবিস্তার, অর্থাৎ বাক্‌-বাহুল্য। কাগজের দাম বেড়ে তাহলে ভালোই হোলো। অত্যুচ্চ আমি-র স্তূপে দাঁড়িয়ে বিশেষণ্‌ প্রয়োগকেই বা কোন্‌ জাতীয় সমালোচনা বল্‌বে? অবশ্য একরকমের কৌশলী লেখা আছে, তাতে নিজেকে নিয়ে রহস্য করতে বা সোজাসুজি নিজের কথা বল্‌তে বাধা নেই, আত্মগোপনেরও একটি পন্থা ঐ; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তা নয়। ছাপার ভুলকে বলি মুদ্রাযন্ত্রের দোষ, এর নাম হচ্চে মুদ্রা দোষ। আমি বল্‌চি, আমাদের অভ্রান্ত মত, আমার গুরু বলেচেন, আমি, আমি। যিনি লিখচেন তিনি নিজেরই কথা লিখচেন সে-কথা না লিখ্‌লেও চল্‌ত। যে-বইয়ের কথা লেখা হচ্চে তারও বিষয়ে জানা দরকার। সমালোচকের দৃষ্টি তাঁর দর্শিতের মধ্যে চারিয়ে যাবেই; তাতে পাঠকের দ্বিগুণ লাভ। তাঁর চোখে দেখ্‌ব ব'লেই তো ভিড় ঠেলে আসি। সশরীরে তাঁর আমি দাঁড়িয়ে থাক্‌লে দৃশ্যের ব্যাঘাত হয়। পরিচয়দাতার এও একটা স্মর্তব্য।

এখানে বলা উদ্দেশ্য নয় যে সমালোচককে পরিচয় ঘটানোর রীত-রক্ষা করতেই হবে। রীতিটা তাঁরই স্বকীয় হোক্‌। কিন্তু চেহারা ফুটিয়ে তোলার দায়িত্ব ত্যাজ্য নয়, তারই অভাবে আমাদের গ্রন্থবিচারে অবাস্তবতা ঘট্‌চে। যেমন অতিবাস্তবতা ঘটচে সস্তা পারস্পরিক সমালোচনার নিম্নক্ষেত্রে; ব্যক্তিগত চর্চায় ব্যক্তিকে হারানো। কোনোটাই বাস্তব নয়।

সৃষ্টির পরিচয়সৃষ্টি করতে যে-বিশেষ প্রসাদগুণ চাই তাকে বল্‌ব সমালোচনার পরিচয়শিল্প।

গাড়িতে সেদিন ভদ্রেশ্বর পার হয়ে একটু বৃষ্টি নাম্‌ল। সেই খঞ্জ বৈষ্ণব ছেলেটি পয়সার ভাঁড় এক হাতে তুলে ভাঙা তারস্বরে গান ধ'রেচে—লোহার

চাকার চল্‌চে খটাখট্‌ বোল—ওরি মধ্যে ডেলি প্যাসেঞ্জরদের মনে আমেজ লাগ্‌ল। কে একজন সিনেমার গল্প জুড়েছিল, একদিকে চুল-চেরা তর্ক চল্‌ছিল হাওড়ার নতুন ব্রিজের নিক্তির হিসাব-মেলানো দাম নিয়ে। বই-পড়িয়ে কে একজন বলে উঠ্‌ল, এমন নাটক পাঁচশো বছরে লেখা হয়নি। তার ইস্কাবনের টেক্কাটা হাতেই রয়ে গেল, তুরুপ করা হোলোনা; দেখা যাচ্চে নাটকটা নিয়ে সে খামকা লড়তে প্রস্তুত। কিসের বই? কার বই?—তাসের আড্ডায় পাঁচজনের প্রশ্নের উত্তরে এইটুকু শুন্‌তে পাওয়া গেল লেখাটা নিশ্চয় ভালো, নিশ্চয়তম ভালো। সরিৎ বাবু খানিকটা জানতেন, তিনি মাথা নেড়ে রায় দিলেন সপ্লাই ডিপার্টমেণ্টের ট্রামে-চড়া মেয়েদের আর বর্মার কী একটা কাণ্ড নিয়ে আধুনিক সাম্যবাদী তর্ক জুড়লেই কি বই হয়।—আরেকজন চটে উঠে বল্‌লেন, কেন মশায়, বর্মা-ফেরৎ চৌধুরী পরিবারের কথাটা কি পড়েননি মশায়; প্রোম্‌ পেরিয়ে জঙ্গলের বর্ণনাই বা কি কম, সাংঘাতিক বর্ণনা, সাংঘাতিক। আলিপুরের উকীল একজন চুপ ক'রে বসেছিলেন তিনি গল্পটার মূল তত্ত্ব এবং গভীর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কী বোঝালেন কেউ বুঝতে পারলাম না। গুছিয়ে মোট কথাটা ধরিয়ে দেবার ক্ষমতা ছিল কেবল ঐ ফর্স্ট্‌-এড্‌ কেন্দ্রের মুখচোরা ছেলেটির। অল্প বাক্যে সে পরিচ্ছন্ন এমন একটি চেহারা এঁকে দিল; আজকের কলকাতায় নানাদেশীয়ের সমাগমে অচেনা হাওয়া, তারো চেয়ে নূতন আবহাওয়া যা কর্মনিষ্ঠ ছেলে-মেয়েদের মনে জাগ্‌ল; সপ্লাই বিভাগের মেয়েটি শুনেছিল কোন্‌ ডাক, নিরাশ্রিত রুদ্ধকণ্ঠ বর্মা-ফেরৎ নরনারীদের কণ্ঠে। সেই তার মেটেবুরুজে সকালে এবং সন্ধ্যায় কাজ; সারাদিন আপিসের পরে রাত্রে কুপির আলো নিয়ে ইভাকুয়ী ক্যাম্পে ঘোরা; টিনের ঘরটায়—পাশেই প্রকাণ্ড কালো বটগাছ—হাজার শায়িত যাত্রীর মধ্যে চৌধুরী ঠাকুরাণীর সঙ্গে আলাপ। সুতোর সঙ্গে সুতো বাঁধা; বর্দ্ধমানের কমলা চৌধুরীর প্রাচীন ভিটেয় তাঁর সঙ্গে গেল মেয়েটি; শনিবার দুপুরে নাম্‌ল ঝড়; বোমা-পড়া কলকাতার সমস্ত ভিড়টা কি জমেচে রাত্রের হাওড়ায়, হেঁটে আস্‌তে হোলো বালিগঞ্জ পর্যন্ত। রাস্তায় এতগুলো চায়ের দোকান হয়েচে এই ক-মাসে, সৈন্যরা কি সব সময়েই খাচ্চে—অবশ্য একই লোকরা নয়—ভয়ে ভয়ে একটা রেস্তরাঁয় ঢুকে লেমনেড্‌ চাইল। তৃষ্ণায় গলা কাঠ হয়েচে। হঠাৎ এক সময়ে কী এক জটলা, গোলমাল, দুজন শিখ, চারজন সৈনিক—তাড়াতাড়ি দাম চুকিয়ে, আধ গেলাস খেয়েই সে উঠে পড়ল।

ভদ্র একটি মার্কিন কর্মচারী এগিয়ে এসে বললেন আপনাকে খানিকটা পৌঁছে দেব। এল্‌গিন রোড পর্যন্ত গেলেন—এর মধ্যে বোমা, বর্মা, বিমানবিহারী অভিজ্ঞতার কিছু বল্‌লেন। পূর্বে ছিলেন প্রোম্‌-এরই কাছে খনিজ কারখানায়। প্রোম্‌? কথায় কথায় বেরোল চৌধুরীদের কথা। কমলা চৌধুরীর একমাত্র ছেলে—যার ষ্টীমার কোম্পানীর মাথায় দুপক্ষেরই বোমা পড়েচে—তার শেষ খোঁজ দিলেন। চিন্‌দুয়িন্‌-এর ধারে তাকে দেখেচেন, সঙ্গে তার বর্মীয় বন্ধুটিও ছিল, সেই বন্ধুটির ছোটো ছেলেটা কাছেই জঙ্গলে মারা গেছে, সাতদিন হেঁটে বৃষ্টিতে ভিজে আর পারেনি। নাটকের শেষাঙ্কে কিছু রোমান্স্‌ আছে, চৌধুরী ছেলেটি "কালো রাস্তায়" হেঁটে ডিমাপুর পৌঁছল, কলকাতায় তার আগমনীর অশ্রুত সানাইয়ের সঙ্গে বেজে উঠ্‌ল জন-আন্দোলনের প্রচণ্ড ঐকতান। ডকে জেটিতে লক্ষ মজুর বেরিয়ে এসেচে—উষনা—যার নামে নাটিকারও নাম—নারীবাহিনীর সঙ্গে এগিয়ে চলেচে। ভাঙা বর্মা—প্রলয় কলকাতা—নূতন বাংলার অগণ্য বুকে লেগেচে যুদ্ধজয়ী স্বাধীন চীন রাশিয়ার ঢেউ—থরথর করচে সহর—উঠচে নিশান……এদিকে চলন্ত ট্রেনের জান্‌লায় বৃষ্টি থেমে গেছে, লিলুয়ার লোহালক্কড়ের উপর রোদ পড়েচে।—দূরে কলকাতার ধোঁয়াটে অদৃশ্য প্রকাণ্ড আকাশ। যেন এরি মধ্যে তার বিশেষ গন্ধটা নাকে এসে ঠেক্‌ল। গাড়ির মধ্যে অন্তত তিন জন লোক ঠিক করেচে ঐ বর্মাই নাটকটা কিন্‌ব: বাঁশতলা স্পোর্টিং ক্লাবের দুটি যুবক, হাওড়ার রেলোয়ে আপিসে তাদের চাকরি, চাঁদা তুলে বইটা আনাবার ফন্দি এঁটেচে। কুঞ্জেশ্বর বাবু অভিনয় করাবার কথা ভাবচেন, থিয়েটরের সখ।

বর্ণনায় ব্যঞ্জনায় আলোচনায় সমালোচনা। নাটকটির পরিচয় দিতে ছেলেটির পনেরো মিনিটও লাগেনি। কিন্তু তার চোখের তেজে ছিল তীক্ষ্ণ মন্তব্য, গলার আওয়াজে দরদ, কথার চয়নে এবং ভঙ্গীতে নিজত্ব। যদি লিখ্‌তে পারত হোতো ভালো রিভিউ-লিখিয়ে।

(২)

ব্যবহার

পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারের সূত্রপাত। দু এক মিনিট কথা ক'য়েই প্রচলিত কুশল সংবাদ ফুরোয়——কুশল নেবার বিধিটা সুন্দর এবং প্রশস্ত——তখন আপনা হতে সুরু হয় মনের বিনিময়, সম্বন্ধ বিচার।

অমুকবাবু বা অমুক গ্রন্থের সমালোচক যদি যাচাই করবার কালে সৌজন্য রাখেন——মৌখিকতায় নয় বল্‌বার ধরণে——তাহলে পৌরুষ ক্ষুণ্ণ হবে না। কুলশীলের বার্তা আমাদের কাছে জরুরি নয়; মন্দাক্রান্তা ছন্দ বা উপমা কালিদাসস্য বজায় রেখে কাব্য বেঁধেচি এই বিনীত অহঙ্কারে নূতন কবি পার পাবেন না; আভিজাত্য স্বকীয়তায়। দেশকালপাত্র, চেহারা, বেশভূষা চালচলন কোনোটাই মনকে এড়ায় না—সব নিয়ে বোঝা যায় নবপরিচিতের ব্যবহার কীরকম। ভেবে দেখ্‌ব তাঁর কথাবার্তার উদ্দেশ্য কী।

কিন্তু স্বকণ্ঠের উদ্দেশ্য ঘোষণায় লোকটির সমস্ত কথা প্রকাশ পায় না; তিনি যা তাই দেখ্‌তে থাকি, সেটা মুখের কথার চেয়ে বেশি। প্রপাগাণ্ডা এইজন্যে আর্টের শত্রু, অত্যন্ত জানাতে চায় কিছু বলা হচ্চে। তাতে বলা হয় কম। যেমন হার্মোনিয়ম বাজিয়ে গান করা: গান না হলেও চলে। আওয়াজই হয় উদ্দেশ্য। কাব্যলোকে উদ্দেশ্যের চেয়েও বড়ো উদ্দেশ আছে, তার দাবি কবিকে মেটাতে হয়। গানের জন্য চাই কত সূক্ষ্ম শ্রুতি, তানপূরার তার, কণ্ঠের ব্যঞ্জনা—কবিতায় বক্তব্যের গভীরে নিয়ে যায় ছন্দ, বাক্যের আভাসিত ঝঙ্কার; সমালোচনায় শিল্পসৃষ্টির পূর্ণ পরিচয় দেওয়া তাই সহজ নয়। এই আয়োজন, এই ভাষণ সমস্তের মধ্য দিয়েই সমালোচনার প্রকাশ, যাকে বলা যায় তার শিল্পব্যবহার। সর্বাঙ্গীণ শিল্পসৃষ্টিকে যিনি কাব্যের অঙ্গে, আঙ্গিকের যোগে দেখ্‌বার সাহায্য করেন তিনিই সমালোচক। বিশেষ কোনো জ্ঞানবিজ্ঞানের কোঠায় বন্দী ক'রে কাব্যশরীরের অখণ্ড প্রাণময় স্বরূপকে বোঝা যায় না। রূপদৃষ্টি চাই। সমালোচনার কাজ সেই দৃষ্টি জাগানো।

কার্য্যকরী কোনো বিশেষ ব্যবহারকে বিশ্লিষ্ট ক'রে কাজ চলে, কিন্তু প্রাণবান সৃষ্টির সমগ্র ইচ্ছার মধ্যে প্রবেশ করবার ব্যগ্রতা মানুষের। তাতে কাজের চেয়ে অধিক। তারি সন্ধানী না হলে কেউ কাব্য পড়ত না, ছবি দেখ্‌ত না, সমালোচনার দপ্তর শূন্য হ'ত। অর্থতত্ত্ব, পরিবেশধর্ম, পরিভাষা প্রত্যেকের মধ্য দিয়েই কাব্যের ইচ্ছায় প্রবেশ করবার পথ খানিকটা খোলে, আরো অনেক দরজা আছে, কিন্তু সম্বন্ধের মানস নিয়ে এগোতে হয়; প্রাণের বোধ নিয়ে। কাব্যের খণ্ড ব্যবহারকে দরদীর মূল্যটুকু দিয়ে শেষে পৌঁছই তার সূক্ষ্ম শিল্পব্যবহারে, তার সত্তায়, যেটি স্বতন্ত্র, সমগ্র, এবং অক্ষিত; ক্ষয়ের সংসারে তাকে নিয়ে কারবার। বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে, বিচার ক'রে, পরীক্ষা ক'রে শিল্পের পূর্ণ ব্যবহারটিকে উদ্‌ঘাটিত করতে হলে সেই মূলের সন্ধানী

হওয়া চাই। আগন্তুক ভদ্রলোককে বন্ধুরূপে জানবার সুযোগ হয়, যখন তাঁকে চিনি; অবশ্য তাঁর ব্যবহার পছন্দ না হলে বন্ধুত্ব করব না। কিন্তু আশু বিদায় দিতে হলেও সমালোচক যেন গৃহস্থের ধর্ম রক্ষা করেন, নিজের ভদ্রতাকেও অবাঞ্ছিত-অতিথির সঙ্গে সঙ্গে বিদায় না দেওয়া ভালো।

শিল্পী কী-ভাবে তাঁর উপাদানগুলি ব্যবহার করতে পেরেচেন? ব্যবহারের এই আরেকটি প্রশ্ন জাগ্‌বে। তাঁর রচনার একদিকে গড়ন, অন্যদিকে মানস; দু'য়ে মিলে দেখা দেয় শিল্পরূপ। কিছু জ্ঞানে, কিছু অজানিতে, নানা ধাতুর দ্রবধারায় তিনি মূর্তি বানিয়েচেন। নানা ভাবনা, নানা রং, চিন্ময় উপকরণ জমা হয়ে থাকে খনিতে; প্রগাঢ় মুহূর্তের প্রেরণায় শিল্পী তাঁর সঞ্চয়নকে আনেন উপরিতলে—প্রেরণা অর্থে সেই দিব্যাগ্নি যাকে জ্বালাবার জন্যে ব'সে থাক্‌লেই চলে না, কাঠ-খড় এবং কৌশল চাই। আগুন জ্বাল্‌বার পরও আগুনের এবং নানান্ ধাতুর ব্যবহার না জান্‌লে কারিগরি হয় না। শিল্পালোচনায় সেই কারিগরির যাচাই হবে; জহুরি শুধু সোনার দাম নয়, মিশ্রণের মনোহারিত্ব যেন বোঝেন। গয়না গড়তে রূপকার বিবিধ নৈপুণ্যের যে-পরিচয় দেন সেইটে আলোচ্য।

শিল্পব্যবহারের এই বিচিত্র শক্তিকে কালিদাস বলেচেন, প্রয়োগবিজ্ঞান। প্রশ্ন করলেন, পেরেচেন কিনা। আমাদের ভাষায় কবি কালিদাসের ব্যবহৃত সংজ্ঞাটিকে সদৃশার্থে বল্‌তে পারি প্রয়োগশিল্প। যাতে রচনার নির্মিতি এবং রূপমানস দুয়েরই যোগ। সৃষ্টির কাজে দ্রব্যগুণবিচার ও ব্যবহারের দ্বারা আর্টিস্ট্ কীভাবে তাঁর ধারণাকে রূপে সঙ্গত করেন সে-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আজ আমাদের ব্যাপকতর হয়েচে। সৃজনশীল বহুদেশীয় সাক্ষ্যের মধ্য দিয়ে প্রয়োগশিল্পের নানাত্ব আমাদের কাছে স্পষ্টতর প্রতীয়মান হোলো অথচ তার আন্তরিক ঐক্যরহস্যও বৃহত্তর ভূমিকায় দেখা দিয়েচে। নূতন রচনাপ্রণালীর উদ্ভাবনাও থামেনি। সমালোচকের পক্ষে শিল্পব্যবহারের বিচার অনেকটা সূক্ষ্মতর দায়িত্বে পরিণত হয়েচে সন্দেহ নেই।

(৩)

প্রয়োগ

প্রয়োগব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের একটি বিশেষ ঔৎসুক্য দেখা দিয়েচে; সাহিত্যেও তাই নিয়ে তর্ক উঠ্‌ল—সেই প্রসঙ্গে কিছু বল্‌তে চাই। আমাদের যুগ প্রধানপক্ষে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের, যদিও অপব্যবহারের অন্ত নেই। লক্ষ কলের এবং কর্মবিধির যোগে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের উপযোগিতা আমরা

পরীক্ষা করচি। যা মানসী প্রত্যক্ষ তাকে ঘটনায় তর্জমা না ক'রে আমাদের তৃপ্তি নেই। তার কারণ আমরা জানি যা শুভ তার যাথার্থ্য নির্নীত হয় জীবনের প্রাত্যহিকে; উৎকর্ষের মূল্যকে সংসারে না ফলিয়ে কল্যাণের ব্যাখ্যা নিরর্থক। বলা বাহুল্য, বিশুদ্ধ তত্ত্ববিজ্ঞানকে উপেক্ষা করলে জ্ঞানের মূল শুকিয়ে যায়, সেটা আত্মঘাতিক, কিন্তু ধ্বংসের অন্য উপায় সেই বিশুদ্ধিতায় ডুবে মরা। অশুদ্ধ সমাজের সংস্করণে বিদ্যাকে ডাঙায় তুলে আন্‌তে হয়; কল্যাণবিদ্যা উভচরী। চোখের সাম্‌নে দেখচি গণিতশাস্ত্রজ্ঞ অঙ্ক কষ্‌চেন, অন্যদিকে অগণিত মানুষ বেহিসাবী সংসারে মরচে—এর মধ্যে যোগ কোথায়? বাঁচবার প্রত্যেক বিভাগে আঙ্কিক সত্য চাই, কিন্তু তার জন্যে গণনাশক্তিকে প্রাণের কাজে লাগানো দরকার। সভ্যতা অর্থে হিসাবের মিল; আদর্শিক মূল্‌ধনে এবং বাস্তব খরচে একান্ত গরমিল হলে কোনো মহাজন বা মহাজাতি রক্ষা পায় না। মধ্য দিয়ে ব'হে যায় কান্নার জল, সংসার হয় পঙ্কিল, যুগের ঐশ্বর্য যায় ভেসে। দুই বাস্তবকে মানি ব'লেই ধ্যানবস্তু এবং প্রাণবস্তুর মধ্যে জমিটাকে দৃঢ় করতে চাই। যুগের চেতনায় আজ অপ্রযুক্ত সত্যের দাবি অসহ হয়ে উঠ্‌ল; তার এক কারণ, প্রয়োগ সত্যের সাফল্য আমরা চক্ষে দেখেচি ভোগ না করলেও, মানবিক অনুভূতিও আমাদের বেশি। পৃথিবী জোড়া মারীব্যবসায়ের দিনেও এই কথা বল্‌ব। এমন অবস্থায় সাহিত্যক্ষেত্রে এবং সর্বত্র প্রয়োগমূল্য, অর্থাৎ ব্যবহারিক উৎকর্ষের দাবি একান্ত হয়ে উঠবে এতে আশ্চর্য কী।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের প্রশ্নটা সহজতর। কেননা, অভিজ্ঞতাকে ভাষায় ফলানোর কাজই হোলো সাহিত্যের। অভিজ্ঞতার কোনো স্তর, কোনো বার্তাকে ঠেকিয়ে রাখা সাহিত্যের অসাধ্য। সাহিত্যই প্রকাশ। প্রাণপ্রাচুর্যের এবং পরিণতির সন্ধান দেয় সাহিত্য; যে-ভাবেই দিক্ না কেন। কখনো স্বপ্ন দেখিয়ে, নয় স্বপ্ন ভাঙিয়ে। মানুষকে ডাক দেবার জন্যে শিল্পে কত সুর, কত কাছের ডাক, কত দূরের কাম্য; উপায়ের অন্ত নেই। কিন্তু লক্ষ্য একই: মানুষকে অস্তিত্বের সন্ধান দেওয়া। তার স্বত্বকে প্রকাশ করা। সাহিত্যের বড়ো সৃষ্টি হলো বড়োরকমের দৃষ্টি—সংসারকে দেখানো হচ্চে। সেই দৃষ্টিতে আমাদের চোখ খুলে যায়, যাই দেখিনা কেন জীবনকে বিস্তৃত দেখি। শিল্পীর দর্শন আমাদের সঙ্গে না মিল্‌লেও, তিনি নিজেকে নিজের অভিজ্ঞতাকে প্রদর্শন করচেন—তাতে আমাদের অভিজ্ঞতা বাড়বেই। মূল্যকে প্রযুক্ত না ক'রে সাহিত্যের উপায় নেই; সাহিত্যই প্রয়োগ। ভাষার মধ্য

দিয়ে ভাবের প্রয়োগ, নানান্ অভিজ্ঞতার সংযুক্ত প্রয়োগ কল্পনাসৃষ্টিতে; ছন্দোময় একযোগিতা। সাহিত্যের ক্ষেত্রে নূতন উপলব্ধ সত্যের নিশ্চয়বোধকে প্রযুক্ত করা সম্বন্ধে উদ্বেগের যথার্থ কোনো কারণ নেই, কেননা সর্বমানবিক সত্যের প্রয়োগসাধনায় কোনো সত্যকেই বাদ দেওয়া চলে না। সাহিত্যের দিক থেকে কোনো বাধাই নেই।

বাধা আছে সাহিত্যের দেউড়িতে। শিল্পীর সমাজ হয়তো দরোয়ান বসিয়ে মোটরে-আসা দর্শক ব্যতীত অন্যকে ঠেকিঁয়ে রাখতে পারে; শিল্পী নিজেও ব্যক্তিগত বাধা দিতে পারেন। কিন্তু শিল্পপ্রদর্শনীর নিমন্ত্রণ অবারিত, সর্বযুগের সর্বলোকের কাছে। প্রতিবিধান করার কাজটা শিল্প সমালোচনার বহিরঙ্গে করতে হয়। সৃষ্টি-শিল্পের কাছে সমালোচক একটা মাত্র দাবি আন্‌বেন, প্রকাশ করো। প্রকাশ চল্‌তে থাক্। কী প্রকাশ হবে তার দাবি শিল্পের কাছে নয়, শিল্পীর কাছে। সমাজের কাছে। অর্থাৎ সামাজিক মানুষরূপে শিল্পীকে বল্‌তে হবে মানুষের অভিজ্ঞতা তোমার যথার্থ হোক্, সত্য কথা বোলো। তুমি বদ্‌লাও। কবিকে বদ্‌লাতে পারলে কবিতা বদ্‌লাবে, কিন্তু, আর্টের রাজ্যে বিশেষ ফরমাস খাট্‌বে না। কেননা তার কাজ সৃজিত হয়ে ওঠা। কবিতার ভালোমন্দ বিচারে প্রকাশ-শক্তির ভালো মন্দকে মূল্য দেওয়া চাই। প্রকাশশক্তির ভালোমন্দকে মূল্য দেওয়া চাই। যত বড়ো তত্ত্বকথাই ঘোষিত হোক্ না সনেটের চৌদ্দ লাইন, মিল, এবং ভাষা অচল হলে বল্‌ব ভালো সনেট হয় নি, কবিতায় যৌগিক অভাবই ঘটেচে। রাষ্ট্রতন্ত্র বা ধর্মতন্ত্রের খাঁটি প্রয়োগ বিচার হবে খাঁটি প্রকাশের দ্বারা। শিল্পের প্রাণশক্তির পরিচয়েই তার যথার্থ পরিচয়, তার বক্তব্যেরও পরিচয়।

সাহিত্য স্বভাবতই সাম্যধর্মী; আধিকারীভেদ ঘোচানো তার লক্ষ্য—হোক্ দলের, ধর্মের, বা প্রভুপন্থীর—মানুষের অধিকারকে সে ব্যক্ত না করে পারবে না। সত্য বিকৃত হয়ে সাহিত্যে প্রকাশ পেলে সেই বিকৃতিই প্রকাশিত হয়ে পড়ে তাতে ক্ষতি হবার কথা নয়। চেনা যায়। অন্যান্য প্রকাশের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ্‌বার সুযোগ রইল। কোনো প্রকাশকে বন্ধ করা, যদি তা যথার্থ সাহিত্যপর্যায়ী হয়, সাহিত্যের রীতিবিরুদ্ধ। সত্যের বৃহৎ ভূমিকায় বিশেষ শিল্পকাজকে দেখানো সমালোচকের কাজ, আক্রমণের পুলিশবৃত্তি নয়। মানুষের অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করার দায়ে ডিক্টেটরি সমাজকে মার্কা-মারা সাহিত্য বানাতে হয়েচে; এর প্রতিকার করতে গিয়ে

আমরাও যেন স্বদলের মার্কা-মারা সাহিত্য না চেয়ে বসি। তার কোনোটাই সাহিত্য হবে না। আমরা দাবী করব: সব কথা বলো। তাতেই আসল কথা বলা হবে। জোর করতে গেলে নকল কথা বেরোয়।

ব্যবহারবিচারের আরো একটি পর্ব আছে। কীট্‌স্ গ্রীসীয় মৃৎ-পাত্রটিকে তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেচেন এক ভাবে; আমরা তাঁর কবিতার পাত্রটিকে কী ভাবে সামাজিক ব্যবহার করব। তাতে আমাদের সমাজধর্ম প্রকাশ পাবে। সাহিত্যের সংলগ্ন হলেও তার অন্তর্গত সমালোচনার ক্ষেত্র এটা নয়। পুরোনো রূপকথা এবং মন্তব্যের যোগে প্রাচীন কুসংস্কারকে বধ করা চলে; পটে-চিত্রিত শুভ্র মর্মর প্রসাদের দিকে কটাক্ষ ক'রে বলা যায় এরি দিকে চিত্রীর পক্ষপাত কেন। হয়তো ম্যালেরিয়ার মশাতাড়ানোর সৎকাজে সাহানার রৌদ্ররাগিণী বাজিয়ে কর্মীদলকে দশ পা দ্রুত চালানো যাবে———কিন্তু শিল্পকে নিয়ে ব্যবহার-শাস্ত্রের এই অধ্যায়টি সমালোচক অন্যত্র পাঠ করুন। প্রধান কথাটা তিনি যেন সামাজিক উৎসাহে না ভোলেন।

কাব্যের পাত্রে আর যাই থাকুক্, খানিকটা উজ্জ্বল চৈতন্যের রস রাখা থাকে; আশ্চর্য্য এই-যে রসটুকু ফুরোয় না। আর পাত্রটি কী সুন্দর। সেই নিঃসৃত মাধুরী পান করলে নেশা জমে, যাকে আনন্দ বলা হয়; যা আচ্ছন্ন করে না, দহন করে না, প্রাণ বাড়ায়। প্রাণের অধিকার সর্ব প্রাণীর; সেই প্রাণ পরিবেশিত হোক্ অবারিত সাহিত্যের আসরে। যদি আজ এতদিনে নূতন মনুষ্যত্বের দাবি———যেটা মুখ্যত এসেচে সোভিয়েট রাশিয়া থেকে———সাহিত্যের পেয়ালায় প্রাণরস সকলের কাছে পৌঁছিয়ে দেবার আয়োজন করে তাহলে সেই জীবনীধারা উপভোগ ক'রে একটি নূতন বোধন জীবনের মূলে সঞ্চারিত হবে। শিল্পের অনুপ্রেরণা, যা প্রজ্ঞানঘন সনাতন, সনাতনীর বন্ধনমুক্ত হলে নবীন দুঃসাধ্য শিল্পসৃষ্টির পথ খুলে যায়: আজ সেই পথ খুলে যাচ্ছে। কিন্তু সাহিত্যে এই একটি তেজস্ক্রিয় নবীনতা দেখা দিল তার কারণ সমাজের নানা মানুষ এখন সাহিত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠস্বরূপ ভোগ করতে পারচে। পরিবেশনের শুভবিধানকে এর প্রকৃত কারণ বল্‌লে সাহিত্যের দিক থেকে ঠিক জায়গায় মূল্য দেওয়া হয় না।

আধুনিক কাব্যের সমস্যা

(১) বিশ্বাস

আবু সয়ীদ আইয়ুব

সমস্যাটি বিশদ ক'রে বলবার দরকার নেই। সবাই জানেন যে সাম্প্রতিক কবিতায় এসেছে দলগত বিচ্ছেদ, কোনো কোনো স্থলে ব্যক্তিগত নির্জনতা। কবি এবং তার পাঠকের মাঝখানে অবোধ্যতা ও অবেদ্যতার প্রাচীর উঠেছে, সে প্রাচীরের উপর আবার ভাঙা কাঁচ বসানোর চেষ্টা। কবিতার, শুধু কবিতা কেন সমস্ত শিল্পকলারই, জন্ম হয়েছিল ট্রাইবের সম্মিলিত অনুভূতির মধ্যে। সভ্যতার অনিবার্য গতিতে ট্রাইবের আদিম সাম্যতন্ত্র যখন বিভক্ত হল শ্রেণীক সমাজের স্বার্থ-সংঘাতে, তখন সমাজের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র থেকে কবিতার প্রভাব যদিও সঙ্কুচিত হল, তবু শ্রেণীবিশেষের সমষ্টি-চেতনার মধ্যে নিজকে বিকাশ করবার শক্তি সে হারাল না। আজ সে-শক্তিও তার গেছে। বৃহত্তম সংখ্যার জন্য গভীরতম অভিজ্ঞতার প্রকাশ—টল্‌স্টয়কৃত এই শিল্পপ্রতিমাণটিকে অক্ষরে অক্ষরে উল্‌টো সাব্যস্ত করতেই আজকের শিল্পীরা উঠে পড়ে লেগেছেন। অধুনাতন মূল্য-বিচারে শ্রেষ্ঠ শিল্পী সেই যে ক্ষুদ্রতম সংখ্যার কাছে সূক্ষ্মতম কলাকৌশলের বাজি দেখিয়ে থাকে। শতকরা বাকি সাড়ে-নিরেনব্বই জনকে সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না, এবং অতি সূক্ষ্ম টেক্‌নিক যে অতি দক্ষ কলাবিদের কালোয়াতি ছাড়া আরও কিছু ব্যক্ত করতে পারে এটা তার কাছে সেকেলে ঠেকে। লেখক এবং পাঠকের, আঙ্গিক এবং প্রসঙ্গের ব্যবধান দুর্লঙ্ঘ্য থেকে অলঙ্ঘ্য হতে চলেছে। নবীন সাহিত্যিকরা এ-বিষয়ে কী ভাবছেন জানি না, তাঁদের প্রবীণ নিন্দুকরা যে কী ভাবছেন তা সকলেরই জানা। আমার মত যারা সাহিত্যিকও নয়, নিন্দুকও নয়, হতবুদ্ধি পাঠক মাত্র, তাদের দিক থেকেও সমস্যাটা ভেবে দেখার সার্থকতা আছে। ভেবে যে সমস্যার সমাধানে পৌঁছেছি এমন স্পর্দ্ধা রাখবার মত ভয়ঙ্করী অল্পবিদ্যা অবশ্য আমার নেই।

রোম্যান্টিক যুগের আত্মপ্রতিষ্ঠ ও সিদ্ধকাম কবিদের সঙ্গে তুলনা করলে প্রথমেই চোখে পড়ে যে আজকের কবিরা "অগ্রজের অটল বিশ্বাস" হারিয়েছেন। সে-বিশ্বাসের সরলতা জীবনের জটিল পথে তাঁদের সহায় ছিল কি অন্তরায়, দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে খাপ খেত কি খেত না, এসব আপাতত অপ্রাসঙ্গিক। তা ছাড়া এমনতর প্রশ্ন মনে অঙ্কুরিত হওয়া মানেই এই যে বিশ্বাস সেখানে শেকড়শুদ্ধ শুকিয়ে

মরেছে। কোনো তর্ক না তুলেও এটুকু অবশ্য বলা যায় যে সে-বিশ্বাস অগ্রজদের কলাসৃষ্টিকে তাজা ও প্রাণবন্ত ক'রে রেখেছিল। সংশয়ের ঝড় ঝাপটা বুকে ক'রে অকূল সাগর পাড়ি দেওয়ার সর্বনাশা দুঃসাহস দার্শনিকের। স্বাধিকার-প্রমত্ত হিউম্ অনায়াসে বলতে পারেন, "I am like a man, who having struck on many shoals, and having narrowly escaped shipwreck in passing a small frith, has yet the temerity to put out to sea in the same leaking weather-beaten vessel, and even carries his ambition so far as to think of compassing the globe under these disadvantageous circumstances." শিল্পসৃষ্টির পক্ষে এ-অবস্থাটা কিন্তু অনুকূল নয়। একেবারে অবিশ্বাসী মন যে একেবারে ফ্যাকাসে মন, রঙে রূপে ইন্দ্রজাল বুনবার শক্তি তার নেই। বিশ্বাসে মিলয় কৃষ্ণ কি না সে-বিষয়ে কোনো রকম উচ্চবাচ্য করা আমার মত অহিন্দু আর অভক্তের মুখে মানায় না, কিন্তু বিশ্বাসে যে কৃষ্ণের বাঁশি মিলয় কাব্যের ইতিহাসে তার প্রমাণের অভাব নেই। সুধীন্দ্র দত্ত লিখেছেন—

> ঘুণ-ধরা হাড়ে যেন লাগে
> উঞ্ছ-পুষ্ট জ্যেষ্ঠদের তৈলসিক্ত মেদ।

এটা হল অভিমানের কথা। "জ্যেষ্ঠ"দের উপর যতই রাগ হোক, আর ব্যঙ্গোক্তিটাতে যতই শান দেওয়া হোক, এই আত্মচেতন কবি স্বীকার না ক'রে পারেন নি যে তাঁর সমসাময়িকদের কবিতায় ঘুণ ধরেছে।

ইংরেজি সাহিত্যের পটে সংশয়ের ছায়া পড়ল অনেক দিন আগেই, ১৯ শতকের মাঝামাঝি। টেনিসন আর আর্নল্‌ডের কবিতায় তার বিক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছিল। এ দুজন কবির মনীষা ও চারিত্র্য কিন্তু মূলত আস্তিক, শৈশব-শিক্ষার গুণে, দেশকালের চাপে আস্তিক না হয়ে তাঁদের উপায় ছিল না। সে-আস্তিকতার সমতল ভূমিতে মাঝে মাঝে সন্দেহের পাথর উঁচিয়ে উঠেছে, মাঝে মাঝে নৈরাশ্যবাদের ফাটল ধরেছে, তাতে ক'রে মেঝেটা জখম হয়েছে কিন্তু একেবারে চৌচির হয়ে যায় নি, এবং তার উপর বিশ্বনিরীক্ষার যে-ইমারতটি খাড়া ছিল তা পড়ি পড়ি করেও শেষ পর্যন্ত টিকে রইল। আর্নল্‌ড যদিও দেখলেন বিশ্বাসের সপ্ত সাগর যাচ্ছে শুকিয়ে, শুনতে পেলেন ধাবমান তরঙ্গের ক্ষীণ ক্লান্ত গর্জন—

Retreating, to the breath
Of the night wind, down the vast edges drear
And naked shingles of the world.

কিন্তু হারানো বিশ্বাসের অসীম সমুদ্র যতই তলিয়ে যাক, কবির অন্তর তার অদৃশ্য তটরেখার নাগাল পায়, কখনো বা "রাত্রির তারাভরা নিস্তব্ধতায় দূরাগত মৃদু মর্মরধ্বনি কানে এসে বাজে", বিষাদের গুরুভার মুহূর্তের জন্য হালকা হয়ে যায়। টেনিসন্ অন্তরতম বন্ধু হালামের অকালমৃত্যুতে আত্মহারা হয়ে যদি বা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ভাবলেন

A monster then, a dream,
A discord. Dragons of the prime
That tear each other in their slime—

কিন্তু শোকের তীব্রতা উপশমিত হলে তাঁর দুঃস্বপ্ন গেল কেটে, স্মারণিক কাব্যের শেষ স্তবকে তিনি নিঃসংসয়ে জানলেন যে যাবতীয় সৃষ্টি ছুটে চলেছে এক পরমার্থ দিব্যধামের অভিমুখে, যেখানে আছে প্রেম এবং প্রেমের ঈশ্বর এবং সে-ঈশ্বরের শাশ্বত সুন্দর বিধান। এই জ্যেষ্ঠ কবিদ্বয়ের কাব্যময় ভঙ্গুর নাস্তিকতার সঙ্গে আধুনিকদের রূঢ় নিরেট নাস্তিকতার কোনো তুলনা হয় না।

আধুনিক য়ুরোপের সব চেয়ে বড় কীর্তি হচ্ছে প্রাকৃত বিজ্ঞান, এবং প্রাকৃত বিজ্ঞানের সব চেয়ে বড় সাফল্য ঘটেছিল সেই সপ্তদশ শতকে যাকে প্রতিভার শতক বলে অভিহিত করা হয়। স্বভাবতই প্রতিভা প্রায় সব কটাই বৈজ্ঞানিক। অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে দেখা গেল যে এই নব বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা নির্দ্বন্দ্ব, এবং এতদূর সর্বোময় যে নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক চিত্তেও এক ধরণের বৈজ্ঞানিক মনোভাব পরিস্রুত হয়ে পড়েছে। সে-মনোভাবের গোড়ার কথা এই যে জড়প্রকৃতি জীবজগৎ মানবসমাজ সর্বত্রই এক অখণ্ড নিয়মের রাজ্য, সমস্তই সুবিন্যস্ত ও সুসজ্জিত। সেই সজ্জাই যেন তখনকার আর্টে বর্তেছে, বিষয়বস্তুকে করেছে কেতাদুরস্ত, আঙ্গিক হয়েছে ছাঁচে ঢালাই-করা এবং প্রথাসম্মত। এই বৈজ্ঞানিক মনোভাবকে পদার্থবিজ্ঞানের ফল না বলে তার মূল বলাই সঙ্গত। হিউমের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে বেরিয়ে পড়ল যে প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতায় বিশ্বাস বিশুদ্ধ যুক্তির সূত্র ধরে প্রমাণিত হয় না, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়ও তার কোনো ভিত্তি নেই। ওটা বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত নয়, স্বীকার্য (postulate) মাত্র। ওয়াইট্‌হেড্ মনে করেন এ-বিশ্বাস মধ্যযুগীয় ভগবৎ-বিশ্বাসেরই রূপভেদ, যুগধর্মের তাগিদে

পরলোক থেকে ইহলোকে নেবে এসেছে মাত্র। সে যাই হোক, অষ্টাদশ শতকের ক্লাসিকাল সাহিত্যেও দেখা যায় এই বিশ্বাসের মৌল প্রেরণা। এরই মাপাজোখা বাঁধাছাঁদা তালকে আশ্রয় ক'রে সে-সাহিত্যের ধ্রুপদী চাল সম্ভব হয়েছিল। অভিজ্ঞতা বা যুক্তির ভূমিতে এ-বিশ্বাসের ভিত্তিহীনতা প্রতিপন্ন করলেও হিউম তাকে টলাতে পারলেন না শিক্ষিত সাধারণের চিত্ত থেকে, নববিজ্ঞানের প্রখর সাফল্য তখন চোখে ধাঁধা লাগিয়াছিল। হিউমের ভূত কিন্তু বিজ্ঞানের কাঁধে চেপেই রইল। ১৯ শতকের গোড়াতে যখন, কতকটা অভ্যাসের ফলে, কতকটা হিউম্-কাণ্টের তীব্র ঘাত-প্রতিঘাতের প্রতিক্রিয়ায়, বিজ্ঞানের চোখ-ধাঁধানো ঔজ্জ্বল্য ক্ষীণ হয়ে এসেছে, রোম্যাণ্টিক ভাবালুতার প্রবল বন্যা তাকে পাশ কাটিয়ে সাহিত্যকে অন্য খাদে বইয়ে নিয়ে গেল। বিংশ শতাব্দীতে বের্গস দুর্বিনীত বিজ্ঞান-মানসিকতাকে শায়েস্তা করলেন আর এক দিক থেকে, প্রাণ এবং মনের ক্ষেত্রে গাণিতিক-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির নিরেট ব্যর্থতার ঢাক পিটে। আরো কয়েক বছর পরে এলেন এডিংটনের মতন আত্মশুদ্ধিপরায়ণ পদার্থবিৎ, ফলে পদার্থবিজ্ঞান তার বহু-বিস্তৃত নিয়মানুবর্তিতার সীমানাকে নিজের তরফ থেকে এবং নিজের গরজেই গুটিয়ে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। প্রকৃতির অখণ্ড যন্ত্ররূপকে এখন বৈজ্ঞানিকরা স্বয়ং অবিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছেন। সাহিত্যিকরা তো ১৯ শতকেই তার কায়েমী স্বত্বের বিরুদ্ধে নালিশ জুড়েছিলেন, এবার তাকে সাহিত্যের এলাকা থেকে সম্পূর্ণ বেদখল করা হল।

রোম্যাণ্টিসেজ্‌মের পেছনে ছিল স্বভাবচালিত মানুষের, অর্থাৎ আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্রের কৃত্রিমতা থেকে শৃঙ্খলমুক্ত মানুষের শুভবুদ্ধি ও সদিচ্ছার উপর আস্থা। অষ্টাদশ শতাব্দীর ধনবৈজ্ঞানিকরা অবশ্য আগেই দেখিয়াছিলেন যে মানুষের মূল-প্রবর্তনা হচ্ছে স্বার্থসিদ্ধি, পরহিতৈষনা নয়। তবে ধ'রে নেওয়া হয়েছিল যে নতুন সমাজব্যবস্থা যদি সামন্ততান্ত্রিক সমস্ত বাধাবিঘ্ন সরিয়ে ফেলে মানুষমাত্রেরই অর্থলাভের পথকে সুগম ক'রে দেয়, তা হলে প্রত্যেকের স্বার্থসন্ধানের ফল হবে এই যে প্রত্যেকেই নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রকৃতিদত্ত দাবী মিটিয়ে নিতে পারবে, নালিশের কোথাও কোনো কারণ অবশিষ্ট থাকবে না। এ-ভুল ভাঙল অল্পদিনে এবং নিদারুণ ভাবে। রোম্যাণ্টিক সাহিত্য যখন প্রকৃতি ও মানব-বন্দনায় কলগুঞ্জরিত, সেই সময়ে ইংলণ্ডে দেখা দিল বড় বড় কল-কারখানা, দেখতে দেখতে দেশটাকে ছেয়ে ফেলল। দেশের ধনসম্পদ মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে গিয়ে আটকা

পড়ল, বাদ বাকি পনেরো আনা লোক একমুঠো অন্নের জন্য তাদের শেষ সম্বল শ্রমশক্তি বেচে ফেলে ক্রীতদাসের অধম হল। ১৫-১৬ ঘণ্টা ক'রে খাটিয়ে ঠিক কয় ছটাক ক'রে খেতে দিলে এবং কয় মিনিট ক'রে জিরুতে দিলে ধড়ে প্রাণটা থাকে——অনেকখানি হিসেবী বুদ্ধি খরচ ক'রে, কারখানার মালিকেরা তার নিখুঁৎ ব্যবস্থা করলেন। 'যে যার পথ দেখবে' নীতির এই ভয়াবহ পরিণাম লক্ষ্য ক'রে মহদাশয় ব্যক্তিরা বিচলিত হলেন কিন্তু মনুষ্যধর্মে বিশ্বাস হারালেন না। মরিস্, ওএন্ প্রভৃতি রামরাজ্যের প্রত্যাশীরা ঠাহর করলেন যে আর কিছু নয় এখন দরকার শুধু সর্বগ্রাহ্য একটি আদর্শ উদ্ভাবন করা, এবং সবাইকে সমঝিয়ে দেওয়া সমাজ ও রাষ্ট্রকে সর্বজনের কল্যাণে নিয়োগ করবার পুঙ্খানুপুঙ্খ উপায়টা কী। আদর্শ উদভাবিত হল, উৎসাহী ব্যক্তিরা উপায়ের ব্যাখ্যা ও প্রচারে মেতে উঠলেন। সে প্রচার কেন ব্যর্থ হল, এবং শ্রেণীস্বার্থের সংঘাতে কেন তা বারে বারে ব্যর্থ হতে বাধ্য—এই হল মার্ক্সিজ্‌মের গোড়ার কথা। মানবতন্ত্রবাদ অনেক দিন যাবৎ ভাবুক ও কর্মীর কল্পনাকে রঙিন ক'রে রেখেছিল, ঐতিহাসিক জড়বাদের মধ্যে তার অবসান ঘটল। মার্ক্স যদিও ইচ্ছাশক্তিকে একেবারে উড়িয়ে দেন নি, তবু তাঁর জড়বাদে সে-ইচ্ছার স্থান অত্যন্ত সংকীর্ণ, ধনবিজ্ঞানের অন্ধ অব্যর্থ বিধানগুলিই সেখানে মৌলিক ও চরম। মানুষের শুভ সঙ্কল্প কোনো সামাজিক বিপ্লব বা বিবর্তন উদ্রিক্ত করতে পারে না, প্রতিহতও করতে পারে না, বড় জোর পারে শুধু তার গতি শ্লথ বা দ্রুত ক'রে দিতে। অথবা মার্ক্স-এঙ্গেল্‌সের কথাটাকে এই ভাবেও নেওয়া যেতে পারে যে আমাদের মনে এমন সঙ্কল্প জাগতেই পারে না যা জড়প্রকৃতির কোনো একটি ঘটনা-সমাবেশের ছায়াপাতমাত্র নয়। হরে দরে একই কথা। অর্থাৎ মানবকল্যাণ সাধিত হবে ভৌতিক নিয়মের অন্ধ অনুবর্তনায়, মহানুভবেরই প্রেরণায় নয়। এ-মতবাদের সত্যমিথ্যা নিয়ে কোনো নৈয়ায়িক তর্ক ফাঁদতে চাই না, এও মেনে নিতে প্রস্তুত আছি যে বর্তমান সমাজের নিদারুণ অনাচার ও অব্যবস্থা ভেঙে চুরে সমাজটাকে নতুন ভাবে গড়তে হলে আমাদের মার্ক্সের কাছেই দীক্ষা নিতে হবে। তবু প্রশ্ন থেকে যায়, সাহিত্যকে অনুপ্রাণিত করবার যতটা শক্তি ছিল আদর্শবাদী হিউম্যানিজ্‌মের, জড়শক্তি-বিলাসী মার্ক্সিজ্‌মের কি তা আছে?

হিউম্যানিজ্‌মের পরিপন্থী হলেও, এবং প্রচলিত সমস্ত ধর্মকে জনগণের মৌতাত ব'লে বরখাস্ত ক'রে দিলেও, মার্ক্স-ভক্তদের নিজস্ব একটি ধর্মবিশ্বাস

আছে। সে-বিশ্বাসের তেজ বহুকাল পূর্বের জেস্যুইট্‌দের কথা মনে করিয়ে দেয়। আজকের মুমূর্ষু সাহিত্যকে নবজীবন দান করতে কি সে অপারগ? অপারগ কি না বিচার করবার সময় এখনও আসে নি, মার্ক্স-পন্থী সাহিত্যের এখনও কাঁচা বয়স, ভাবে ভঙ্গিমায় বয়ঃসন্ধির আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠতে আরও কিছু দিন লাগবে তার। সে-সাহিত্য যে সাহিত্যের মরুভূমি হবে না এটুকু অবশ্য নিশ্চিত, কারণ তার অফুরন্ত প্রাণশক্তি কেউ অস্বীকার করতে পারে না। তবে ফণিমনসার জঙ্গলে ভরে না যায় সেদিকে নজর রাখা আবশ্যক। আশঙ্কার একটু কারণ এই যে মার্ক্সবাদীদের যে প্রেরণা আপাতত সব চেয়ে প্রবল সেটা নেতিবাচক, বর্তমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এর অত্যাবশ্যকতা তর্কাধীন নয়, কিন্তু সাহিত্যিক ফলাফলটা বিবেচ্য। Bourgeois, fascist, fifth columnist বিদেশী শব্দের সঙ্গে বর্বর গুণ্ডা রাহজান প্রভৃতি খাঁটি স্বদেশী পদ যোগ ক'রে যে যোগফলটাকে গদ্যে পদ্যে ও গানে পাইকিরি চালন দেওয়া হচ্ছে, অন্তত বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা বিয়োগান্তই হয়েছে। আশঙ্কার আরও একটু কারণ আছে। মার্ক্সবাদের যে-দিকটা ইতিবাচক, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় হাঁ-ধর্মী, সেটা এত নির্বস্তুক এবং শব্দাড়ম্বর-বহুল, হেগেলের উৎকট দার্শনিকতায় এমনি সমাচ্ছন্ন যে কোনো দিন যে তার উৎস থেকে শিল্প-সাহিত্যের প্রাণরসধারা প্রবাহিত হবে একথা ভাবা শক্ত। দার্শনিক বিচারে তা টিঁকতে পারে না, সাহিত্যিক প্রয়োজনে লাগবার সম্ভাবনা তার নেই,——তবে কি বেয়নেট হাতে চার্জ করবার সময়ে Negation of negation ব'লে হাঁক পাড়লে বিপ্লবী সেনা বুকে প্রাণ-তুচ্ছ-করা বল পায়? আমি ডেস্কলোকের অধিবাসী, যুদ্ধক্ষেত্রের মনস্তত্ত্ব ভাল বুঝি না। তবু এটুকু বুঝি যে হেগেলকে ডিগবাজি খাওয়াবার জন্য সাম্যতন্ত্রব্রতীদের এত মাথাব্যথা মাথার নিদারুণ অপপ্রয়োগ। ও কাজটা পেশাদার দার্শনিকের অবসর-বিনোদনের জন্য ছেড়ে দিলেই ভাল হত। মার্ক্সের মতবাদ যখন বায়ুর উপরিস্তর থেকে কঠিন ভূমিতলে নেবে আসবে, আমাদের দেশেও সভিয়েট্ য়ুনিয়নের মতন বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র জুড়ে এক নতুন নিঃশ্রেণীক সভ্যতা চোখের সামনে রেখায় রেখায় ফুটে উঠবে, তখন আমাদের বামপন্থী সাহিত্যিকরা নিশ্চয়ই এমন একটি প্রেরণার উৎস খুঁজে পাবেন যা ধনাত্মক (positive) ও বিমূর্ত (conerete), যার তেজ শুধু পুরাতনের ধ্বংসস্তূপে আগুন লাগাবার জন্য নয়, যা নতুন এবং মহানের জ্যোতিতে চিত্তকে উদ্ভাসিত করবে। ততদিন প্রগতির সাহিত্য

যদি সাহিত্যের পশ্চাৎগতিই হয় তাতে বিচলিত হব না, ফাঁকা বুলি ও ঠাসা গালিগালাজের মধ্যেও সাহিত্যের ধ্রুব আদর্শে রুচি স্থির রাখব।

মধ্যযুগের শিল্পসাহিত্যসঙ্গীত দানা বেঁধেছিল আনুষ্ঠানিক খৃষ্টধর্মের চারিদিকে। অঙ্গসৌষ্ঠবে অতুলনীয় অনেক গির্জের চূড়া তৎকালীন স্থাপত্যের উৎকর্ষ য়ুরোপের নগরে নগরে আজো ঘোষণা করছে, কিন্তু সে চূড়াগুলি যে উত্তুঙ্গ প্রতাপের প্রতীক ছিল তা আজ ধূলিবিলীন। মানুষের, টমাস্ একুয়াইনাসের মত অনন্য-সাধারণ মেধাবী মানুষেরও বুদ্ধিবিচারকে শিকলে বেঁধে সেদিন ধর্মের পরাক্রম হয়েছিল নিরঙ্কুশ, দিগন্তব্যাপী। রাজশক্তির স্বাজাতিক রূপান্তর এবং প্রজাশক্তির মাননিক উদ্বোধনের সম্মিলিত অভিঘাতে কেমন ক'রে সেই পরাক্রম দিনে দিনে ক্ষয় পেল, তার ইতিহাস রেনেসাঁসের প্রথম উন্মেষ থেকে ডারুইনের বিবর্তনবাদ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। ধর্মানুষ্ঠানিক শাসনকে সমাজে পাকা করতে হলে মনের উপর তার ভিত মজবুত ক'রে গাড়া দরকার। তাই কতকগুলি শাস্ত্রীয় মত-বিশ্বাসকে নানা কৌশলে শতাব্দীর পর শতাব্দী অটল ক'রে রাখা হ'য়েছিল। রেনেসাঁসের চিত্তজাগরণের পর এই সমস্ত প্রাচীন ডগ্মার সঙ্গে নবীন দর্শনবিজ্ঞানের হাতাহাতি বেধে গেল। ডারুয়িনিজ্মের সঙ্গে ডগ্মার যে যুদ্ধ সেইটাই বোধ হয় য়ুরোপের রণক্ষেত্রে তার শেষ যুদ্ধ, পরে ডারুয়িনের তত্ত্বটাকে হাত করবার যে-ফন্দি চার্চের পক্ষ থেকে পেলি প্রভৃতি করেছিলেন তা অত্যন্ত হাস্যকর। নববিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মচিন্তার গরমিল যতটা নিরবচ্ছিন্ন, দর্শনের সঙ্গে ততটা নয়। দার্শনিকরা দু'পক্ষেরই যোদ্ধা। শাস্ত্রানুমোদিত বিশ্বাস, বিশেষত ভগবানে বিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য শুধু যে ধর্ম-ব্যবসায়ীরাই চেষ্টার ত্রুটি করেননি তা নয়, দেকার্ত, স্পিনোজা, বার্কলি, এমন কি কান্টের মত বিশুদ্ধ দার্শনিকরাও ভগবানকেই তাঁদের দর্শন-সাধনার লক্ষ্য ও কেন্দ্র করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিজ্ঞানকেও ধর্মের তল্পাদারীর কাজে নাবতে দেখা গেল। এডিংটন্ সমগ্র পদার্থবিজ্ঞানকে কতকগুলি pointer reading ও পুনর্বাদী (tantologous) গাণিতিক সমীকরণে পর্যবসিত ক'রে ইহলোক পরলোকের মাঝখানে ইন্টুইশনের পথটাকে তক্তকে করবার চেষ্টায় ব্যাপৃত। ইন্টুইশনের পথ অবশ্য ডগ্মা থেকে বহু দূরে, এবং এডিংটন স্বয়ং কোনো শাস্ত্রীয় ধর্মের পক্ষপাতিত্ব অস্বীকার করেন। তাঁর ওকালতিটা কবিসুলভ অতীন্দ্রিয়-জ্ঞানের দিকেই। তবে কি না দেখা গেছে যে বাইরে থেকে ধর্মানুষ্ঠানের চাপ যদি আল্গা হয়ে যায় এবং ভিতর থেকে

শাস্ত্রবিশ্বাস ভেঙে পড়ে, তা হলে মিস্টিকের ইন্টুইশনও সে মানসিক উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে বাড়বার পথ পায় না। সেইজন্য বুঝি এলিয়ট্ আজ্ এ্যাংলোক্যাথলিক, য়েট্স্ সেল্টিক্ পুরাণে মশ্গুল। সে যাই হোক কোনো : কোনো দার্শনিক বৈজ্ঞানিকের সহযোগিতা সত্ত্বেও একালের যুগধর্মের সঙ্গে সেকালের রিলিজন্‌কে আর কিছুতেই খাপ খাওয়ানো গেল না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মার অবিনশ্বরতা প্রভৃতি চিরন্তন বিশ্বাসগুলি মানবচিত্ত থেকে চিরকালের মত বিদায় নিয়ে চলল। তারই প্রথম বিক্ষুব্ধ চেতনা টেনিসন ও আর্নল্ড্-এর কবিতায় অভিব্যক্ত হয়েছে।

ভগবান এবং ভগবৎপ্রেম যখন কাব্যের নাগালের বাইরে চ'লে গেল তখন অনেকের মনে হয়েছিল যে নিতান্ত ঐহিক মানব-প্রেমই তার জায়গা জুড়বে, জীবনকে এবং সাহিত্যকে নিরাত্ম শূণ্যতার গ্রাস থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। তাতেও কিন্তু বাদ সাধল বিজ্ঞানের নবতম শাখা মনস্তত্ত্ব। মনের সংজ্ঞাত স্তর ছাড়া তার তলায় তলায় আসংজ্ঞাত ও অজ্ঞাত স্তরগুলিও খুঁজে বের করলেন ভিয়েনীজ্ স্কুলের চিকিৎসকরা। খুঁজে বের করলেন বলাটা তথ্যের অপলাপ হচ্ছে, বলা উচিত এই স্তরগুলির অস্তিত্ব ধ'রে নিয়ে কতকগুলি মানসিক ও স্নায়বিক ব্যাধির ব্যাখ্যা এবং চিকিৎসা করতে তাঁরা সক্ষম হলেন। অবচেতন মনের শুধু অস্তিত্বই স্বীকৃত হল না, তার স্বরূপ সম্বন্ধে নানারকম এলোপাথাড়ি গবেষণা চলল এবং শেষ পর্যন্ত তার যে ছবিটা তাঁরা সর্ব-সাধারণের কৌতূহলী চোখের সামনে এঁকে ধরলেন তা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি অপ্রীতিকর। সে-ছবির অনেক অংশকে প্রামাণ্য মনে করা এখনো অবৈজ্ঞানিক, তবু মোটের উপর শিক্ষিতমণ্ডলীর মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হল যে সেক্স্ আর প্রেম পরস্পরের মধ্যে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে ও-দুটিকে একই বস্তুর এপিঠ ওপিঠ বললেই হয়। শেলি কিম্বা রবীন্দ্রনাথ প্রেম সম্বন্ধে যে অশরীরী, প্রায় অবাঙ্মনসাগোচর ইন্দ্রজাল রচনা ক'রে রেখেছিলেন তা যেন এই মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের এক ফুঁয়ে উবে গেল। উবে যাওয়ার সঙ্গত কারণ হয়তো ছিল না, তবু অনেক পরিমাণে উবে যে গেছে এটাই হল তথ্য। অত্যন্ত নব্যতান্ত্রিক কবিরা প্রেমের ধার দিয়েও যেতে চান না, যদি বা যান আড়ভাবে কথা বলেন, সে-কথার পেছনে "বাঁকা অঙ্কুশের মতো ভাব" প্রচ্ছন্ন থাকে—সব সময়ে প্রচ্ছন্নও থাকে না। অল্ডস্ হক্স্লির গোড়ার দিককার উপন্যাসগুলি ফ্রয়েড্-চালিত মুদ্গর দ্বারা

মোহ-ভঙ্গের ঝাঁঝালো প্রতিচ্ছবি, এতটা ঝাঁঝালো যে মনে হয় উল্টো দিকেই বুঝি লেখকের মোহ জন্মে গেছে।

অবিশ্বাসের মরুভূমিতে রবীন্দ্রনাথ কখনো আধুনিকদের মত পদক্ষেপ করতে বাধ্য হন নি। যদি হতেন তা হলে তাঁর কাব্যের অফুরন্ত শ্যাম-সমারোহের কতটুকু অবশিষ্ট থাকত? এলিয়ট এই মরুভূমিকে কাব্যে অমর করলেন, কিন্তু সেখানে তিষ্ঠোতে পারলেন না, ফিরে গেলেন ক্যাথলিক ধর্মের ছায়াতরুতলে। য়েট্‌স্ মরুভূমির মাঝখানে এক ওয়েসিস্ রচনা করলেন নানা দেশকাল থেকে আখ্যান পুরাণের শান্ত শীতল ফল্গু ধারা বইয়ে এনে; "I had made a new religion, almost an infallible church of poetic tradition, of a fardel of stories and of personages and of emotions...... I had even created a dogma. য়েট্‌স্ বা এলিয়টের মতন এতটা ব্যক্তিগত খামখেয়ালী পথে সর্বজনীন কাব্যসমস্যার নিরাকরণ হতে পারে না; আধুনিক কালের বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় প্রাচীন যুগে পালানো নয়, আধুনিকতর যুগে এগোনো।—ভবিষ্যতের সাহিত্য আপন প্রাণরসের নির্ঝর খুঁজে পাবে কোন্ নব-ধর্মানুভবের শিলাবেদীতলে, কোন্ যুগচৈতন্যশিখরের গলিত তুষারে, তার নির্দেশ দেওয়া আমার ক্ষমতার বাইরে। হয়তো বা ভূয়োদার্শনিকতা বিবর্জিত এবং মানবধর্মে আস্থাবান সাম্যতন্ত্রের মধ্যেই, হয় তো বা মনোবিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত পথ ধ'রে যে নতুন দিগন্ত আমাদের চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হবে, তারি বালার্কলেখায়। পদার্থবিজ্ঞানের কথা তুলছি না, কারণ পদার্থবিজ্ঞান ইতিমধ্যেই চিন্তার স্বাভাবিক রাজ্য প্রায় ত্যাগ ক'রে সাঙ্কেতিকের জালে নিজেকে পাকে পাকে জড়িয়েছে। অসম্ভব নয় যে উচ্চাঙ্গ গণিতের মতন মনের উপর থেকে তার প্রভাব (জীবনের উপর থেকে নয় কেননা ফলিত পদার্থবিজ্ঞান তো রইলই) ক্রমশ মিলিয়ে যাবে। এমনও হতে পারে যে মানুষ তার হৃত বিশ্বাস আর ফিরে পাবে না, তার উদ্বাস্ত জিজ্ঞাসা অরণ্যে পর্বতে প্রান্তরে শুধু ঘুরে বেড়াবে, কোনো পত্রনিবিড় উপত্যকায় গিয়ে বলতে পারবে না যে এই তার আপন দেশ, এরই শ্যামতৃণস্পর্শে আছে বিশ্রামের আমন্ত্রণ। তবে কি কাব্যের ঐতিহ্যে এইখানে পূর্ণচ্ছেদ পড়ল; আধুনিক কবিতার মরুযাত্রী কারওয়ান রওনা হল চিরাগত কাব্যের সেই প্রান্তসীমানা থেকে যেখানে এসে তার

শ্যামলিমা নিঃশেষ হল, তার প্রাণপ্রবাহ চিরকালের মতো শুকিয়ে গেল?—

> বনকীর্ণশ্যামলরুদ্রকম্পিততরঙ্গ
> —তোমার পটদুরান্তে হল লীন।
> ছিল ঝর্ণার প্রাণমঞ্জীরবাহিনী
> নেই নেই।

কিন্তু একে মরুযাত্রাই বা বলি কেমন ক'রে। আগের শ্যামলতা, আগের কোমলতা যদি হারিয়ে থাকে কবিতা, তার বদলে সে এমন কিছু পেয়েছে যা তপ্ত বালির মরীচিকা মাত্র নয়। কোমলতা হারিয়ে সে পেয়েছে মাংসপেশী, দৃঢ় নির্ভীক অঙ্গসঞ্চালন-শক্তি। হৃতবিশ্বাস কবিরা কিছুকাল ধরে বক্তব্যের কথা ভুলে কেবল আঙ্গিকের তাল ঠুকতেই ব্যস্ত। ব্যাপারটা দেখতে শোভন হয় নি, এবং এই দাঁও কষাকষির ফল অন্ততঃ বাংলা সাহিত্যে এই হয়েছে যে কবিতা পড়বার আগ্রহই লোকের মন থেকে উবে গেছে। আধুনিক বাংলা কবিতা লেখে না অথচ পড়ে, এবং পড়ে গালাগাল দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো প্রতিক্রিয়া মনে জাগে, এমন সংজ্ঞাবিশিষ্ট ব্যক্তি আমি একজন—সম্ভবত একমেবাদ্বিতীয়ম। তবে আঙ্গিকের উপর ঝোঁকটা একেবারে ব্যর্থ যায় নি। আগেই বলেছি তাতে ক'রে কবিতাকে মাংসপেশল করেছে। তা ছাড়া ইনিয়ে বিনিয়ে পাতার পর পাতা টেনে নিয়ে কাব্যবস্তুকে পাৎলা ক'রে দেওয়ার বিরুদ্ধে আধুনিকতার বিধান কড়া। অত্যন্ত চোখা শব্দের অন্বেষণ, সবচেয়ে লাগসই উপমা ও চিত্রকল্পের প্রয়োগ, যে বাক্য বাদ দিলেও ব্যঞ্জনা খণ্ডিত হয় না তাকে কেবল পদলালিত্যের খাতিরে কবিতায় জায়গায় না দেওয়ার সংকল্প, এসব দিকে মনোযোগ প্রখর হওয়ার ফল যে শুভ তাতে সন্দেহ নেই। তবে কিনা লেখক এবং পাঠক উভয় পক্ষে তা এখনো অনভ্যাসের ফোঁটা।

আধুনিক কবিতায় আশ্বাস রাখবার আরও একটি কারণ দেখতে পাচ্ছি। ১৯ শতকের শেষ পর্যন্ত কাব্যের পরিধি ছিল সংকীর্ণ, প্রেম, ভগবৎ-ভক্তি, প্রকৃতি সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস এই ধরণের চিরন্তন ও চিরাগত কয়েকটি হৃদয়াবেগের মধ্যে আবদ্ধ। সে পরিধির বেড়া আজ ভেঙেছে। এমন কিছু নেই যা এখন কাব্যের ভোজে অপাংক্তেয়। বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করবার কথা এই যে কবিতা আজ বিশুদ্ধ হৃদয়াবেগের সীমানাও ছাড়িয়ে যেতে প্রস্তুত। যাকে বলা যায় মাননিক প্রসঙ্গ তার সঙ্গে কবির ভাস্বর

ভাদ্রবউয়ের সম্পর্ক ঘুচেছে। অবশ্য নব্যন্যায়ের তত্ত্বের প্যাঁচ কিম্বা বীজগণিতের আঁক-কষাকে কাব্যের পাতমোড়া দিয়ে পরিবেশন করবার চেষ্টা আজো হাস্যকর। কিন্তু আমাদের কোনো চিত্তজাগরণ বা বিশ্বনিরীক্ষা, যার মধ্যে চিন্তনা ও বেদনা সমানে মিশেছে, যাতে কর্মপ্রেরণারও সঙ্গম ঘটেছে, কবিতায় তার সম্যক প্রকাশের পথ ১৯ শতকের চেয়ে অনেক বেশি প্রশস্ত হয়েছে আজ। অর্থাৎ মানুষের ভগ্নাংশকে নিয়ে কবিতা আর তৃপ্ত নয়, সম্পূর্ণ মানুষের সঙ্গে তার কারবার পাতা হল। এতক্ষণ কবিতা বলতে লীরিক কবিতাই বুঝেছি। এই লীরিকের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে ড্রামা এবং এপিকের বিশালতা ও বৈচিত্র্য আনতে চায় এ-যুগের কবি। অপর পক্ষে আটপৌরে জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ভাবনা-বেদনা তাতে স্থান পেয়েছে, সামাজিক অর্থনৈতিক নাগরিক পরিবেষের অনেক কিছু যা এতদিন অন্ত্যজ অস্পৃশ্য ছিল তাকে জাতে তুলে নেওয়া হয়েছে। তাই একদিকে যেমন লীরিকে আসছে মহাকাব্যের বিশালতা, অন্যদিকে তেমনি প্রবেশ করছে উপন্যাসের সাম্প্রতিকতা।

কবিতা আজ সমস্ত গতানুগতিক সীমানা ছাড়িয়ে চলেছে। তার এই স্পর্দ্ধিত অভিযান সম্বন্ধে শেষ বিচার করবার দিন এখনও আসেনি। সিদ্ধি নয়, সাধনাই এখনও তার সামনে রয়েছে। আধুনিক কবি যেন পরীক্ষাগারের বৈজ্ঞানিক, পরীক্ষা চলছে নানা রসায়নের—ছন্দ ও ছন্দোমুক্তির, সমিল ও অমিল পংক্তির, উদ্ধত, খণ্ডিত ও বিপর্যস্ত বাক্যের, আচমকা উপমার, আজগুবি অনুষঙ্গের, অনভ্যস্ত প্রতীকের। এবং সবচেয়ে বড় পরীক্ষা চলছে সেই কবিতা-লক্ষ্মীর প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য যাকে শুধু কল্পনা ও অনুভূতির মধ্যে পেলেই পাওয়া শেষ হবে না, যাকে আমরা বলব

হ্বয়ামি তে মনসা মন
ইহেমান্ গৃহান্ উপজুজুষাণ এহি।

আলোচনা

প্রাচীন বাংলা গ্রন্থের সংস্কার ও সম্পাদন

মনোমোহন ঘোষ

ইতিহাসের রস আর সাহিত্যের রস ঠিক এক জিনিষ না হলেও সাহিত্যের—বিশেষ করে প্রাচীন সাহিত্যের—রস উপলব্ধি করবার জন্যে ইতিহাসের সাহায্য প্রয়োজন, কিন্তু এদিক দিয়ে দেশের দুর্ব্বলতা সুপরিচিত ; তাই ইতিহাসের অমূল্য সহায়তা থেকে আমরা বহুলপরিমাণে বঞ্চিত। চণ্ডীদাসের বা কৃত্তিবাসের জন্ম কোন সালে এ সম্বন্ধে এখনো যথেষ্ট গবেষণার অবকাশ আছে। তাঁদের দেশকাল তাঁদের উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তা মুখ্যত এ কারণেই তেমন সুস্পষ্ট নয়। তাই তাঁদের রচনার যথোচিত মূল্য নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে আমরা বিশেষ অসুবিধাগ্রস্ত হই। এ অসুবিধা আরো বেড়ে যায় যখন দেখি যে তাঁদের রচনা বহু শতাব্দীর ওপার থেকে ঠিক অবিকৃত ভাবে আমাদের কাছে এসে পৌঁছয় নি। কাজেই প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রামাণ্য সংস্করণ প্রস্তুত করা বাংলাভাষী বিদ্বান্‌দের এক অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। এদিক দিয়ে প্রশংসনীয় চেষ্টা কেউ কেউ ইতিমধ্যে করেছেন, তাঁদের মধ্যে ৺সতীশচন্দ্র রায়, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় এবং ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস ও বৈষ্ণবপদকর্ত্তাদের রচনা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে তার মূলে আছে এঁদের তিনজনের প্রচেষ্টা। কিন্তু এরূপ কর্ম্মী বাংলাদেশে আরো অধিক সংখ্যায় লক্ষ্যগোচর হওয়া উচিত। কেবল নির্ভুল পাঠ নয়, তৎসঙ্গে উপযুক্ত টীকা টিপ্পনী দিয়ে প্রাচীন গ্রন্থাদির সম্পাদন করলেই তবে তা সাহিত্যিকবর্গের কাজে লাগতে পারে। এরূপ টীকা টিপ্পনীর অভাবে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সাধারণ সাহিত্য-রসিকগণের কাছে ষোলো আনা পরিচিত হতে পারে নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' গ্রন্থখানির উল্লেখ করা যায়। কবিত্বশক্তিতে না হলেও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি বোধ হয় তাঁর পাণ্ডিত্যের দ্বারা তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী বা সমসাময়িক অন্য কবিদের ছাড়িয়ে গেছেন। এজন্য

তাঁর কাব্যে দুর্বোধ্য অংশগুলির সংখ্যা সুপ্রচুর। এ পর্য্যন্ত অন্নদামঙ্গলের এমন কোন সংস্করণ প্রকাশিত হয় নি যাতে সমস্ত দুরূহ শব্দগুলির অর্থ দেওয়া আছে। উল্লিখিত গ্রন্থের যে কয়খানি সংস্করণ দেখেছি তাদের মধ্যে বটতলা থেকে দে ব্রাদার্স প্রকাশিত সংস্করণখানিই এ দিক দিয়ে কথঞ্চিৎ প্রশংসার যোগ্য। এতে সব দুরূহ শব্দের অর্থ দেওয়া নেই বটে, তবে কোন বিশেষ অজ্ঞান-উৎপাদক (misleading) টিপ্পনী নেই। 'হরগৌরীর কন্দল' প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্রের গৌরী বলছেন :—

> "শাখা শাড়ী সিন্দুর চন্দন পান গুয়া।
> নাহি দেখি আয়তি কেবল আচাভুয়া॥"

স্বল্পকালপূর্ব্বে প্রকাশিত 'অন্নদামঙ্গলে'র কোন সংস্করণে এ স্থানে উল্লিখিত 'আচাভুয়া' কথার অর্থ করা হয়েছে 'মিথ্যা, ফাঁকি'। এরূপ অর্থ নিতান্ত অজ্ঞতাপ্রসূত। দে-ব্রাদার্স প্রকাশিত সংস্করণে এর অর্থ দেওয়া হয়েছে 'অদ্ভুত, অপূর্ব্ব।' 'আচাভুয়া' কথাটি সংস্কৃত 'অত্যদ্ভুত' ও প্রাকৃত 'অচ্চব্ভুঅ' কথার সঙ্গে সম্পর্কিত। অতএব দে-ব্রাদার্সের সংস্করণে যে অর্থ দেওয়া হয়েছে তাকে শুদ্ধ বলা যায় এবং একথা পণ্ডিতবর্গের স্বীকার্য্য যে 'আচাভুয়া' কথাটি ভারতচন্দ্র এ স্থলে 'মিথ্যা' বা 'ফাঁকি' অর্থে ব্যবহার করেন নি। 'অন্নদার জরতীবেশে ব্যাসে ছলনা বর্ণনা করতে গিয়ে ভারতচন্দ্র জরতী অন্নদার বর্ণনায় লিখেছেন :—

> "ঝাঁকড় মাকড় চুল নাহি আঁদি সাঁদি।"

পূর্ব্বোল্লিখিত স্বল্পকাল পূর্ব্বে প্রচারিত 'অন্নদামঙ্গলে' 'আঁদি সাঁদি'র অর্থ দেওয়া হয়েছে 'শৃঙ্খলা'। বটতলার (দে-ব্রাদার্স) সংস্করণে এর মানে করা হয়েছে 'রন্ধ্র, ছিদ্র'। 'আঁদি সাঁদি' কথাটি লোকপ্রচলিত 'অন্ধি সন্ধি' শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত। কাজেই তার মানে শৃঙ্খলা কখনই হতে পারে না। এ দিক দিয়ে বটতলার সংস্করণের মানে নিন্দনীয় মোটেই নয়। এ দুটি ছাড়াও 'অন্নদামঙ্গলে' অনেক শব্দ আছে যেগুলির অর্থ সম্বন্ধে বটতলা সংস্করণ নীরব এবং স্বল্পকাল পূর্ব্বে প্রকাশিত অন্নদামঙ্গলের সংস্করণ নীরবতর। 'অন্নদামঙ্গলে'র মত বইএর সংস্কারকার্যে শক্ত শব্দগুলির মানে দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য হলেও এটিই একমাত্র কর্ত্তব্য নয়। কিঞ্চিদধিক দুশবছর আগের লেখা এ বই খানিতে পাঠবিকৃতি বিশেষ না ঘটলেও একেবারেই যে ঘটে নি তা নয়। এই পাঠবিকৃতির জন্যে 'অন্নদামঙ্গলে'র প্রথম দিকের মুদ্রিত সংস্করণগুলির সম্পাদকগণের দায়িত্ব সমধিক। তাঁরা স্থানে স্থানে

বলে মনে
অশ্লীলতা দূর করতে গিয়ে মূল ভাষার পরিবর্ত্তন করেছেন
হয়। যেমন প্রাপ্ত সর্ব্বপ্রাচীন পুঁথিতে ও মুদ্রিত পুস্তকে গীতারম্ভ
অংশে আছে :—

> "দেখিয়া শিবের কর্ম্ম তাহাতে বসিল মর্ম্ম
> ভগরূপা ভবানী হইলা।
> লিঙ্গ হইলা পশুপতি দুজনে সম্ভোগে রতি
> ক্রমে সৃষ্টি সকল করিলা॥"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্করণে 'ভগ' শব্দ স্থানে 'ভার্য্যা' এবং 'লিঙ্গ হইলা' স্থানে 'পতিরূপ' পাঠ কল্পিত হয়েছে। শেষোক্ত পাঠ ভারতচন্দ্রের কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। ভারতচন্দ্রের তথা প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালী কবিদের প্রায় সকলের রচনা সংস্কারের বেলায় এ শ্রেণীর বিচারের প্রয়োজন আছে। এ জাতীয় বিচার থাকলেই প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সংস্কারকার্য্য পণ্ডিত ও অপণ্ডিত সকলের উপকার করবে।

বাংলা ছন্দের সম্বন্ধে

দিলীপকুমার রায়

১৩৪৭, পৌষের "কবিতা"-য় শ্রীঅজিত দত্ত মহাশয় আমার "ছান্দসিকী" বইটি সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ নিবন্ধে অপর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যঙ্গ পরিবেশণ করেছেন সমালোচনার নামে। এটি তারই একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদ।

অজিতবাবুর সব অভিযোগের মর্ম গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি, আর তবে দুচারটি অভিযোগ বুঝতে পারা গেছে। তাদের একটি এই, "রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত এই জন্যেই আমি অজিতবাবুর বিরাগভাজন হয়েছি : উদ্‌ঘাটিত বাংলা ছন্দের মূলসূত্রকে গ্রহণ না ক'রে তিনি (অর্থাৎ দিলীপকুমার) প্রবোধকুমার সেনের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন—" যার ফলে (দুটি মারাত্মকের অন্যতম ভুল এটি) "তাঁর বই শেষ পর্যন্ত নৈরাশ্যজনক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।" ('নৈরাশ্যজনক' ডিসাপয়েন্টিঙের বাংলা বোধ হয় ?)

এর পরেই অজিতবাবু ধরেছেন ব্যঙ্গের তীরন্দাজি : "ছন্দ গণিত-সম্রাটেরই খাস প্রজা একথা মানতে একটু খটকা লাগে"।

অভিযোগটির উত্তর এই যে রবীন্দ্রনাথকে আমি বরাবর মস্ত কবি ব'লেই মনে করে এসেছি অর্থাৎ creator—এবং সঙ্গীত সম্বন্ধেও বহু আলোচনার ফলে বুঝতে পেরেছিলাম যে তাঁর মনটি স্রষ্টা মন ছিল—বিশ্লেষক মন নয়। সবাই জানেন স্রষ্টা মনই হ'ল শিল্পজগতে সেরা মন। কাজেই রবীন্দ্রনাথকে সেরা সম্মানই আমি দিয়েছি। কিন্তু অজিতবাবু হয়ত সেই শ্রেণীরই ভক্ত যিনি চান যে সব বিষয়েই রবীন্দ্রনাথের বাক্য নির্বিচারে বেদবাক্য ব'লে মানা সবারই কর্তব্য। এটা তিনি হয়ত না চাইতেও পারেন, কিন্তু যুক্তি না দিয়ে সরাসর আমার বইটির নৈরাশ্যজনক হওয়ার এই ধরণের কারণ যেভাবে তিনি পেশ করেছেন তাতে মনে সন্দেহ হয় যে এইটেই আমার শ্রেষ্ঠ অপরাধ।

তাঁর খট্‌কাটির উত্তর এই যে আমাকে দিয়ে তা-ই বলনো হয়েছে যা বলবার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি: আমি বলিনি কোথাওই যে ছন্দে গণিতের চর্চাই একমাত্র চর্চা অন্য সব বিচারই অবান্তর। আমি শুধু বলতে চেয়েছি যে ছন্দে টেকনিক ওরফে আঙ্গিক ব'লে একটা বস্তু আছে যার আলোচনার ভিত্তি গাণিতিক সুতরাং এস্থেটিক তত নয় যতটা বৈজ্ঞানিক। একথার স্বপক্ষে প্রধান যুক্তি এই যে "মাত্রা" শব্দটি আমরা যখনই উচ্চারণ করি তখনই গোণাগুন্তির কথাই—ইউনিট হিসাবে—আমাদের মনে আসে, আসতে বাধ্য। আর গণিতেই 'ইউনিটে'র কথা ওঠে, রসের সম্পর্কে ইউনিট কথাটি অর্থহীন। অন্য ভাষায়: qualityনয়—quantityতে এই ইউনিট' থাকে, আর এই শেষের বিচারই হ'ল ছন্দের আঙ্গিকের অর্থাৎ prosodyর বিচার। বিলিতি ছন্দেও prosodyর বিচার ধরণের গোণাগুন্তি দিয়েই হ'য়ে থাকে, সংস্কৃত ছন্দেও। কাব্য বা রসের এই বিচার আর prosodyর বিচার এক বস্তু নয়। কিন্তু এই সাদা কথাটিও অজিতবাবু বুঝতে পারেন নি, "খটকা লেগেছে" তাঁর মনে—যার ফলে তিনি সরাসর এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন (তাঁর ব্যঙ্গের ভাষায়) যে "দিলীপকুমারের বই যদি কোনোদিকে উল্লেখযোগ্য হ'য়ে তবে তা এর সর্বাঙ্গীণ ব্যর্থতায়।"

এভাবে আমার বইটির প্রাণদণ্ড বা মারণযন্ত্র উচ্চারণ করে তবে তিনি বইটির সমালোচনায় লেগেছেন ও লিখছেন: "ছান্দসিকী প'ড়ে ধারণা হয় চলতি ভাষায় লেখা তিন মাত্রার ছন্দের নামই বুঝি স্বরবৃত্ত ছন্দ।" কেন এ-ধরণের অদ্ভুত ধারণা তাঁর হ'ল বোঝা সুকঠিন কেননা আমি আমার "স্বরবৃত্ত ছন্দ" অধ্যায়ে স্পষ্ট ক'রেই লিখেছি (৬৩ পৃষ্ঠায়) যে "প্রতি পর্বে

চারটি ক'রে স্বরে বা ধ্বনিতে—" কিনা প্রতি পর্বে চার মাত্রা ধ'রে তবেই এ ছন্দ রচিত হয়' "এই-ই হ'ল সাধারণ নিয়ম এ-ছন্দের।" কিন্তু অজিতবাবুর বিচিত্র মনে এই বিচিত্র ধারণা হয়েছে যে আমি মনে করি: স্বরবৃত্ত ছন্দ (১) চলতি ভাষায় লেখা ও (২) তিন মাত্রার ছন্দ। (১) কথার উত্তর এই যে মাত্রাবৃত্তও চলতি ভাষায় লেখা হয়েছে আমাদের ভাষায় যথা রবীন্দ্রনাথের "লক্ষ্মীর পরীক্ষা", কবি নিশিকান্তের "টুকরি" অপরাজিতা দেবীর "বুকের বীণা", আরও নানা বইয়ে নানা কবিতাই বেরিয়েছে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যা চলতি ভাষায়" লেখা। একথা আমি ছান্দসিকীতে সদৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি (ছান্দসিকী—স্বরবৃত্ত ছন্দ—৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) স্থানাভাবে একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিই "দুই বোন তারা হেসে যায় কেন যায় যবে জল আনতে" (রবীন্দ্রনাথ)—এখানে মাত্রাবৃত্তে হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদ পর্যন্ত এসে গেছে। কাজেই চলতি ভাষা par excellence. অতএব আমি স্বরবৃত্ত-ছন্দ সম্বন্ধে ওকথা বলিনি "সংজ্ঞা" হিসেবে। চলতি ভাষা স্বরবৃত্তের একটিমাত্র আনুষঙ্গিক রূপপরিচয়, সংজ্ঞা নয়—অর্থাৎ concomitant, definition নয়। ওর definition আমি দিয়েছি কিন্তু কি ভাবে এ ক্ষুদ্র প্রতিবাদে বলা অসম্ভব। তবে তার গোড়াকার কথাটা এই যে স্বরবৃত্ত ছন্দে (সাড়ে পনর আনা ক্ষেত্রে) যুগ্মধ্বনি একমাত্রিক। মাত্রাবৃত্তে যুগ্মধ্বনি সর্বত্রই দ্বিমাত্রিক। অক্ষরবৃত্তে যুগ্মধ্বনি বিকল্পে একমাত্রিক ও দ্বিমাত্রিক। কোথায় কী ভাবে মাত্রা সংস্থান হ'য়ে থাকে তার বিশদ বিচার ছান্দসিকীতে করেছি। কিন্তু অজিতবাবুর তাতেও ফের ঐ ধাঁধা-ই লেগেছে। পিতৃদেবের ব্যঙ্গের সুর ধরতে ইচ্ছা হচ্ছিল: "আমি যুক্তি দিতে পারি মস্তক দিতে পারি না—তাহা ঈশ্বরের সৃষ্টি।" কিন্তু সে পথ না ধ'রে কেবল এইটুকু আত্মসমর্থন করব এখানে যে অনেকেরই কিন্তু ধাঁধা" লাগে নি—বেশ বুঝতে পেরেছেন তাঁরা (মোটামুটি) অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের ভেদ। তবে অজিতবাবু এক জায়গায় অন্তত খুবই অকুতোভয়, তাই একথা কবুল করতে তাঁর বাধে নি যে "আমি নিজেই স্বরবৃত্ত ছন্দের লক্ষণটা ভালো বুঝি না।" কেবল তাহ'লে এই প্রশ্নটি স্বতই জাগে যে বিষয়ে বোঝেন না সে বিষয়েও কোনো রায় দিতেই হবে এ দায়িত্ববোধের উদ্ভব তাঁর মস্তিষ্কে হ'ল কোত্থেকে?—বিশেষ ছন্দের মতন টেকনিক্যাল আলোচনায়। সবাই জানেন টেকনিকাল আলোচনায় সাধারণ মানুষ মাত্রেরই অধিকার নেই, ওটা হ'ল বিশেষজ্ঞতার খাসতালুক। সংসারে সবাই

সব জিনিষ বোঝে না, বুঝতে পারে না। এতে লজ্জার কিছু নেই। লজ্জা সেখানেই যেখানে যা বুঝি না তার সম্বন্ধে বিজ্ঞ বচন আবৃত্তি করতে প্রবৃত্তি বা ঝোঁক।

অজিতবাবুর আরো নানা ব্যঙ্গ আছে, যথা আমার সাত মাত্রার ছন্দের নমুনা নিয়ে। স্থানাভাবে তাই শুধু এইটুকু বলি যে সপ্তমাত্রিক ছন্দ সম্বন্ধে আমার একটি প্রধান বক্তব্য ছিল এই যে এতে ২+৩+২ যথা রবীন্দ্রনাথের "পিক কুহরে তীরে" বা "ভালোবাসিতে মরি" শ্রেণীর modulation আনলে তাতে ক'রে বাংলা সপ্তমাত্রিক মাত্রাবৃত্তের ছন্দসমৃদ্ধ বাড়ত। অজিতবাবু আমার "তুমি কেমনে নাথ | আলোকে বঞ্চিবে" শ্রেণীর চরণে ছন্দের কী ভুল দেখে উদ্ধৃত করবার "লোভ সামলাতে পারেন নি" খুলে বলেন নি। কিন্তু এ শ্রেণীর চরণ কাব্যোত্তীর্ণ না হ'লেও যে এখানে ছন্দ পতন হয়েছে এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসহ নয়। কারণ কবিতা মন্দ হ'য়েছে অথচ ছন্দপতন হয় নি এর দৃষ্টান্ত প্রচুর।

তবে অজিতবাবুর সম্ভবত পর্বভাগ ব্যাপারটাতে ধাঁধাঁ লাগে তাই রবীন্দ্রনাথের মরি মরি অ | নঙ্গ দেব | তা—ধরণের চরণেও আমার ছাপার ভুল হয়েছে কিনা জানতে চেয়ে ব্যঙ্গ করেছেন। না। ওখানে ছাপার ভুল হয় নি—এবং পঞ্চমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দের সঙ্গে বর্ণপরিচয় যাঁর হয়েছে তিনিই আমার এ কথায় সায় দেবেন এ ভরসা আমার আছে। তবে এই ভারতের | মহা | মানবের | সাগর তীরে এখানে মহা-র পরে পর্বভাগ দাঁড়ি দেওয়া নিশ্চয়ই ছাপার ভুল যে-কথার উল্লেখ শুদ্ধিপত্রেও দিয়েছি। কিন্তু অজিতবাবুর ব্যঙ্গের লোভ অত্যধিক হওয়ার দরুনই বোধহয় এ ব্যঙ্গবাণটি নিক্ষেপ করবার আগে শুদ্ধিপত্রটিতে একবার চোখ বুলিয়ে নেবারও সময় পান নি। অবশ্য সমালোচক এযুগে কবির চেয়েও নিরঙ্কুশ—সবাই জানেন। কেবল একটা কথা। আমার বইটিতে ছাপার ভুল আরো আছে যার জন্যে অপরাধ নিশ্চয়ই আমার। তবে সবদেশেই যাঁরা সুবিচারী তাঁরা এ ধরণের ত্রুটি দৃষ্য ব'লেই ধরেন না—ব্যঙ্গ করেন না এ নিয়ে। Fairness কথাটা অভিধানে এসেছিল পরে—প্রথমে ওর উদ্ভব মানবচরিত্রে। জানি না একথায়ও অজিতবাবুর ধাঁধাঁ লাগবে কি না। বহুদূর থেকে নির্ভুল টেকনিকাল বই ছাপানো যে আমাদের দেশে কত কঠিন ভুক্তভোগীরাই জানেন। তবে আমাদের অনেকেরই ধাঁধাঁ লেগেছে তাঁর ছন্দালোচনায়। একটা নমুনা দিলামই বা—তাতে আর কিছু না হোক, ছন্দালোচনায় ধাঁধাঁ লাগানো

সম্বন্ধে কৃতিত্বে তিনি যে কারুর চেয়েই কম নন এটুকু তো অন্তত প্রমাণ হবে।

অজিতবাবু লিখছেন এই ভাবে নম্বর দিয়ে অধ-উর্ধ্বে: "পয়ারকে যতই হাল্কা করুন প্রতি পর্বাংশে দু' থেকে তিন মাত্রাই সে রাখবে, এর বেশিও নয় কমও নয়। যেমন:

২ ২ ২ ২ ২ ২ ২
সখা | সনে | উৎ | সবে | বৎ | সর | যায় |
৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩

আবার ঠেসে বাড়িয়ে দিন:

৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩
দুর্দান্ | তপান্ | ডিত্য | পূর্ণ | দুঃসা | ধ্যসিদ্ | ধান্ত"

পয়ারের সহজ পর্বভাগে এও ধাঁধাঁ নয়? দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিতে যথার্থ পর্বভাগ নিশ্চয়ই এই: দুর্দান্ত পা | ণ্ডিত্য পূর্ণ ॥ দুঃসাধ্য সি | দ্ধান্ত—অর্থাৎ ৮+৬। কিন্তু অজিতবাবুর বিশ্বাস পয়ারে "প্রতি পর্বাংশে দু' থেকে তিন মাত্রাই সে রাখবে, এর বেশিও নয় কমও নয়"। বিস্ময় লাগে। কারণ পয়ারের চাল চারের বা দুয়ের—তাতে তিনের প্রশ্নই ওঠে না। অথচ এমন আজগুবি কথাও অজিতবাবু অকুতোভয়ে লিখলেন, তা আবার ছক কেটে ২।৩ নম্বর দিয়ে। কিন্তু এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে "দুর্দান্" ত্রিমাত্রিক কোন্ বিচারে? মাত্রাবৃত্তের বিচারে নিশ্চয়ই নয়—কারণ সে বিচারে "দুর্দান্" চতুর্মাত্রিক এ বিষয়ে ছন্দজ্ঞ কবিদের মধ্যে মতভেদ থাকতেই পারে না। আর যদি অক্ষরবৃত্তের মামুলি ছত্রগোনা পদ্ধতি অনুসারেই দুর্দান ত্রিমাত্রিক হ'য়ে থাকে তাহ'লেও "খট্‌কা" খচখচ করে, প্রশ্ন ওঠে 'ডিত্য' 'পূর্ণ' বেচারীদের কী হবে! ওরা কেমন ক'রে দুই ছেড়ে তিনের ভারিক্কি চালে চলবার শক্তি পাবে, কোন্ যুক্তির ভেল্কিতে? (খট্‌কা বস্তুটিও অজিতবাবুরই একচেটে সম্পত্তি নয় তো।) হয়েছে কি, অজিতবাবু ঠিক ঠাহর পান নি ধ্বনিসাম্যের ব্যাপারে ইউনিটের তৎপর্য কোথায়। পারলে অন্তত এটুকু তিনিও বুঝতে পারতেন যে যদি হরফের ইউনিটে বিচারই মঞ্জুর হয় তাহ'লে দুর্দান চারমাত্রা ছেড়ে তিন মাত্রার কোঠায় নেবে ধ্বনিসাম্য করতে পারে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ডিত্য পূর্ণ ধ্বান্ত এ ইউনিটের সাহায্যেই দুই ছেড়ে তিনের মঞ্চে উঠতে পারে না এভাবে। একই চরণে যে প্রথম দুই পর্বে ইউনিট হ'ল মাত্রা—আর পরের সব পর্বে ইউনিট হ'ল হরফ এ-রকম স্বৈরাচার এ ছন্দস্বন্দর যুগে অচল। চৈতন্যচরিতামৃতের যুগেই এ-ধরণের

হইছন্দ লেখা হ'ত। মধুসূদনের আবির্ভাবের পর থেকে পয়ারে এ-ধরণের খামখেয়ালি নামঞ্জুর হয়ে গেছে সুকবিদের কাব্যসভায়। কাজেই এখানে যে-ভাবেই ছন্দবিশ্লেষণ করুন না কেন অজিতবাবুর হয়েছে "রামে মারলেও মরেছি রাবণে মারলেও মরেছি" অবস্থা।

আর এইজন্যেই ছন্দবিচারে গাণিতিক পদ্ধতিকে নিয়ে একগাল হাসা যায় বটে প্রথম দিকে, কিন্তু আখের থাকে না। কারণ গাণিতিক-ছান্দসিক বেচারী সমালোচকের রায়ে বড় জোর প্রাণে মারা যেতে পারেন কিন্তু খামখেয়ালি সমালোচকের প্রাণ মান দুটিই যায়—আর সেটা বিশেষজ্ঞদের রায়ে।

আমার বক্তব্য

অজিত দত্ত

১৩৪৭ সনের পৌষের কবিতায় দিলীপকুমার রায়ের 'ছান্দসিকী' বইখানির সমালোচনা করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো। কখনো ভাবিনি ১৩৫০ সনে তার দরুন কৈফিয়ৎ দিতে হবে। সমালোচনার জন্য বই দিলে সমালোচক যে সব সময় মনের মতো কথা বলবেন এটা আমরা আশা করিনে। সমালোচকও তাঁর প্রত্যেকটি মতামত সুদীর্ঘ যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে বাধ্য নন। বিরুদ্ধ সমালোচনায় দিলীপবাবু এতদূর বিচলিত হবেন জানলে হয়তো তখনি আমি 'ছান্দসিকী'র সমালোচনা করতে নারাজ হতাম। তবু যেহেতু দিলীপবাবু শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি তাঁর সুদীর্ঘ সমালোচনার প্রতিবাদ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য জানানো বোধ হয় প্রয়োজন।

দিলীপবাবু আমাকে রবীন্দ্রনাথের অন্ধ-ভক্ত বলে যে উপহাস করেছেন, আমি তাতে লজ্জিত নই। কেননা দিলীপবাবু যাই বলুন রবীন্দ্রনাথ কেবল স্রষ্টাই ছিলেন বিশ্লেষক ছিলেন না—এ মত বাংলাদেশে একমাত্র দিলীপকুমারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই আমি সুখী হবো।

দিলীপবাবুর প্রথম অভিযোগ কাব্য-ছন্দ গাণিতিক এ-কথা বুঝতে আমার খট্‌কা লেগেছে। খট্‌কা আমার এখনও আছে এবং দিলীপবাবু তার সমাধান করতে পারলে কৃতজ্ঞ হবো। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই গণিতের সাহায্যে অক্ষর বা মাত্রা গুণে ছন্দ বিচার চলে না তার প্রমাণ ছড়ার ছন্দ। তার আরো প্রমাণ

দিলীপবাবু যাকে স্বরবৃত্ত ছন্দ বলেন তাই। 'স্বরবৃত্ত' ছন্দের কথায় পরে আসছি। বাংলা ছন্দের রাজ্যে গণিতের অধিকার অনেকটা থাকতে পারে, কিন্তু 'সুর' বলে' যে একটা জিনিষ আছে বাংলায় তার প্রতিপত্তিও কম নয়। বাংলার যেটা প্রধান ছন্দ—পয়ার—তা 'সুর'-কেই আশ্রয় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। নতুবা 'ওহে মৃত্যু তুমি মোরে কি দেখাও ভয়' কি করে শুদ্ধ ছন্দ হতে পারে। এর প্রত্যেক পর্বে কি সমান মাত্রা? 'আয় বৃষ্টি হেনে ছাগল দেবো মেনে' এই দু'লাইন ছড়ার ছন্দে গণিতের প্রতিপত্তি কতখানি? আয় বৃষ্টি চট্‌পট্‌ বল্লেও তো ও-লাইনের ওজন বাড়ে না। 'হেনে' কথাটির সুরের টান ওকে চার মাত্রায় মর্যাদা দিয়েছে একথা কি দিলীপবাবু অস্বীকার করেন? রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্তই নেয়া যাক। 'পাত্‌লা করে কাটো প্রিয়ে কাত্‌লা মাছটিরে' আর 'পাতলা করিয়া কাটো কাতলা মাছেরে', দুই-ই তো এক ছন্দ। কিন্তু গণিতের বিচারে কি এরা সমান। কাজেই খট্‌কা তো আমার ঘুচলো না। বরং আমি একথাই জানি যাঁরা দুর্বল কবি তাঁরাই অক্ষর গুণে, গণিতের তাঁবেদারি করে পদ্য লেখেন। শক্তিমান কবি গণিতের শাসনকে অমান্য করে ছন্দে বিচিত্র সঙ্গীতের সৃষ্টি করবার ক্ষমতা রাখেন। দিলীপবাবু নিজেও ছন্দে গণিতের একাধিপত্য সম্বন্ধে সন্দিহান, 'ছান্দসিকী'তেই তাঁর প্রমাণ আছে। যেমন স্বরবৃত্ত ছন্দের বিচারে তিনি লিখছেন—"ওগো চাঁদ। তোমার আলো। ছড়ায় কালো। ভুবনে……' এখানে চাঁদকে দ্বিমাত্রিক ধরা চলবে কিনা। কিম্বা যদি লিখি 'বলো আমায়। ওগো গাছ। কার দোলনায় দোলো। এখানেও গাছকে এ-ভাবে বিশ্লিষ্ট ভঙ্গিতে টেনে উচ্চারণ ক'রে দু মাত্রা ধরলে সেটা কান সইবে কিনা? এর পরেও কি ছন্দের ভিত্তি যে কেবল গণিতে একথা মানতে হবে?

দ্বিতীয়, দিলীপবাবু আমার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন—কারণ আমি লিখেছিলাম "ছান্দসিকী পড়ে ধারণা হয় চলতিভাষায় লেখা তিন মাত্রার ছন্দের নামই বুঝি স্বরবৃত্ত ছন্দ।" দিলীপবাবু যদি স্থিরমস্তিষ্কে ভেবে দেখেন, তবে বুঝবেন যে আমি এখানে আমার নিজের বোঝবার ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহপ্রকাশ করিনি, দিলীপকুমারের প্রকাশ-ক্ষমতার ব্যর্থতাই ছিলো আমার উক্তির লক্ষ্য। "ছান্দসিকী" পড়ে' ধারণা হয় কথাটার সেই রকমই মানে। কেন এ রকম ধারণা হয়, সে কথা ১৩৪৭ সনে একবার বলেছিলাম, আবারও বলি। দিলীপকুমার তাঁর 'ছান্দসিকী'তে লিখেছেন যে স্বরবৃত্ত ছন্দের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল যেহেতু 'ইতিমধ্যেই কি দেখা যাচ্ছে না যে সাধু ক্রিয়াপদ হইতেছে,

যাইতেছিলাম, করিবার ধাইবার প্রভৃতি কবিমনে তেমন ঠাঁই পাচ্ছে না"। সাধু ক্রিয়াপদের সঙ্গে স্বরবৃত্তের ভবিষ্যতের সম্পর্ক কোথায়? আমরা তো মনে করি সাধু ক্রিয়াপদের ক্রমবিলোপ সমস্ত ছন্দ এক কথায় বাংলা কবিতার পক্ষেই একটা শুভ লক্ষণ। আমি লিখেছিলাম আমি নিজেও স্বরবৃত্ত ছন্দের লক্ষণটা ভালো বুঝিনে। আমার বলবার উদ্দেশ্য ছিলো স্বরবৃত্ত ছন্দ বলে' একটা আলাদা ছন্দ দাঁড় করাবার সার্থকতা আমি বুঝি না। এবং দিলীপকুমারের নিজের মনেও যে এ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা আছে, আমার বিশ্বাস তাঁর বইয়ের ৬২-৬৩ পৃষ্ঠা পড়লে সকলেই সে সম্বন্ধে সন্দিহান হবেন।

তবে দিলীপবাবু যে বলেছেন 'টেকনিক্যাল আলোচনায় সাধারণ মানুষ মাত্রেরই অধিকার নেই' একথাটা আমার খুব মনে ধরেছে। 'ছান্দসিকী'র মতো বই লেখবার আগেই যদি দিলীপবাবু এ কথাটা ভাবতেন!

এর পর দিলীপবাবু আমার পয়ার আলোচনা নিয়ে পড়েছেন। কিন্তু সে আলোচনায় 'পর্ব' কথাটির বদলে আমি পর্বাংশ কথাটি ব্যবহার করেছি এটা বোধ হয় দিলীপবাবু লক্ষ্য করেন নি। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে দুইয়ের চলন আর তিনের চলনের কথা লিখেছিলেন দিলীপবাবুকে আমি সেটা প'ড়ে দেখতে অনুরোধ করছি। পয়ার সম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য সেটা বিশদ করে বোঝাতে গেলে একটা দীর্ঘ প্রবন্ধের অবতারণা করতে হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেটা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। তবে আমার বিশ্বাস অনেকেই আমার বক্তব্য অনুমান করতে পেরেছেন।

যুগবর্তী না যুগবতী?

শ্রীযুক্ত কবিতা সম্পাদক মহাশয় সমীপে—

সবিনয় নিবেদন,

বিশ্বভারতী কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত 'সাহিত্যের স্বরূপ' বইয়ের একটি প্রবন্ধের একটি বাক্যের (পৃ ১২) একটি শব্দের 'কবিতা'য় প্রকাশিত পাঠ পরিবর্তন সম্বন্ধে আপনি যে 'আপত্তি' করেছেন সে-সম্বন্ধে প্রকাশকের বক্তব্য জানাতে সুযোগ দিয়েছেন ব'লে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

আপনি এই সমালোচনায় ব্যাকরণকে যেরূপ পরিহাস করেছেন তারপর আর ব্যাকরণের কথা তুলতে রীতিমত ভয় হয়!

"তিনি [রবীন্দ্রনাথ] তো সেই শ্রেণীর লেখক ছিলেন না যাঁরা অন্তিকষ্টে ব্যাকরণ বাঁচিয়ে চ'লে…" ইত্যাদি।

এটি যুক্তি নয়, special pleading মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ "নীরস" "মুগ্ধবোধ"ওয়ালাদের সঙ্গে সারাজীবন অনেক তর্ক করেছেন কিন্তু সম্ভবত "আমার এই ভালো লাগে" গোছের যুক্তি তর্কক্ষেত্রে দেন নি, প্রত্যেকবারই উত্তরে যুক্তি দিয়েছেন। যেমন বলেছেন, বাংলার ব্যাকরণের নিয়ম স্বতন্ত্র, তার নিয়ম বেঁধে দিতে চেষ্টা করেছেন; কিন্তু ব্যাকরণকে উড়িয়ে দিয়েছেন বলে জানি না। সংস্কৃত শব্দে তিনি নূতন অর্থ, নবদ্যোতনা অবতার করেছেন, কিন্তু দু একটি common error ছাড়া ক'টি শব্দের এমন প্রয়োগ করেছেন যা ব্যাকরণসংগত নয়? সংস্কৃত প্রত্যয়ের অপপ্রয়োগ ক'টি করেছেন?

"সরসতার কাছে……সসম্ভ্রমে দৌড় দেবে ব্যাকরণ।"

"এই স্ত্রীরূপ [যুগবতী] ব্যবহারে পরিহাস ফুটে উঠেছে।"

মর্মান্তিক পরিহাস কি সমস্ত রচনাটির অধিকাংশ ছত্রেই ছড়িয়ে নেই? যুগবতী শব্দ ব্যবহারের উপরেই কি সেই পরিহাসের ও সরসতার চরম ও একান্ত নির্ভর? পরিহাস যাঁদের বুকে বিঁধবার বিঁধেছে, যুগবতীর সাহায্য দরকার হয় নি।

"হাতের লেখা পড়তে আমার ভুল হয়েছে, কিংবা তিনিই ভ্রমক্রমে যুগবর্তীকে যুগবতী লিখেছেন এ-রকম তর্ক উঠতে পারত।"

সম্ভবত আপনি এগুলিকে কুতর্ক মনে করেন। আপনি ভুল পড়ে থাকতে পারেন কি না জানি না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ চিহ্ন যোগ করতে ভুলে গিয়েছেন বা অতিরিক্ত চিহ্ন যোগ করেছেন, তাঁর পাণ্ডুলিপিতে এ-রকম দৃষ্টান্ত প্রচুর আছে; বিশেষত রেফ যোগ বিয়োগের বেলায়।

"যুগবতী ব্যাকরণসঙ্গত নয় সেটা প্রমাণ করা দুঃসাধ্য।"

ব্যাকরণ যখন taboo, এবং ব্যাকরণসঙ্গত কি নয় সে প্রমাণের উপর যখন আপনার বিশ্বাস নির্ভর করে না, সুতরাং "ব্যাকরণের দোহাই" পাড়বার আবশ্যকতা নেই। সংস্কৃত প্রত্যয়ের ব্যবহার যাঁরা জানেন তাঁদের কাছে এক্ষেত্রে ব্যাকরণের দোহাই বাহুল্যমাত্র, অন্যদের বোঝানো "দুঃসাধ্য"।

তার পরে "আভ্যন্তরীণ প্রমাণ":

"মিডভিক্টোরীয় যুগবতী মানে mid-Victorian"।

সংকলয়িতার মনে মিডভিক্টোরীয় যুগবর্তী মানেই mid Victorian, এবং শুধু মিড-ভিক্টোরীয় মানেও তাই।

"গোরুর বিশেষণ বলে স্ত্রীলিঙ্গ, এ তো দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট।" একটি কথা শুধু অস্পষ্ট থেকে যাচ্ছে।

'গোরু' কি স্ত্রীলিঙ্গ? অজ্ঞতা মার্জনীয়। যখন কোনো পুরুষ বন্ধুকে প্রাকৃতজনোচিত ভাষায় বলি "তুই একটা গোরু" তখন নিশ্চয়ই শুধু প্রাণীতত্ত্বের ভুলই করি না, ব্যাকরণের ভুলও করি?

আলোচ্য গোরুটি (সমালোচনার উদ্ধৃতাংশ দ্রষ্টব্য) "গাড়োয়ানের মোচড় খেয়ে খেয়ে গ্রন্থিশিথিল ল্যাজওয়ালা"। গাড়িতে যে গোরু জোড়া হয় তার বিশেষণে "স্ত্রীরূপ ব্যবহার" আবশ্যক হয় ব'লে আমাদের জানা ছিল না; আমাদের ধারণা ছিল গাড়ি বলদেই টানে, এবং "রস" বা রসিকতা কোনো কারণেই তার বিশেষণে স্ত্রীরূপ ব্যবহার আবশ্যক হয় না। তবে "জোর ক'রে তর্ক" করব না।

বিনীত

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

চন্দ্রকলা :—বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

("এক পয়সায় একটি" গ্রন্থমালা)

কবিতা ভবন

সর্ব্বসাধারণের জন্যে "এক পয়সায় একটি" আধুনিক কবিতামালার অন্তর্গত বিমলাপ্রসাদের "চন্দ্রকলা"র আধুনিকতা আর কবিত্বের প্রকৃতি আর সম্বন্ধই জনসাধারণের দিক থেকে আলোচ্য।

দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে আজকের জীবন-ব্যবস্থার নানা বিভাগে যে বিরোধ, অসঙ্গতি আর বৈষম্য ধরা পড়েছে "চন্দ্রকলা"য় তারই ওপর আলোকপাত। প্রায় সবগুলি কবিতার মূল সুর ঐ। দৃশ্য-জগতে—পল্লীর আর নগরের—মধ্যবিত্তের ঘরোয়া আর সামাজিক জীবনে, তার সামাজিক মনোভাবে, ব্যক্তিগতভাবে প্রেমের আশায় নিরাশায়, সন্দেহে দ্বিধায়, মোহে

মুক্তিতে, ঘটনাজগতে, মৃত্যু-দর্শনে, বিজ্ঞান অর্থনীতির উপমা তথ্যের সংগঠনে, এইরকম নানা অভিব্যক্তিতে আজকের জীবনের দ্বন্দ্ব আর দ্বন্দ্ববোধ "চন্দ্রকলা"র রস-ভাষ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বিমলাপ্রসাদের কল্পনার শক্তি, বৈচিত্র্য আর ব্যাপকতার পরিচয় এই কয়টি কবিতায় স্পষ্ট এবং নিঃসন্দিগ্ধ।

কবিত্বের পরিচয় "চন্দ্রকলা"য় সহজে স্বপ্রকাশ। যে চোখে "সবই কিছু চেনা লাগে তবুও নূতন" সে চোখের রসদৃষ্টি সম্বন্ধে কথা কি? যাঁর ঐ চোখ তাঁর হাতের রেখাতেও যে

অনেক দূরের আকাশ কাঁপে
শূন্য পারের কল্পতাপে
দিনের আলোয় প্রস্ফুটনী মন্ত্র মধুমায়া

তার প্রমাণ একাধিক কবিতায়। অতএব ছন্দে, তালে, চিত্রে, রূপকে "চন্দ্রকলা" পাঠকচিত্ত উদ্ভাসিত করবে তা অনায়াসে বলা যায়।

সে কথার ওপর একটা কথা এখানে স্পষ্ট করবো যে আধুনিক কবিতার একটা বড় বৈশিষ্ট্য বিমলাপ্রসাদ খুবই কৃতিত্বের সঙ্গে "চন্দ্রকলা"য় পরিস্ফুট করেছেন—সেটা হ'ল রচনারীতি আর প্রকাশভঙ্গীতে বর্ণবিলাস, স্বরঝঙ্কার, রাগরঞ্জন, চিত্রসমৃদ্ধির আতিশয্য না ঘটিয়ে, যতটা আছে তার সঙ্গে স্পষ্ট, অর্থ-স্বচ্ছ, যুক্তিনিবদ্ধ, বাক-ভঙ্গীর সমতা রেখে কবির আবেগ আর আগ্রহ কি স্বতঃ-স্ফূর্ত্ততায় পাঠকচিত্তে সংক্রামিত করতে পেরেছেন। "গ্রামের পথ" থেকে আরম্ভ করে' "যাত্রী" পর্য্যন্ত কবিতাগুলি উৎকৃষ্ট কাব্য। বরং কোথাও কোথাও, যেমন গ্রন্থের প্রথম কবিতার দ্বিতীয় কলিতে, মনে হয়েছে যে কবি শুদ্ধশীতল বর্ণনা-ভঙ্গীর কাছে আবেগের প্রবাহকে একটু নির্ম্মমভাবেই দমন করেছেন। "সব কিছু চেনা লাগে তবুও নূতন"—কল্পনার এই উড়ে চলা সহজ লঘু গতি আর ধ্বনি যেন ইংরাজি শব্দে "পালিশ" লাগান চাকার স্থূল রূঢ়তার সঙ্গে সঙ্গত হয়ে অবস্থান করলো না। কিন্তু এ-সব ব্যক্তিগত রুচির কথা।

এটা ঠিক যে আধুনিক কবিতার ফলকে যখন বাংলায় আধুনিক মনোভঙ্গীর বিবর্ত্তন অনুসৃত হবে তখন বিমলাপ্রসাদের কবিতা মনোযোগের সঙ্গে অনুধাবন করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে বলতে হয় যে বিমলাপ্রসাদ যেন কোন কোন পূর্ব্বতনকে নবজীবন দান করেছেন। "প্রতিষ্ঠা কবিতাটিতে ঈশ্বর গুপ্তকে অতি সহজে ধরতে ছুঁতে পারি। শুধু ধ্বনিতে ছন্দে নয়; অর্থে, চিত্রে, ব্যঙ্গপ্রকৃতিতেও।

অথচ নামে, ধরণেকরণে, জীবনযাত্রার প্রণালীতে, বিমলাপ্রসাদের "সখীরায়" গুপ্ত কবির "মেয়েগুলো"র কাছ থেকে যতটা পথ সরে' এসেছে, তার ধুলো সখীরায়ের মোটরের গায়ে চিনে নেওয়া যায়। বিমলাপ্রসাদের ব্যঙ্গরস তাই গুপ্ত কবির অনুকরণ নয়, আজকের পরিবেশে নতুন পরিবেশন। সেই পরিহাস তেমনি মুখর, তবে পর্য্যবেক্ষণে সূক্ষ্ম আর মননশীল ; রূপে মার্জ্জিত আর নিষ্কলুষ। পয়ারে উচ্চ হাসি আর ব্যঙ্গের যে গলা বাংলা কাব্যে বুজে আসছিল তার উৎস বিমলাপ্রসাদ খুললেন হয়ত। 'গল্প-গল্পে প্রভাতকুমার comedy of manners-এর ধাত বুঝেছিলেন। সে সব manners এর আজকের জটিলতর পরিণতির দিনে নতুন স্বর কি বিমলাপ্রসাদ মূর্ত্ত করলেন? ওঁর কাব্যগ্রন্থে ওঁর তথাকথিত হালকা কবিতাগুলিকে মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করি।

সর্ব্বসাকুল্যে তাই মনে হয় যে শেষের সপ্তদশ "ফাউ"টি না থাকলেও রস-বৈচিত্র্যে আর রস-নিষ্ঠায় "চন্দ্রকলা"র সংখ্যায় ষোলটি কবিতাই মুল্যের তুলনায় অনেক বেশী সওদা হ'ত। "ফাউ"টিতে যে রস-চাতুর্য্য আছে সেটা সত্যিই উপরি পাওনা।

নবেন্দু বসু

বারোটি কবিতা, ফাল্গুনী রায়। কবিতা ভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা। দাম এক টাকা।

কবিতাগুলি পড়লেই মনে হয়, ফাল্গুনী রায় একজন সত্যিকারের কবি। কিন্তু শুধু এইটুকু বললেই সমালোচক এমনকি সাধারণ পাঠকের দায়িত্ব শেষ হয় না কেননা এই কবির রচিত বড় জোর আর দু-চারটে কবিতা তার অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে পাওয়া গেলেও এমন কিছু আর বিশেষ মিলবে না যাতে করে তাঁর কাব্য প্রতিভার পুনর্বিচার সম্ভব হবে, কারণ কবি ফাল্গুনী রায় মৃত, তাই তাঁর এই "বারোটি কবিতা" কাব্যখানা প'ড়েই তাঁর প্রকাশিত কবিত্ব তো বটেই এবং তার চেয়ে যা বেশী, তাঁর কবি-সম্ভাবনাটুকুকে পর্যন্ত ধরতে বা পেতে হবে। কেননা বাংলা সাহিত্যের দিক থেকে ক্ষতি তাঁর এই অসম্পূর্ণ সম্ভাবনাটুকুই।

কবির বন্ধু শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় লিখিত কবি-পরিচয় থেকে জানা যায় যে ১৯১৯ সালের মাঝামাঝি থেকে ১৯৪২ সালের মাঝামাঝি

পর্যন্ত কবির জীবনকাল। এই তেইশ বছর বয়সের মধ্যে, ১৯৩৫ সাল থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থল এই সাতটি বৎসর—কবির রচনাকাল। রচনার পদ্ধতিটুকু জানবামাত্রই আমরা তাঁর কাব্যের অন্তস্থলে পৌছুতে কিছুটা যেন সাহায্য পাই। "তার কবিতা লেখা চলতো কখনো ঠোঙার ভাঙা অংশে, কখনো ক্যানেস্তারার পেছনে কখনো দেওয়ালে।" মাত্র এই কয়েকটি কথা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে ফাল্গুনী রায়, সুস্থির হয়ে কবিতা লিখে কবিনামে খ্যাত হবো, এমন আকাঙ্ক্ষা বা উদ্দেশ্য নিয়ে কখনো লিখতে বসেন নি। কবিতা যখন তাঁর মনে আসতো, তা আসতো অনিবার্যভাবে। কাব্যোন্মেষের প্রাথমিক অবস্থার এ-রকম লক্ষণ অনেক কাব্যরসিকদের মতে কবিত্ব এবং কবি-সম্ভাবনার সার্থক পরিচয়। অবশ্য একটা অনিয়ন্ত্রিত সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা কবির ছিলো।

> "কবি-ফাল্গুনী" এই নাম হবে দেখো
> দিগ-দিগন্ত প্রতিধ্বনিত ধরণীর ধুলি 'পরে।

"চেহারা ছিলো তার সওয়া-ছ' ফুট লম্বা, গায়ে দিতো ঠাকুর্দার আমলের হাঁটু অবধি লম্বা কোট, গলায় জড়াতো রুমাল......" ইত্যাদি, ফাল্গুনী রায়ের এই শারীরিক গঠন বা পোষাক অভ্যাসের এই অসামঞ্জস্যতার সঙ্গে তাঁর কবিতারও যেন কোথায় সঙ্গতি আছে। খুব ভালো একটি পংক্তির সঙ্গে হাতে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে হয়ত খুব দুর্বল একটি পংক্তি, চমৎকার একখানি কাব্যচিত্রের উপর হয়ত একটা শব্দের কালি ঝেড়ে চিত্রখানিকে প্রায় নষ্ট কোরে এনেছেন। কিন্তু অপরিণত বয়সের এই সব ত্রুটি সত্বেও জাত-কবির লক্ষণ ফাল্গুনী রায়ের মধ্যে পাই।

> নীল দুধে ধোয়া ধব্‌ধবে সাদা রাত
> রাস্তাটা যেন ঝকঝকে ইস্পাত্‌!
> এই হাতে রাখো রাঙা ভেলভেট হাত
> —রাখো গো,
> (কয়েকটি লাইন—কাজরীকে)

"ভালোবাসি তব ভাষাভরা টানা আয়না-আঁখি।" (মাঠে)

১৯৩৫-৩৬ সালে "অসংখ্য প্রেমের কবিতা" ফাল্গুনী রায় লিখেছিলেন। তাঁর প্রেমের কবিতাগুলো ঠিক যে কোনো নায়িকাকে উদ্দেশ কোরেই লেখা তা নয়; বরং যেন কোনো প্রিয়ার কল্পনার উপলক্ষে রচিত এবং

৬

তাতেও এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির দিকে ধাবমান প্রায় কিছুই নেই। যা আছে তা হচ্ছে প্রিয়ার উপলক্ষে প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি আগ্রহ আর উচ্ছ্বাস।

ফাল্গুনী রায়ের কবিত্বের উপর সত্যেন্দ্র দত্ত, নজরুল ইস্‌লাম, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত ও বুদ্ধদেব বসুর প্রভাব ছাড়াও যতীন্দ্র সেনগুপ্তের প্রভাব, বিশেষ কোরে মরু-ঝড় কবিতাটিতে লক্ষণীয়। কিন্তু এসব হ'লো বহিরাবরণ মাত্র, এই সমস্ত কবিদের থেকে অঙ্গসজ্জার যে-সব উপকরণ তিনি গ্রহণ করেছেন, তা সাজিয়েছে তাঁর আপন কবিত্বশক্তিকেই।

"মৃদুল কাঁপনে যুবতী সে প্রজাপতি"; "বেতার বাজায় ঝরণার ঝংকার", "পিছনে তাদের না কওয়া কত যে কথা" ইত্যাদি পংক্তি ফাল্গুনী রায়ের নিজস্ব এবং সহজ প্রকাশভঙ্গির নিদর্শন হিসেবে অগৌরবের নয়।

> "ধান শীষে শীষে বাতাসের শিশ্ ভাসে
> বাতাসের শিশ্ গান গাওয়া ধান শীষে।"
>
> (দিন)

কবির চক্ষু ও কর্ণ, এ-দুটি তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়ের যে ওতোপ্রোত সজাগতার পরিচয় এখানে পাওয়া যায় তা অপূর্ব। "হাঁস" কবিতাটি সুন্দর।

১৯৩৫-৩৬ সালের পর ফাল্গুনী রায়ের "স্বাধীন মন তাঁর চিন্তাশীল মনের কাছে পরাজিত হয়েছিলো" এবং তিনি যুগোপযোগী কবিতা লেখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। কবির দ্বন্দ্বগ্রস্ত এই মানসিক অবস্থায় যে নৈরাশ্য এসেছিলো তার পরিচয়—

> হে পাখী আমার বরফ-বনের পাখী
> এ মরুর দেশে এসেছিলে কেন ভুলে?
> শকুনির ভীড়ে তুমিও ভিড়বে নাকি
> রন্ধ্র-বিহীন চির রাত্রির কূলে?
>
> (অপমৃত্যু)
>
> "ডাষ্টবিনে তারা একাকার জড় হয়
> বহুবর্জিত আবর্জনার ভার,
> কত কুমারীর অনাহূত কাম-শিশু
> কত ধাঙড়ের ধামা ধামা জঞ্জাল।
> ডাষ্টবিনে, এই বিধাতার ডাষ্টবিনে
> আমরাও আজ পচে ঝরে মরে গেছি।
>
> (কয়েকটি মৃত্যু)

এসব থেকে বোঝা যায় যে ফাল্গুনী রায়ের একটি উন্মুখ কবিমন সর্বদা আত্মপ্রকাশের চেষ্টা কোরেছে কিন্তু পথ ও পরিচয় আয়ত্তে না থাকায় সব সময় নিজেকে ঠিক মত প্রকাশ কোরতে পারেনি। পরিণত বয়সে তিনি একটি জীবন-দর্শন অনুভব কোরে বাঙলা কাব্যের গৌরব বাড়িয়ে যেতেন বলেই মনে হয়।

এই প্রসঙ্গে আমরা বাঙলার আর একজন প্রায় একই বয়সে মৃত কবির সঙ্গে ফাল্গুনী রায়ের তুলনা কোরতে পারি। তিনি সুকুমার সরকার। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত তাঁর বন্ধুরা এখনো তাঁর কোনো সঞ্চয়ন প্রকাশ করতে পারেননি। এদিক দিয়ে বাঙলা-কাব্যরসিকেরা ফাল্গুনী রায়ের বন্ধুদের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ।

সৌরীন্দ্রকুমার খাঁ

সাহিত্যের স্বরূপ, শশিভূষণ দাশগুপ্ত। দেড় টাকা

বইটি চার অধ্যায়ে বিভক্ত: 'সাহিত্যের প্রাণধর্ম ও তত্ত্ববুদ্ধি', 'আর্টে প্রয়োজন ও অপ্রয়োজন', 'সাহিত্যের স্বরূপ', 'সাহিত্যে আদর্শবাদ বনাম বাস্তববাদ।' এ থেকেই আলোচ্য বিষয়ের আভাস পাওয়া যাবে। লেখকের আলোচনা যুক্তিসহ, ভাষা প্রাঞ্জল, উদ্দেশ্য সাধু। যাঁরা সাহিত্যকেও জড়বাদী দর্শনের সাহায্য ছাড়া বুঝতে চান না, আর যাঁরা সাহিত্যের আত্মসর্বস্বতায় বিশ্বাসী, এই দুই চরম মতের সমন্বয়সাধনের চেষ্টা লেখক করেছেন। এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে হয় এই যে "Art for Art's sake" স্লোগানটির প্রতি আমাদের দেশের সমালোচকরা প্রায়ই অবিচার ক'রে থাকেন। পঁচিশ বছর আগে শরৎচন্দ্রকে যাঁরা তীব্র নিন্দা করেছেন, পনেরো বছর আগে 'কল্লোলে'র লেখকদের বিরুদ্ধে যাঁরা জেহাদ ঘোষণা করেছেন, এবং আজকের দিনেও যাঁরা অ-শাস্ত্রীয়, অর্থাৎ অ-মার্ক্সীয়, রচনার একান্ত অসারতা প্রমাণে ব্যাপৃত—তাঁদের সকলের মুখেই এই কথা যে "Art for Art's sake"এর মন্ত্রাবিষ্ট হ'য়েই লেখকরা সাহিত্যরচনার অছিলায় সমাজের অহিতসাধন করছেন। অথচ এইটে মনে রাখা দরকার যে-সময়ে ইংলণ্ডে এই স্লোগানের উদ্ভব হয় সে-সময়কার শ্রেষ্ঠ ইংরেজ লেখকরা সকলেই এই মতাবলম্বী—ওর একটা জরুরি ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিলো। বিভিন্ন সময়ে এ-রকম অনেক বিভিন্ন মতবাদ সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবল

হ'য়ে ওঠে—সেগুলি বিশেষভাবে বিশেষ একটি যুগেরই সৃষ্টি—কিন্তু সব মতবাদেই কিছু মৌল সত্য নিহিত থাকে, পরবর্তী যুগে সেই সত্যটুকুই বিবেচ্য হওয়া উচিত। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক বলছেন: 'শিল্পের ক্ষেত্রে এই বিশুদ্ধ এবং অবিমিশ্র রসানুভূতির আদর্শটি আমরা বর্তমান যুগে গ্রহণ করিয়াছি পাশ্চাত্ত্য দেশ হইতে। ভারতীয় শিল্পাদর্শে সুন্দর বা মধুরকে কখনও মঙ্গল হইতে একান্ত বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা হয় নাই।' কিন্তু Art for Art's sake মতবাদে মধুর বা সুন্দরকে মঙ্গল থেকে 'একান্ত বিচ্ছিন্ন' ক'রে দেখা হয়েছে এ-কথা বললে কি ঠিক বলা হয়? নাকি সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রেই 'অবিমিশ্র রসানুভূতি'র আদর্শ পাওয়া যায় না? অস্কার ওআইল্ড যখন বলেন, 'All art is utterly useless', আর বর্নার্ড শ যখন বলেন 'All art must be didactic'—তখন কি অবশ্যই ধ'রে নিতে হবে যে এই দুই উক্তিতে দুস্তর ব্যবধান? এ দুটি উক্তিই তো সমান সত্য, রসতত্ত্বের আলোচনায় উভয়েরই পাশাপাশি স্থান হতে পারে।

বু. ব.

সম্পাদকীয়

রবীন্দ্র-রচনাবলী

রবীন্দ্র-রচনাবলীর চতুর্দশ ও পঞ্চদশ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। এই দুই খণ্ডে 'পূরবী' থেকে 'পরিশেষ' পর্যন্ত কাব্যগ্রন্থ, 'মুক্তধারা', 'বসন্ত' 'রক্তকরবী' এই তিনটি নাটক, 'গল্পগুচ্ছ' দুই কিস্তি ও 'শান্তি-নিকেতন' (৪—১২) স্থান পেয়েছে। 'গ্রন্থ-পরিচয়' বিভাগে নানা প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। 'লেখনে'র প্রথম সংস্করণে ভ্রমক্রমে প্রিয়ম্বদা দেবীর কয়েকটি কবিতা কী ক'রে ঢুকে গিয়েছিলো, কবির স্বরচিত সে-ইতিহাস অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। গল্পগুচ্ছ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সময়কার বিভিন্ন মন্তব্য চতুর্দশ খণ্ডে সংগৃহীত হয়েছে, তাতে চিন্তাশীল পাঠক নিঃসন্দেহে লাভবান হবেন। গল্পগুলি যে প্রথম প্রকাশের তারিখ অনুযায়ী যথাক্রমে সাজানো হচ্ছে, এতে

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির ক্রমবিকাশ অনুসরণ করবার অতুলনীয় সুযোগ পাওয়া গেলো; 'ঘাটের কথা, থেকে 'গল্পসল্প' পর্যন্ত বাংলা গদ্যের উৎকর্ষ ও বৈচিত্র্য-সাধনের ইতিহাসটি আমাদের সাহিত্যের একটি গভীরভাবে আলোচ্য অধ্যায়। কিন্তু 'লিপিকা' গল্প-উপন্যাসের অন্তর্গত না ক'রে কবিতা অংশের অন্তর্গত করাই কি যুক্তিসংগত নয়? রবীন্দ্রনাথ যখন নিজেই বলেছেন যে 'লিপিকা'র রচনাগুলি তিনি কবিতা হিসেবেই লিখেছিলেন, শুধু সাহসের অভাবে কবিতার মতো ক'রে সাজাননি, এবং 'লিপিকা'র সঙ্গে 'পুনশ্চ'র আত্মীয়তা যখন সুস্পষ্ট তখন ভাবীকাল কি ঐ গ্রন্থকে কবিতা হিসাবেই গ্রহণ করবে না? এখনই তো অনেকের মনে দৃঢ় ধারণা দেখা যাচ্ছে যে 'লিপিকা' বাংলা ভাষার প্রথম গদ্যকবিতাগ্রন্থ। 'লিপিকা' যদি গল্প হয় 'পুনশ্চ'ই বা নয় কেন? বাংলা ভাষায় প্রথম গদ্যকবিতালেখক যে রবীন্দ্রনাথই, এই সত্যের অপলাপ ঘটে যদি 'লিপিকা'কে ছোটোগল্পের দলভুক্ত করা হয়।

পঞ্চদশ খণ্ডে 'পরিশেষে'র পরে একটি 'সংযোজন' অংশ দেয়া হয়েছে, তাতে সন্নিবেশিত হয়েছে এমন অনেক কবিতা যা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু কোনো গ্রন্থের অন্তর্গত করা হয়নি। এই অংশে 'লক্ষ্যশূন্য' ও 'প্রার্থনা' ('কামনায় কামনায় দেশে দেশে যুগে যুগান্তরে') এই দুটি কবিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাঠকদের মনে থাকতে পারে যে দ্বিতীয় কবিতাটি কবির হস্তাক্ষরে 'কবিতা'র আষাঢ় ১৩৪৯-এর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিলো।

পঞ্চদশ খণ্ডের গ্রন্থপরিচয় অংশে অনেকগুলি কবিতার প্রথম খসড়া ও বর্জিত স্তবক মুদ্রিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের বইয়ের পুনর্মুদ্রণ

'বিসর্জন (১৷০) ও 'নটীর পূজা (৸০) এ দুটি বইয়ের নতুন সংস্করণ আমরা পেয়েছি। এ-দুর্দিনেও যে বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের বইয়ের নতুন সংস্করণ প্রাক্-সাময়িক মূল্যে প্রকাশ করতে পারছেন এ-জন্য তাঁরা সমস্ত দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন। 'বিশ্বভারতী নিউজ' প'ড়ে জানলুম যে রবীন্দ্রনাথের বইয়ের কাটতি সম্প্রতি খুব বেশি বেড়ে গেছে। এটা সুখের কথা নিশ্চয়ই; কিন্তু বর্তমান অবস্থায় নিঃশেষিত বইয়ের পুনর্মুদ্রণ কাজটি সোজা নয়।

এই গুরুতর দায়িত্বপালনে বিশ্বভারতীর নিপুণ অধ্যবসায়কে সাধুবাদ জানাতে হয়। নতুন সংস্করণগুলির বহিরবয়বেও বিশ্বভারতীর পরিচ্ছন্নতার আদর্শ অক্ষুণ্ণ রয়েছে, তা বলাই বাহুল্য।

ছোটো গল্প

'কবিতা'র সমালোচনা অংশের পরিধি আরো ব্যাপ্ত করবার ইচ্ছা আমাদের ছিলো, কিন্তু সম্প্রতি কাগজের অনটন সকল সাধু সংকল্পের অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। গেলো বছরের মধ্যে কয়েকটি ছোটোগল্পের বই আমরা সমালোচনার জন্য পেয়েছি, তার মধ্যে প্রায় সবগুলিই উল্লেখযোগ্য, কিন্তু দুঃখের বিষয় এ-সব বইয়ের উপযুক্ত সমালোচনার পরিসর আমাদের হাতে নেই। অতএব বইগুলির উল্লেখমাত্র ক'রে এ-প্রসঙ্গ শেষ করতে বাধ্য হচ্ছি:

সপ্তপর্ণ	রাখালচন্দ্র সেন	বিশ্বভারতী,	২৲
দুনিয়াদারি	চারুচন্দ্র দত্ত	,,	,,
দেহলি	হেমলতা দেবী	,,	১।০
সংকেত	সোমেন চন্দ	প্রতিরোধ পাব্লিশার্স	১॥০
পদ্মনাভ	জ্যোতির্ময় রায়	কবিতা ভবন	১।০
মাধবীর জন্য	প্রতিভা বসু	,,	১৸০

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিশ্বভারতীর গ্রন্থনবিভাগের আধুনিকতম উদ্যোগ বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা। এর প্রথম বই রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের স্বরূপে'র সমালোচনা এই সংখ্যার অন্যত্র পাওয়া যাবে। এই গ্রন্থমালার দ্বিতীয় ও তৃতীয় বই, শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসুর 'কুটির-শিল্প' ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনের 'ভারতের সংস্কৃতি' ইতিমধ্যে আমাদের হস্তগত হয়েছে। দু'খানা বই-ই সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়। রাজশেখরবাবুর ভাষার অনাবিল স্বচ্ছতা কুটিরশিল্প বিষয়ক নিবন্ধেও অক্ষুণ্ণ আছে। সকলেই জানেন যে ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সেন-মহাশয় অন্যতম প্রধান বিশেষজ্ঞ; এই সর্বজনভোগ্য পুস্তিকা প্রণয়ন ক'রে তিনি আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বইখানা সুখপাঠ্য, শিক্ষাপ্রদ ও চিন্তা-উত্তেজক। আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি এমনই দূষিত যে আমরা শিক্ষিত লোকরা নিজের দেশ সম্বন্ধেই সবচেয়ে কম খবর রাখি; এ-বইখানা পাঠকের মনে সেই বাঞ্ছিত আবহ রচনা করবে যার পটভূমিতে ভারতীয় ইতিহাসের মূল সূত্র সম্বন্ধে আমরা সচেতন হই এবং

এ-বিষয়ে আরো জানবার আকাঙ্ক্ষা জন্মে। আমাদের ইস্কুল-কলেজের ভ্রমাত্মক শিক্ষার পরিপূরক ও সংশোধকরূপে এ-ধরনের বই যত বেশি প্রকাশিত ও প্রচারিত হয় ততই ভালো।

'কবিতা'র আলোচনা বিভাগ

'কবিতা'র এই সংখ্যার আলোচনা বিভাগের প্রতি আমরা পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই বিভাগের প্রবর্তনা যাতে স্থায়ী হতে পারে সেই উদ্দেশে আমরা পাঠকদের জানাচ্ছি যে 'কবিতা'য় প্রকাশিত কোনো রচনা সম্বন্ধে তাঁদের কোনো বক্তব্য থাকলে আমাদের লিখে জানালে আমরা সুখী হব। প্রাপ্ত মন্তব্যগুলি সম্ভব হ'লেই প্রকাশিত হবে। সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধাকারে বা সম্পাদকের প্রতি পত্রাকারে মন্তব্য পাঠানো যেতে পারে; বলা বাহুল্য রচনা যথাসম্ভব হ্রস্ব ও প্রাসঙ্গিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিশেষ-কোনো কারণ না থাকলে গ্রন্থসমালোচনার সমালোচনা ছাপা হবে না। তবে 'কবিতা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে যদি কারো মনে হয় যে কোনো একটি প্রসঙ্গ আরো সুস্পষ্টীকরণের অপেক্ষা রাখে, কিংবা প্রকাশিত অভিমতের প্রতিকূল যুক্তি যদি কেউ দিতে ইচ্ছা করেন সে-সব রচনা আমরা সাগ্রহে বিবেচনা করবো। অনেক রচনা পাঠকদের মনে অনেক সময় নানা-বৈধ প্রশ্নের উদ্রেক করে, সেইগুলি যাতে তাঁরা ব্যক্ত করতে পারেন এ-বিভাগের সেটাই উদ্দেশ্য। এইটে মনে রাখা দরকার সে সে-সব রচনাই আমরা আমন্ত্রণ করছি যাতে একটা স্পর্শসহ বক্তব্য ও সংগঠনী উদ্দেশ্য আছে।

'কবিতা'র বার্ষিক চাঁদা

গ্রাহকরা লক্ষ্য করবেন যে আগামী আশ্বিন থেকে 'কবিতা'র বার্ষিক চাঁদা তিন টাকা ধার্য করা হ'লো। পরপৃষ্ঠায় এ-বিষয়ে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখুন।

"কবিতা"র মূল্যবৃদ্ধি

গ্রাহকদের প্রতি নিবেদন

আগামী আশ্বিনে "কবিতা"র নবম বর্ষ আরম্ভ হবে। নবম বর্ষ থেকে "কবিতা"র বার্ষিক চাঁদা **তিন টাকা** ধার্য করা হ'লো। নগদ মূল্য প্রতি সাধারণ সংখ্যা (আশ্বিন, পৌষ, চৈত্র, আষাঢ়) আট আনা ও শারদীয় সংখ্যা (কার্তিক) এক টাকা।

আগামী আশ্বিন সংখ্যা ১লা আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যা ১৫ই আশ্বিন প্রকাশিত হবে। গ্রাহকগণ অনুগ্রহ ক'রে নতুন বছরের চাঁদা **১৫ই ভাদ্রের মধ্যে** মনি-অর্ডারে পাঠিয়ে দেবেন। যাঁরা গ্রাহক থাকতে ইচ্ছা করেন না তাঁরাও ঐ তারিখের মধ্যে নিষেধাজ্ঞা পাঠাবেন। যাঁদের চাঁদা বা নিষেধাজ্ঞা পাওয়া না যাবে, তাঁদের সকলকেই আমরা আশ্বিন সংখ্যা ভি. পি. ডাকে পাঠাবো। ভি. পি. ফেরৎ দিয়ে আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করবেন না, এবং ঠিকানা পরিবর্তন হ'লে অবিলম্বে জ্ঞাপন করবেন, এই অনুরোধ।

বুদ্ধদেব বসু
সম্পাদক, "কবিতা"
কবিতা ভবন
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা